নয়া চীনে চল্লিশ দিন

ক্ষিতীশ বসু

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আমার চীন যাওয়ার ব্যাপারে এবং এই লেখায় যাঁরা আমাকে নানা দিক থেকে সাহায্য করে এসেছেন অথবা নানাভাবে প্রেরণা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যাঁদের নাম তাঁরা হলেন বন্ধুবর শ্রীঅরূপ ভট্টাচার্য (গীতিকার) ও ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীপরেশ ধর। আমি এ'দুজন শিল্পীর দীর্ঘ-জীবন কামনা করি।

—ক্ষিতীশ বসু

অক্টোবর, ১৯৫৩

দাম: তিন টাকা

প্রকাশক:
সুরেন দত্ত
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ
১২, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর:
দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
দি ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং লিঃ
২৮, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯

ভূমিকা

পৃথিবীর মানুষের সমাজে নূতন গতিবেগের সঞ্চার হইয়াছে। সেই নূতনতর গতিবেগের স্থরু ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসের মহা-বিপ্লবে। যদিও সেই বিপ্লবের আরম্ভ হইয়াছিল জার-সাম্রাজ্যের মর্মকেন্দ্র মস্কো-পেট্রোগ্রাদে, তথাপি উহার ভৌগোলিক সীমা কেবল বিরাট সোভিয়েট রাশিয়াতেই আবদ্ধ নাই। কোনও-না-কোন আকারে উহা পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও দেখা দিবে। কেননা, এই বিপ্লবের কোন স্বাদেশিক গণ্ডী থাকিতে পারে না, ঊনবিংশ শতকের জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এই বিংশ শতকের নবতর আন্তর্জাতিক গণতন্ত্রকে গড়িয়া তুলিবে—অন্ততঃ উহার এমন এক প্রকাণ্ড ও প্রচণ্ড ভিত্তি রচনা করিয়া যাইবে, যাহা আগামী শতাব্দীর আরম্ভে মানুষের শান্তি, কল্যাণ ও সৌভ্রাত্রকে দেশে দেশে এবং ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠা দিবে।

জারের রাশিয়ার পর "জাতীয়তাবাদী" চীনের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটিল, ভারতবর্ষেও ঘটিবার কথা ছিল। এমন কি সাম্যবাদী চিন্তা-নায়কগণ চীন ও ভারতবর্ষেই বিপ্লবের অগ্রবর্তিতা ঘটিবে বলিয়া বহুকাল পুর্বে অনুমান করিয়াছিলেন। সেই অনুমান অবশ্যই অবিলম্বে ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হয় নাই। চীনে ২৫ বৎসর সংগ্রামের পর মাত্র সম্প্রতি উহা সার্থক হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে মানুষের সমাজে যে নূতন গতিবেগের সঞ্চার হইয়াছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে উহা আরও ব্যাপক আরও সর্বস্তরগামী হইয়া উঠে এবং সেই গতিবেগ যখন ভারতবর্ষকে আঘাত করিতে থাকে ১৯৪৬-৪৭ সালে, যখন বোম্বাইয়ের সমুদ্রতীর ও কলিকাতার রাজপথ মুক্তিকামী যুবকদের রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠে, তখন

একদিকে সাম্প্রদায়িকতার হিংস্র ব্যাঘ্র নখদন্ত বিস্তার করিতে আরম্ভ করে এবং অন্যদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আপোষরক্ষার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়ে। কংগ্রেসের ভীরুতা, সাম্প্রদায়িকতার তাণ্ডব ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চতুরতা মিলিয়া পরস্পরের সঙ্গে আপোষ করে এবং ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক জোয়ার ধীরে ধীরে জনমন হইতে নামিয়া যায়। কিন্তু চীনের বিপ্লব জাপানী বা মার্কিন কিম্বা কুওমিণ্টাং প্রতিক্রিয়াশীলতার সহিত আপোষ করে নাই—যদিও ১৯৩৭ সালের দ্বিতীয় পর্যায়ের জাপানী আক্রমণ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পরস্পরের ইউনাইটেড ফ্রণ্ট গঠিত হইয়াছিল স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, কিম্বা এক কথায় বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে ১৯৪৬ সালের বসন্তকাল হইতে চীনের কুওমিণ্টাং-কমিউনিস্ট গৃহযুদ্ধ পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে এবং এই নব পর্যায়ের গৃহযুদ্ধে মাও সে-তুং, চৌ এন-লাই, জেনারেল চু-তে প্রভৃতির নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনের জনগণ ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যেই জেনারেল চিয়াং কাইসেক পরিচালিত জাতীয়তাবাদী গভর্নমেণ্টকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ এবং মূল ভূখণ্ড হইতে বিতাড়ন করিতে সমর্থ হন। বিশুদ্ধ সামরিক বিচারে চিয়াংকাইসেকের এই "সামগ্রিক পরাজয়ে" কোন বড় রকমের বিস্ময় নাই এবং রণনীতির কোন বৃহৎ ঐতিহাসিক তথ্যও নাই। কারণ, দীর্ঘকালের কুশাসনে, উৎপীড়নে, অর্থনৈতিক দুরবস্থায় এবং অজস্র দুর্গতি ও নৈতিক পতনের ফলে চিয়াংকাইসেকের সৈন্যদলের যেমন লড়িবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা ছিল না (প্রভূত অস্ত্রশস্ত্র এবং মার্কিন সাহায্য সত্ত্বেও) তেমনই জনসাধারণের মধ্যে চিয়াং সরকারের প্রতি কোন প্রকার সমর্থনও ছিল না, বরং অভিশাপ ছিল পুঞ্জীভূত। জনগণের এই

অভিশাপই নবতর বিপ্লবের হাতিয়াররূপে চিয়াং রাজত্বের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানিয়াছিল ; নিঃসন্দেহে এই আঘাতের নেতৃত্ব দিয়াছেন মাও সে-তুংয়ের কমিউনিস্ট পার্টি এবং বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া অসাধারণ সহিষ্ণুতা, শক্তি ও জনকল্যাণের পরিকল্পনার দ্বারা দেশকে তাঁহারা প্রস্তুত করিতেছিলেন ভাবী বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য। তাঁহারা সামরিক সংগঠনের যেমন রূপ দিতেছিলেন, তেমনই ভূমি সংস্কারের পরিপূর্ণ কার্যক্রমও অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণ করিতেছিলেন। ফলে যুদ্ধজয়ই একমাত্র বড় কথা ছিল না, জনগণের হৃদয় জয়ও সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ছিল। সুতরাং এই নূতন জোয়ারের মুখে প্রতিক্রিয়াশীলতার দুর্নীতি-দুষ্ট চিয়াং রাজত্ব জীর্ণ পত্রের মত ভাসিয়া গেল। এশিয়ার ইতিহাসের ইহা এক রোমাঞ্চকর অধ্যায় সন্দেহ নাই।

কিন্তু গৃহযুদ্ধ ও বিপ্লবের পর এই নয়াচীনের চেহারা ও চরিত্র কিরূপ দাঁড়াইয়াছে? বর্তমান জগতের পক্ষে এই প্রশ্ন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, মানুষের ইতিহাসে যে নূতন গতিবেগের সঞ্চার হইয়াছে, উহা কেবল ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, এক্ষণে উহা এশিয়ার সর্ব-বৃহৎ অংশে ভূকম্পন সঞ্চার করিয়াছে এবং সেই কম্পনের ধাক্কা হিমালয় উত্তীর্ণ হইয়া আমাদের ভারতবর্ষের মাটিতেও স্পন্দন জাগাইতেছে। সুতরাং এই নব্য চীন, যাহা জনগণের নিকট মহাচীন নামে পরিচিত, তার রূপান্তরের দিকটা লোক-কল্যাণের মানদণ্ডে কতখানি বিচারসহ? চিন্তাশীল লোক ইহার বিচারের দ্বারাই একটা দেশের শাসন-পরিবর্তনকে স্বীকার বা অস্বীকার করিবেন। গত তিন বৎসরের মধ্যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতবর্ষ হইতে বহু লোক নয়াচীনে গিয়াছিলেন এবং চীন হইতেও বহু প্রতিনিধি যাতায়াত করিয়াছেন। গত বৎসর (১৯৫২ সালে

সেপ্টেম্বর মাসে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহের যে বিরাট শান্তিসম্মেলন পিকিং নগরীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে আমার প্রীতিভাজন তরুণ বন্ধু সঙ্গীতশিল্পী শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বসু ভারতীয় প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নয়াচীনে চল্লিশ দিন কাটাইয়া আসিবার পর তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তারই পরিচয় দ্বারা আমি এই ভূমিকার অবতারণা করিয়াছি।

ক্ষিতীশবাবুর এই পুস্তকে আমার সেই প্রশ্নের জবাব আছে। অর্থাৎ নয়া চীনের চেহারা ও চরিত্র কিরূপ দাঁড়াইয়াছে?—এক কথায় জবাব দেওয়া যায় যে, নয়া চীনে নূতন জীবনের বন্যা আসিয়াছে। সমগ্র দেশ নব-যৌবনের সৃষ্টিমন্ত্রে ও কল্যাণমন্ত্রে জাগরিত হইতেছে। সরলভাবেই বলা যায় যে, এই পুস্তকের লেখক কোন স্বনামধন্য সাহিত্যিক বা সাংবাদিক নন, আসলে তিনি সঙ্গীত-শিল্পী। তথাপি তাঁহার সহজ শিল্পীমনের উপর নয়া চীনের জীবনধারা যে গভীর রেখাপাত করিয়াছে, গ্রামের ক্ষেত-খামার হইতে শহরের কল-কারখানা পর্যন্ত একটা নূতন জাতি গড়িবার যে অদম্য উৎসাহ দেখা দিয়াছে, উহার বেগবান ও প্রাণবান রূপ নবীন লেখক প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন এবং ভাষাগত ও ইতিহাসগত কোন জটিল আবর্তে ধরা না পড়িয়া সহজ স্বচ্ছন্দচিত্তে সেই অভিজ্ঞতা এই পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন। লেখা পড়িলেই মনে হইবে ইহা অকৃত্রিম এবং নবীন চীনের একটা "আনকোরা রিপোর্ট।" যথেষ্ট আগ্রহ ও কৌতূহল নিয়া প্রীতিভাজন ক্ষিতীশ বাবুর এই বই পড়িয়াছি এবং মনে মনে এই ভাবিয়া আপশোষ করিয়াছি যে, কেন আমি নিজে দুইবার চীনযাত্রার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না! এশিয়ার এই নব রূপান্তর নিশ্চয়ই আমার প্রত্যক্ষ করা উচিত ছিল।

এই রূপান্তরের একটি চিত্র লেখক দিয়াছেন হুয়াই নদীর বাঁধ নির্মাণ সম্পর্কে একটি মনোমুগ্ধকর বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া। এই ধরনের চিত্র আরও আছে, যেগুলি নয়া চীনের ভূমি-ব্যবস্থা ও কৃষির এবং জলসেচ ও নদী-নিয়ন্ত্রণের প্রভৃত উন্নতির পরিচায়ক। একথা উল্লেখ করা বাহুল্য যে, আমাদের এই সনাতন ভারতবর্ষের মত পুরাতন চীনও একান্তরূপে ভূমি ও কৃষির উপর নির্ভরশীল। জনসংখ্যার শতকরা ৯০ জন সম্ভবতঃ কৃষি বা ভূমির দ্বারা জীবনধারণের জন্য অপেক্ষমান। এই মূল সমস্যাটিকেই নয়া চীনের রাষ্ট্র-কর্তৃপক্ষ সর্বাগ্রে মীমাংসার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন এবং এই কার্যে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির দক্ষতা সর্বজনবিদিত। কিন্তু যে কোন দেশেরই কেবল প্রাকৃতিক সম্পদ নহে, আসল সম্পদ হইতেছে মানুষ। সেই মানুষ-গুলি, যাহারা সমগ্র দেশের জীবনধারণের জন্য খাদ্য বা শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহারাই ছিল সর্বাপেক্ষা নির্যাতিত, অজ্ঞ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একেবারে নিঃস্ব। ভূমিদাসরূপেই এবং জমিদারের দাসত্বেই তাহাদের নিজেদের জীবন ও পারিবারিক জীবন কাটিয়া যাইত। এই অবস্থা চলিয়া আসিতেছিল এক শতাব্দী কিংবা পাঁচ শতাব্দী ধরিয়াও নহে, দীর্ঘ চারি হাজার বৎসর ধরিয়া! নূতন সামাজিক আদর্শ এই সনাতন ধারার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটাইয়া দিয়াছে, যাহার সন্ধান ক্ষিতীশ বাবুর এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে।

সোভিয়েট রাশিয়াতে যেমন সাধারণ মানুষের জীবনে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও গৃহের নিশ্চয়তা আসিয়াছে এবং প্রত্যেক মানুষই সমগ্র দেশের সম্পদকে জাতীয় সম্পদরূপে নিজের বলিয়া অনুভব করিতে পারিতেছে, নয়া চীনেও তেমনই উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি আসিয়াছে। পৃথিবীর অধিকাংশ দুর্নীতি, অত্যাচার ও

পতনের মূলে রহিয়াছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির "পবিত্র অধিকার"—যে অধিকারের বলে বহু মানুষের পরিশ্রম ভাঙ্গাইয়া ও জনগণকে দাসত্বে আবদ্ধ করিয়া "উচ্চতর" শ্রেণী গোটা সমাজদেহকে কলুষিত করে। নূতন যুগের পৃথিবীতে শোষণ ও দুর্নীতির এই ভিত্তিটাই নষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং যে সমস্ত দেশে এই অপবিত্র ভিত্তিটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে সেখানেই সাধারণ মানুষের জীবনে আসিয়াছে আনন্দ, প্রাণের প্রাচুর্য এবং মানসিক সৃষ্টির প্রেরণা। সোভিয়েট রাশিয়াতে ইতি-পূর্বেই জীবনের এই আনন্দিত রূপ বহুল পরিমাণে প্রকাশ পাইয়াছে, এক্ষণে নয়া চীনের পালা। যুদ্ধ, হিংসা, লোভ ও পীড়ন হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য আজিকার মানুষ মহৎ চেষ্টা করিতেছে। ইহারই জন্য পিকিংয়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় শান্তি সম্মেলনের ঐতিহাসিক সমাবেশ ঘটিয়াছিল এবং এই পুস্তকে পাঠকগণ তার চিত্তাকর্ষক বর্ণনা পাইবেন।

১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর হইতে মানুষের সমাজে যে গতিবেগের সঞ্চার হইয়াছে, উহা বিশাল রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ অতিক্রম করিয়া এশিয়া মহাদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সেই গতিশীলতা একদিন সমস্ত দেশের সমস্ত মানুষকে প্রভাবান্বিত করিবে। কারণ, ইতিহাসের গতি সম্মুখের দিকে এবং মানুষের বুদ্ধি ও মন মহৎকে পাইবার জন্য উন্মুখ। ইহার পথে বহু সহস্র বৎসরের অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও দারিদ্র্য পতর্বপ্রমাণ বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে বটে, কিন্তু আজিকার দিনে হিমালয় পর্বতও আর অনতিক্রমণীয় নহে। অবশ্য ভুলভ্রান্তি, বিদ্বেষ এবং আক্রোশ ঘটিবে অনেক, কিন্তু প্রগতির ঐতিহাসিক ধারা রুদ্ধ হইবে না। নয়া চীন সেই সাক্ষ্য বহন করিয়া আনিতেছে। এই পুস্তক তারই প্রতিশ্রুতিপূর্ণ ইঙ্গিত এবং এই ইঙ্গিতকে কোন নূতন দেশের সমাজ-ব্যবস্থায় ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে উপলব্ধি করিবার জন্য যে মানসিক তীক্ষ্নতা, হৃদয়ের উদারতা এবং প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন, লেখকের তাহা পূর্ণমাত্রায়ই রহিয়াছে। আমি তাঁহাকে সাধুবাদ জানাইতেছি।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

২২।৯।৫৩

তিয়েন আন্‌-মেন স্কোয়ারে মে দিবসের কুচকাওয়াজ দেখছেন চেয়ারম্যান মাও সে তুং.
পাশে রয়েছেন পিকিংয়ের মেয়র পেং চেন্‌ ও ভাইস্‌ চেয়ারম্যান লিউ শাও-চি।

পিকিংয়ের ছ'জন নারী ট্রাম ড্রাইভার।
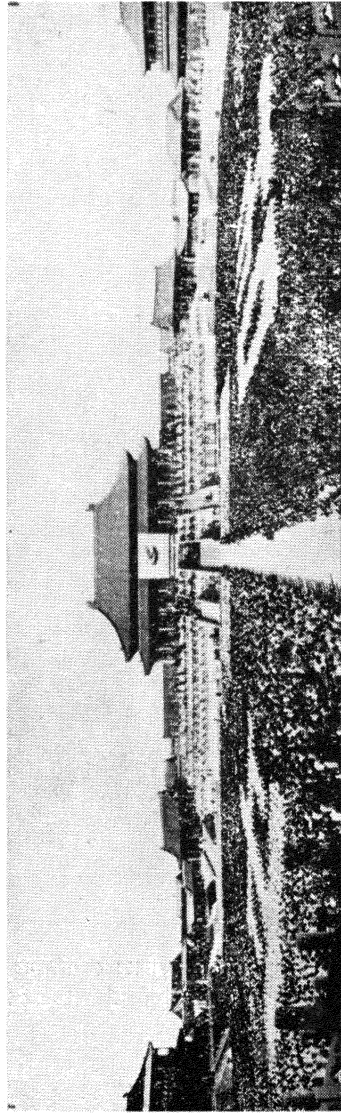
পিকিং শান্তি সম্মেলনের সফল সমাপ্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত জনাকীর্ণ বিরাট সমাবেশ।

নয়াচীনে চাল্লিশ দিনে

১৯শে সেপ্টেম্বর। ১১টা ২৫ মিনিট। দমদম এরোড্রোম থেকে বিশালকায় এক বিলেতী উড়ো-জাহাজ আমাদের নিয়ে আকাশে ওড়বার জন্য প্রস্তুত হ'ল।

যে সব আত্মীয় ও বন্ধুরা ফুলের মালা ও তোড়া নিয়ে এরোড্রোমে এসেছিলেন বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে, হাওয়াই জাহাজের কাঁচের জানালা দিয়ে এখনও দেখছি তারা রুমাল বা হাত নেড়ে প্রীতি অভিনন্দন জানাচ্ছেন। কিছুক্ষণ বাদে প্লেন চলতে স্থরু করল মাটির সঙ্গে সম্পর্কহীন, কাত হয়ে উড়ছে উপরের দিকে। নীচে চেয়ে দেখছি আমাদের হিজ মাষ্টারস্ ভয়েস্ গ্রামোফোন স্টুডিও, মনে পড়ল ধনঞ্জয় বাবুর রেকর্ডিং হবে। দশটায় আরম্ভ। নিশ্চয় তা হ'লে এতক্ষণে আরম্ভ হ'য়ে গেছে।

হালকা হালকা মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে বিমান উড়ে চলেছে। বহু উর্দ্ধে উঠে গেছি, নিচে ধানের ক্ষেতগুলোকে দেখছি, যেন সবুজ গালিচা বিছান রয়েছে। ঝোপ ঝাড় জঙ্গল, আঁকাবাঁকা পথঘাট। নদী নালা রূপোলী রেখার মত গিয়ে মিশেছে দূর দিগন্তে। ঝিনুকের মত নৌকাগুলো। স্টীমার দেখছি কলার খোলের মত ভাসছে নদীর মোহানায়। গ্রাম, জনপদ ডিঙ্গিয়ে উড়ে চললাম পূর্বদিগন্তের পানে।

পিকিং যাত্রী আমরা সাতজন প্রতিনিধি এক সঙ্গে। আমি ও অমিয় মুখার্জি (পশ্চিম বাংলা শান্তি সংসদ) ছাড়া সবাই দিল্লী

থেকে উঠেছেন। আমার পাশে ও সামনে ছিলেন বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীত্রিলোক সিং, লক্ষ্ণৌর জনপ্রিয় চিকিৎসক ডাঃ ফরিদি ও লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিলের সভ্য শ্রীগোবিন্দ সা।

ডাঃ ফরিদি বড় রসিক লোক। পরিচয় ঘটবার পর থেকে রহস্যালাপের আর অন্ত নেই। প্লেনের মধ্যে মধ্যাহ্নের খাবার দিয়ে গেল প্রত্যেকের সামনে। একটা ছোট ট্রের মত টেবিল, তার মধ্যে বিলেতী রান্নার খাবার, আধসেদ্ধ মাংস অনভ্যস্ত হাতে ছুরি-কাঁটা দিয়ে কাটতে আমরা প্রায় গলদ্ ঘর্ম হবার যোগাড়। ফরিদি সাহেব মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছিলেন। ব্যাপারটা উপভোগ করলেও তিনি সবিশেষ খাতির দেখালেন, মন্তব্য না ক'রে।

এইবার আমরা আরও উঁচুতে, প্রায় চৌদ্দ হাজার ফিট উপরে উঠে গেছি। কখনও দেখছি সারা আকাশ জুড়ে মেঘেরা দল বেঁধে ছুটেছে ভাটিয়ালী গানের সেই 'মেঘা রাণীর' দেশে। কখনও বা দেখছি বঙ্গোপসাগরের জলরাশি শীতল পাটির মত নিথর।

এমনি করে আরও কিছুক্ষণ চলবার পর হোস্টেস্ এসে কোমরে বেল্‌ট এঁটে দিতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার কাণে তুলো দেবার উপদেশ! প্লেনে আমাদের অংশে প্রায় কুড়ি বাইশ জন ছিলেন, সবাই যেন নড়ে চড়ে বসতে লাগলেন।

হাওয়াই জাহাজ ক্রমেই এবার নীচের দিকে নাম্‌ছে অনুভব করছি। টিলার উপর ঝোপ ঝাড়ের মধ্য দিয়ে মাথা বের করা ঘর বাড়ীগুলো এবার স্পষ্ট হতে লাগল। অবশেষে রেঙ্গুনের বিমান ক্ষেত্রে এসে প্লেন যখন মাটি স্পর্শ করল তখন আমার ঘড়িতে তিনটে পঁচিশ মিনিট।

রেঙ্গুন এরোড্রোম থেকে বি-ও-এ-সির দেড়তলা বাসে ক'রে

চলছি শহরের দিকে। তখন প্রচণ্ড ধারায় বৃষ্টি হচ্ছিল। কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখছি পাশের গাছপালা, দোকান, বাড়ী ঘরগুলোর চেহারা। লোকে জল ঝড় মাথায় করে ভিজতে ভিজতে চলেছে অসহায়ের মত। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ভিজে একজন বৃদ্ধ কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে চলেছে শীতে কাঁপতে কাঁপতে। কংক্রীটের প্রশস্ত রাস্তার পাশে শ্রীহীন জীর্ণ কুঁড়ে ঘরের মত দোকানগুলো,—টিঁকে থাকবার জন্য বৃষ্টি বাদলের সঙ্গে যেন আপ্রাণ লড়াই করে চলেছে। অর্ধেকটা ঝাঁপ খুলে দোকানী অষ্টাবক্র মুনির মত কুঁজো হয়ে বসে ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করছেন।

এইবার জলটা একটু কমে আসছে। অল্প বৃষ্টি সহ্য ক'রে কিছু কিছু লোক রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। রাস্তায় জীর্ণ শীর্ণ, শতছিন্ন-মলিন জামা পরা লোকের অভাব নেই। আমাদের চোখ এ দৃশ্যে অভ্যস্ত।

রেঙ্গুনের বিখ্যাত স্ট্রাণ্ড্ হোটেলের সামনে বাস থামতেই আমরা নেমে পড়লুম। রাত্রে এই হোটেলেই থাকতে হবে। হাত-মুখ ধুয়ে বেশভূষা বদলে আমরা কয়েকজন একখানা ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম শহরটা ঘুরব বলে।

সাড়ে আটটায় ডিনার। নানাদেশের সাদাকালো মানুষ বিভিন্ন টেবিল ঘিরে ব'সে। বেশির ভাগই ইওরোপীয়ান পোষাকে সজ্জিত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উর্দিপরা বেয়ারা আহার্য পরিবেশন নিয়ে ব্যস্ত। আমি তখন ধুতি পাঞ্জাবী পরা খাঁটি বাঙ্গালী পোষাকে। আমি, অমিয় বাবু ও দিল্লীর ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী মিঃ শর্মা একই টেবিলে বসেছি। একজন বেয়ারা এসে, "বাবু কি খাইবেন" বলাতে সচকিত্ হয়ে ওর দিকে তাকাই—আমাদের পূর্ববঙ্গের ভাষা! জিজ্ঞাসা করে

জানলাম ওর বাড়ী ঢাকা, এখানকার অধিকাংশ পাচক বা পরিবেশক পূর্ববঙ্গের মুসলমান। কতদিন এখানে আছে জানতে চাইলে সে বলল, "জাপানী আইয়া এই সুন্দর শহরটা যখন তছনছ্ কইরা ফালাইছিল তখন আমি এই শহরেই আছিলাম বাবু।" ওর কাছে আরও শুনলাম জাপানীদের হাতে রেঙ্গুন থাকাকালীন উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকদের কার্যকলাপ।

আমরা চীনে যাচ্ছি শুনে লোকটি যেন মহা খুশি হ'ল। বলল, "চীন যাইবেন—আহাহা, শুন্‌ছি সোনার দেশ হইছে। রাতারাতি মানুষগুলার বরাৎ ফিরাইয়া ফালাইছে। ক্যান্ যাইবেন?" ও জিজ্ঞাসা করে। আমি বললাম, কোরিয়ার যুদ্ধ আরও বিস্তৃত হ'য়ে আমাদের দেশ অবধি না পৌঁছায় সেই চেষ্টায়।

"ও বড় ভাল কাজে যাইতেছেন বাবু। গত যুদ্ধে মজাটা টের পাইছি। যুদ্ধের শুরুতে বেশ দুই পয়সা আয় হইত, টাকাডার কম বকশিস্ কেউ দিত না; কিন্তু যখন বোমা পড়তে শুরু হইল তখন পলাইতে পথ পাই না। টাকা দিয়া কি করুম, জীবনে না বাঁচলে! উঃ সে কি কষ্ট! এক বালতি জল বিকাইছে এক টাকায়।"

পূর্ববঙ্গের মুসলমান পরিবেশক, মাত্র আধঘণ্টার আলাপ, হয়ত কোনদিন তার সঙ্গে আর দেখা হবে না, কিন্তু ভুলব না তার সহজ সরল সেই কথা, "বাবু, বিদ্যাশে নিজ দ্যাশের মানুষ দেখ্‌লে কি আনন্দই না লাগে।" আর বেছে বেছে আহার্য এনে অতি যত্ন সহকারে খাওয়াবার কথাও কি কোনদিনই ভুলতে পারব!

আমাদের দেশের মতই এদেশের ভিক্ষুকেরাও দেখছি বিদেশী লোক দেখলে আরও উৎসাহের সঙ্গে ভিক্ষা চায়। কেন? নিজের দেশের মানুষেরা আজ ভিক্ষা দেবার ক্ষমতারও বাইরে নাকি?

বিখ্যাত প্যাগোডা দর্শন ক'রে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। আমাদের কলকাতার কালীঘাট মন্দির বা জ্যাকেরিয়া স্ট্রীটের নাখোদা মসজিদ থেকে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে যে দৃশ্য দেখা যায় তার সঙ্গে সত্যই তুলনা করা চলে। ধর্মপ্রাণ মানুষদের অন্ততঃ পুণ্য লোভার্থেও কিঞ্চিৎ দানের স্পৃহা হবে মনে করেই ভিখারীর দল মন্দির মসজিদ কিংবা প্যাগোডার কাছে আশ্রয় নেয়।

হোটেলের টেবিলে, বিদেশী সিনেমা হলের উঁচু আসন গুলিতে, পথে, হাট-বাজারে, মোটরে, বিলিতি সাহেবদের দেখলে ও তাদের গালগল্প শুনলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে সে-দেশের কলকারখানা, তেল, রবার ও খনি শিল্পের মালিক এখনো বিদেশী বণিকরাই রয়েছে।

বর্মার শান্তি-সংসদ (পীস কাউন্সিল)-এর একজন বড় নেতা পিপলস্ ইউনাইটেড পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড তিন্-পের সঙ্গে আলাপ হ'ল, তিনি আমাদের হোটেলে এলেন। খাওয়া দাওয়ার পর তাঁকে নিয়ে অনেক রাত অবধি নির্জন রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম। দোকান প্রায় সবই বন্ধ, কেবলমাত্র দু'একটি খাবারের দোকান এবং চুরুট সিগারেটের দোকান ছিল খোলা। ফুটপাতে আশ্রয় নেবার মত লোকের অভাব ছিল না। অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক দিক থেকে ব্রহ্মের অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়, তার বহু তথ্য-প্রমাণ কমরেড্ তিন্-পের কাছ থেকে শুনলাম।

স্বাধীনতার গোলক ধাঁধাঁয় বর্মার মানুষরা আমাদেরই মত ঘুরপাক খাচ্ছে, রাজনীতিজ্ঞ না হলেও আমার পক্ষে তা বুঝতে একবেলাই যথেষ্ট।

পরের দিন ২০শে সেপ্টেম্বর সকাল সাতটায় আমরা আবার

রওনা দিলাম আকাশপথে। নীচের ঘরবাড়ী হিজিবিজি নালা নদী, পথঘাট ক্রমেই অস্পষ্ট হতে লাগল। পাহাড় জঙ্গল ডিঙ্গিয়ে সমুদ্রের দিকে এসে পড়েছি। এবার আমরা মহা শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি, মেঘের রাজ্য ছাড়িয়ে বহু উর্ধ্বে উঠেছি—নীচে তাকিয়ে দেখি সারা আকাশ জুড়ে মেঘেরা খেলা করছে। কেবলই মনে হচ্ছিল আজ সেই রূপালী মেঘের রাজ্য ভেদ ক'রে চলেছি কোন এক অজানা নব-রূপকথার দেশের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে।

হঠাৎ অনুভব করলাম যেন নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ে হাওয়াই জাহাজ নামতে সুরু করেছে। আস্তে আস্তে ঘরবাড়ী, খাল বিল, ফসল ভরা ক্ষেত স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। পাতার তৈরি প্রকাণ্ড টুপী মাথায় নৌকার মাঝি লগি ঠেলে এগুচ্ছে খাল বেয়ে। তরুগুল্মে আচ্ছাদিত টিনের কুঁড়ে ঘর ইতস্তত ছড়িয়ে আছে।

৯টা ১৫ মিনিটে থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাংককের এরোড্রোমে এসে প্লেন নামল। বিশ্রামকক্ষের সঙ্গেই বিরাট রেস্তোঁরা. বি-ও-এ-সির যাত্রীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনগুলোর একটিতে বসেছি। আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন অসম্ভব স্থূলকায় এক ভদ্রলোক। বোধ হয় করাচী থেকে উঠেছিলেন, হংকং অবধি যাবেন। ধনী ব্যবসায়ীর দুলাল—বয়স অল্পই হবে। রাঙা মূলোর মত গায়ের রং, বিনা কারণেই মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসেন। লোকটি আমার পাশেই খেতে বসেছেন। মাখন সহযোগে পাঁচ পিস রুটি, বড় বড় সিঙাপুরী কলা ডজনখানেক, তারপর এক চুমুক চা গিলেই একবার তাকালেন। আমার চোখে চোখ পড়তেই আবার সেই বিনা কারণে সোয়া-পাঁচ ডিগ্রী এ্যাঙ্গেলের এক হাসি। এবার আমিও হাসলাম, কেন তা জানি না।

শরীরের ওজন অনুযায়ী যদি প্লেনের ভাড়া হ'ত, তা হ'লে ভদ্রলোকটি গিয়েছিলেন আর কি। সুবিধা হ'ত আমাদের অন্ধ্রের প্রতিনিধি মিঃ রেড্ডির। ওয়েটিং রুমের কোথাও রেড্ডিকে দেখতে পাচ্ছি না—একটু খোঁজাখুঁজির পর দেখলুম কি একটা কাগজ মনোযোগ সহকারে পড়ছিলেন তিনি মোটা ভদ্রলোকটির ঠিক পেছনে, একেবারে চীনের প্রাচীরের ও পাশে আর কি!

রেঙ্গুনেও দেখেছি, এই ব্যাংককেও দেখছি এরোড্রোমটি যেন শুধু ইওরোপীয়ানদের জন্যই তৈরী। প্লেনে যারা ওঠেন, নামেন তাদের প্রায় সবাই সাহেব-মেম বা তাদের কাচ্চা-বাচ্চারা।

প্লেন ছাড়ল। দুরন্ত বেগে জাহাজ উড়ে চলেছে হংকং অভিমুখে। কলকাতা থেকে হংকং-এর এগার আনা পথ আসতে আমার হাত-ঘড়িকে হার মানিয়ে বেলা গেছে দু'ঘণ্টা এগিয়ে। অর্থাৎ সাড়ে বারোটায় হোস্টেস্ এসে যখন লাঞ্চের আয়োজনে ব্যস্ত, আমার ঘড়িতে তখন বাজে সাড়ে দশটা।

মহা শূন্যের উপর ভেসে চলেছি, মাথার উপর অনন্ত নীল আকাশ, নীচে প্রশান্ত মহাসাগর যেন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। এইবার আবার মধ্যাহ্ন ভোজনের পালা। ১৪ হাজার ফিট উঁচুতে বসে, ভেড়ার রোস্ট, সিদ্ধ ডিম, টিনে রাখা বিলেতী মাছের পাত্‌রি, টমেটোর স্যাণ্ডউইচ্ বেশ মজা করে খাচ্ছি। যা খেতে দিয়েছিল সবই প্রায় সাবাড় করেছি। মেম-সায়েব এসেছেন আরও কিছু লাগবে কিনা জিজ্ঞাসা করতে। যেখানে দেখছি অন্য সকলের প্লেটেই কিছু না কিছু পড়ে আছে, সেখানে আমি আবার চাই কি করে। এই যে পাত সাফ করে খেয়েছি এইটাই কি ভদ্রতার পর্যায়ে পড়ল?

বিমান চলেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ ও পাহাড় উল্লঙ্ঘন করে। সূর্য

মাথা ছাড়িয়ে পিছনের দিক হেলেছে। প্রচণ্ড রোদ বিমানের পাখার উপর পড়ে চিক্ চিক্ করছে। এইবার আকাশ অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ। বহুদূরে টুকরা টুকরা মেঘ মুক্ত-আকাশে বিচরণ করছে বাধাহীন স্বাধীন গতিতে।

পাইলটের ঘর থেকে একজন অফিসার এসে হাতে একখান কাগজ দিয়ে গেলেন। আধঘণ্টা পরেই হংকং-এ পৌঁছাব। নতুন চীনের হেইনান দ্বীপ পিছনে ফেলে আমরা ২৩৮ মাইল বেগে ১০,০০০ হাজার ফিট্ উঁচু দিয়ে চলেছি।

কাঁচের জানালা দিয়ে খুব উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছি ঐ তো সমুদ্রের আরেক প্রান্ত!............নতুন চীনের মাটি আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে। খুব বেশি দূরে বলে তো মনে হয় না? ....কিন্তু বিমানের লোকেরা বলেন পঞ্চাশ মাইল দূর হবে।

ছোট ছোট পাহাড় জল ফুঁড়ে নাক জাগিয়ে রয়েছে। বহুদূরেও দেখছি সারি সারি পাহাড় যেন আকাশে হেলান দিয়ে দিবা নিদ্রায় মগ্ন। পৃথিবীটা যে কত সুন্দর কত বিচিত্র, বোঝাবার সাধ্য কি আমার আছে?...........উপরে গাঢ় নীল আকাশ। নীচে গাঢ় নীল স্বচ্ছ সমুদ্র। সূর্য অপেক্ষাকৃত তেজোহীন। অদূরে দেখা যায় হংকং দ্বীপ—অপ্সরার মত মনোমোহিনী সাজে সজ্জিতা।

হংকং

প্রশান্ত মহাসাগরের প্রান্তে অসংখ্য পাহাড় বেষ্টিত ছোট দ্বীপ হংকং।............দুপাশের পাহাড়গুলোর গায়ে পায়ে মাথায় অসংখ্য ইটপাথরের বাড়ীর মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে বিশাল বিশাল গগনচুম্বী অট্টালিকা। উঁচু নীচু পরিষ্কার রাস্তা। অসংখ্য জাহাজের

মাস্তুল দেখা যাচ্ছে আশে-পাশে ও খাড়িতে। ষ্টিমার লঞ্চ, মোটর-বোট তু'তীর ছেয়ে র'য়েছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অদ্ভুত ধরনের নৌকা চলেছে একাধিক পাল খাটিয়ে।

অতি বিচিত্র বন্দরটির মাথার উপর বার তিনেক ঘুরে পাক খেয়ে পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে উড়োজাহাজ মাটীতে নাম্‌ল। যদিও আমার ঘড়ি তখন কলকাতার সময় দিচ্ছে মাত্র তুটো পনর মিনিট।

কাস্টমসের বেড়াজাল ভেদ করে বাইরে এসে বি-ও-এ-সির বাসে চলেছি বন্দরের ভিতরের দিকে। বিলেতী ফ্যাশনে সাজান গোছান দোকানগুলো তু'পাশে ফেলে উত্তুঙ্গ পাহাড়ের কোল ঘেঁসে, উঁচু-নীচু মসৃণ রাস্তা দিয়ে এয়ার ওয়েজের সিটি অফিসের সামনে এসে বাস থামল।

আমাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য ইংরেজী-জানা কয়েকজন চীনা যুবক প্রতীক্ষা করছিলেন। এয়ার অফিসের সামনেই স্থানীয় বিখ্যাত "কৌলুন হোটেলে" তাঁরা আমাদের নিয়ে এলেন।

বৃটিশের অধীন অবাধ বাণিজ্যের (ফ্রি পোর্ট) এই বন্দর, খাড়ির ওপারটাকেই হংকং বলে, আর এপারের নাম হচ্ছে কৌলুন।

ওপারটাই পুরানো বন্দর। রাতে লুঠেরা ব্যাপারীদের কাজ কারবার, দিনের বেলায় ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালতের জম-জমাটি, হৈ চৈ ওপারেই বেশি হয়। বিমান ক্ষেত্র, রেল অফিস, আধুনিক হোটেল, সিনেমা এবং আনন্দ স্ফূর্তির উপকরণগুলো বেশির ভাগই এপারে। তু'এক মিনিট অন্তর শত সহস্র যাত্রী বোঝাই খেয়া স্টীমার এপার ওপার করছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য সত্যিই চমৎকার।

প্রকাণ্ড প্রাসাদের মত বাড়ীর পাঁচতলার এক প্রকোষ্ঠে আমার ও অমিয়বাবুর জন্য থাকবার ব্যবস্থা হল। ঘরে বিশ্রাম করবার পুর্বেই "তাকুং ওয়েন্ পাও" ও "মেন উই পাও" নামে স্থানীয় দু'খানা প্রগতিশীল দৈনিক কাগজের দু'জন চীনা প্রেস রিপোর্টার এসে হাজির হলেন।

তাঁরা আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করলে বিজ্ঞ ব্যক্তির মত আমি যা উত্তর দিয়েছিলাম তা এখানে না বলাই ভাল। কেউ কেউ হয়ত আমায় ধমক দিয়ে বলে বসবেন, পরের দেশে গিয়ে নিজেদের দুঃখ দুর্দশার কথা ফাঁস করে দিয়ে এলে কেন হে বাপু!............এ সমস্ত কলঙ্কের কথা বিদেশী লোকদের জানিয়ে দেওয়া তোমার কি উচিত হয়েছে!

"কৌলুন হোটেলের" নীচের তলায় বিরাট এক খাবার-ঘর। এখানে ব্যাণ্ড বাদ্য, বল নৃত্য, পান ভোজনের অতি অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।

তাড়াতাড়ি রাত্রের খাবার শেষ করে শহরটা একটু ঘোরাঘুরি ক'রে দেখে বেড়াব ঠিক করেছি। নীচে নামতেই অদ্ভুত ঐক্যতান বাদ্যের তালে তালে স্থানীয় চীনা রমণীদের হাতে হাত মিলিয়ে, বিভিন্ন জাতের শ্বেতাঙ্গ ভদ্রমহোদয়গণের লম্ফ ঝম্ফ নৃত্য দেখে আমাদের চক্ষু তো চড়ক গাছ।

নানাদেশের উচ্ছৃঙ্খল সৈনিক অফিসার, ধনী ব্যবসায়ী বা তাদের প্রতিনিধিগণ সন্ধ্যা উপভোগ করতে হাজির হন এই হোটেলে, আর হংকং-এর দেহ-বিলাসিনীরা আসে ঠিক সেই সময়টাতেই জাঁদরেল শিকার পাকড়াবার উদ্দেশ্যে।

রাত্রি দশটায় পাঁচতলার বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে. দেখছি

হংকংএর রাত্রির অপরূপ দৃশ্য। অসংখ্য আলোর মালা পাহাড়ের সারা গায়ে। খাড়ির মধ্যে চলাচল করছে কত শত জলযান। নিকটে, দূরে, আরও বহুদূর সমুদ্রে অসংখ্য জাহাজ রয়েছে যেন ঘাঁটি আগলিয়ে। সবই প্রতীয়মান হচ্ছে আলোর গতিবিধির মধ্য দিয়ে।

চীনে যাবার পথে মাত্র এক রাত্রি ছিলাম এই হংকং-এ, কিন্তু ফেরবার সময় প্লেন বিভ্রাটের জন্য থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম চারদিন। এই হংকংকে ভাল করে প্রত্যক্ষ করেছি ফেরবার সময়ই।

বিকেলে রাস্তায় বেরুলে দেখা যায় একদল আট দশ বছরের চীনা বালিকা, শ্রীহীন রুগ্না। বিদেশী কোন লোক দেখা মাত্র ঝোলা থেকে ফুল বার করে অপরিচিতের জামার বুক পকেটের কাছে গুঁজে দিয়েই হাত পাতে ভিক্ষার জন্য।

এখানকার উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকদের কাণ্ড দেখে শিউরে উঠেছি। আশ্চর্য হয়ে গেছি,—এরা যাদের ভাড়া খাটছে পাইকারী ভাবে মানুষ-হত্যার চুক্তি সই ক'রে—সেই সভ্যতা-গর্বী 'শ্রেষ্ঠ-মানবেরা' এখন কোথায়। হাজার হাজার মাইল দূরে মহাসাগরের ওপ্রান্তে বসে তারা হয়তো যুদ্ধের ছক আঁটছে। তাদের যদি একবার এনে দেখান যেত এদের অপকীর্তি, দেখে তারাও হয়তো লজ্জা পেত, নিজেদের সভ্য বলার আগে অন্তত গলা একবার কেঁপে উঠত।

প্রশস্ত রাস্তার তে-মাথায় দাঁড়িয়ে অর্ধ উলঙ্গ সৈনিক ল্যাম্প-পোস্টে মদের বোতলের মাথা ভেঙ্গে—ঢক্ ঢক্ করে প্রায় সবটাই পান করে। তারপর রাস্তার গণিকাদের উদ্দেশ্যে শিস্ দিয়ে কুৎসিৎ ইঙ্গিত করতে থাকে। ভদ্র মেয়েরা এই জাতীয় সৈনিকদের এড়িয়ে কম পক্ষে অন্তত দু'শ ফুট দূরে থেকে অলি গলির পথ দিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে চলেন।

বিপরীত দৃশ্য দেখে এসেছি মাত্র কুড়ি মাইল ব্যবধানে মহাচীনের মাটিতে। সেখানকার সৈনিকদের সংস্পর্শে গিয়ে অভ্যর্থনা গ্রহণ করেছি, অভিনন্দন বিনিময়, এমন কি নিজ ভাষায় গান শুনিয়ে করমর্দন, আলিঙ্গন ও প্রশংসা পেয়েছি। কি করে এখন বোঝাব —তাঁরা শিক্ষিত আদর্শ মানুষ। দেশের শান্তি রক্ষা করা, সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে মহান ঐক্য ও মৈত্রী চিরসংস্থাপিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে ও দেশের সৈনিকেরা। তারা অভাবে পড়ে মার্কিন সৈন্যদের মত মাসিক তিরিশ ডলারে নিজেদের বন্ধক দিয়ে আসেনি কোটিপতিদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে। ওরা সৈনিক হয়েছে দেশাত্মবোধের মহৎ আদর্শের অনুপ্রেরণায়।

উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকেরা হংকং বন্দরের হোটেল পথঘাট জঁাকিয়ে আছে। মালয়, ভিয়েৎনাম, কোরিয়ার পাপ কার্যে লিপ্ত হবার পুর্বে এখানে আনা হয় তাদের চাঙ্গা করার জন্য।

আন্তর্জাতিক বন্দর এই হংকং। ইংরেজ, মার্কিন, ফরাসী কুটনৈতিক কুচক্রীদল এশিয়ার বুকে আরও কিছুদিন সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন টিঁকিয়ে রাখবার প্রচেষ্টায় যে অমানুষিক হীন কীর্তি-কলাপ চালিয়ে যাচ্ছে, তার পক্ষে স্থানটি যেমন খুবই সুবিধাজনক তেমনি গুরুত্বপুর্ণ। বিশেষ করে বিগত বহু শতাব্দীর অন্যায় শোষণে জর্জরিত যে-চীনদেশের মানুষেরা মারাত্মক আঘাত হেনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের শিকড় পর্যন্ত নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছে, সেই চীনদেশের বিরুদ্ধে নতুন করে যুদ্ধায়োজনে লিপ্ত এই সাম্রাজ্যবাদী কুচক্রীদল। তাই হংকং বন্দর ঘিরে খাড়িতে খাড়িতে রয়েছে ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ জাহাজগুলো। এদেরই ক্রীড়নক হিসাবে চিয়াং কাইশেক সারা পুর্ব-এশিয়ার মানুষের পুর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য দালালের ভুমিকায় অংশ-গ্রহণকারী।

স্থানীয় অধিবাসী সবাই চীনা। আশ্চর্য, অধিকাংশই রাজনৈতিক চেতনাহীন। মাত্র কুড়ি মাইল দূরে মুক্ত চীনের মাটিতে কি যুগান্তর ঘটে যাচ্ছে তার কোন খবরই এরা রাখে না। জানবার উপায়ও কম। কাগজ আছে বিভিন্ন মতবাদের। অধিকাংশই পূর্বোক্ত কুচক্রীদের কুক্ষিগত। তাদের খবর সরবরাহ-প্রতিষ্ঠান গুলোর বাহাদুরীও উল্লেখযোগ্য! কোরিয়া ও নয়াচীন সম্বন্ধে নিত্য নতুন অদ্ভূত অদ্ভূত আজগুবি খবর নিজেরাই তৈরী করে সারা পৃথিবীর পুঁজিতন্ত্রী দেশগুলোতে তারা ছড়িয়ে দিচ্ছে। সব থেকে মজার ব্যাপার হ'ল এখানকার তৈরি খবরের উপর ভিত্তি করেই রাষ্ট্রসঙ্ঘে একদল স্বার্থান্বেষী প্রতিনিধি নেচে কুঁদে আস্ফালন করে আসর গরম করার চেষ্টা করছে। এই সমস্ত যুদ্ধবাজ কুমতলব-কারীদের মুখোস যাতে না ফাঁস হয়ে পড়ে, তার জন্যই চীনের কোন প্রতিনিধি আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘে স্থান পেলেন না।

স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে কর্মহীন ও চরম দুর্দশাগ্রস্ত লোকের সংখ্যা যথেষ্টই হবে। পুবেই বলেছি হংকং-এর অধিকাংশ লোকই রাজনৈতিক চেতনাহীন, কিন্তু তবুও একথা সত্য যে, শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক আজ প্রগতিশীল চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত। তিন খানি দৈনিক কাগজ, যারা নতুন চীনকে সমর্থন করে এবং সেদেশ সম্বন্ধে প্রতিদিনই সত্য খবর পরিবেশন করে চলেছে, তাদের বিক্রয় সংখ্যা আশাপ্রদভাবে বর্ধিত হচ্ছে। এই কাগজগুলি বিশেষ করে ছাত্রমহলে খুবই প্রিয়।

মনে পড়ছে চীন থেকে ফেরার পথে হংকং-এ আসার ঠিক পরের দিনই এক দোকানে গিয়েছিলাম ক্যামেরা কিনতে। আমার জামার বুক পকেটের কাছে তখনও আঁটা ছিল চীনা লোক-সরকারের দেওয়া

মাও সে-তুং এর মূর্তি খচিত একটি ব্যাজ। দোকানী এবং আরও কয়েকজন খুব ঝুঁকে ব্যাজটি নিরীক্ষণ করে দুর্বোধ্য ভাষায় আলোচনা জুড়ে দিল। আমি প্রথমে খুব অস্বস্তিই বোধ করছিলাম কিন্তু একটি যুবক (দোকানীরই ছেলে) খাসা ইংরেজী ভাষায় প্রশ্ন করল—"চীন দেশে গিয়ে কি দেখে এলে?"—"কি করে বুঝলে আমি চীন ফেরতা?" বললাম আমি। "ও আমরা জানি—কাগজে দেখেছি" বলে স্থানীয় একখানা দৈনিক কাগজ ভিতর থেকে এনে দেখাল। দেখলুম পিকিং শান্তি সম্মেলনের বহু ছবি বিশেষ করে আমাদের ভারতীয় প্রতিনিধিদের কয়েকটা উল্লেখযোগ্য ছবি তাতে বেরিয়েছে। কাগজখানি চীনা ভাষায়।

মনে আছে এর পরে রীতিমত আদর অভ্যর্থনা পেয়েছিলাম। ভরসা করে জাঁকিয়ে ব'সে চীন সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসের মাথায় অনেক কিছু বলে ফেলেছিলাম। যুবকটি আমাদের জানিয়েছিল, ক্যাণ্টনে তাদের বাড়ী রয়েছে। এতদিন 'বলশেভিক দস্যুর' ভয়ে দেশে যেতে সাহস করেনি, অবশ্য তার বাবাই ছিল এই ব্যাপারে বেশি ভীতু।······কিন্তু এখন তাদের ভয় যে অমূলক তার বহু তথ্য নজির পেয়ে গেছেন বলে আগামী বসন্তে দেশে ফিরে যাবেন মনস্থ করেছেন।

তার বৃদ্ধ বাপও সায় দিয়েই বলেছিলেন, "তুমি বিদেশী হয়েও আমাদের দেশ সম্বন্ধে যে উচ্ছসিত প্রশংসা করলে তাতে আমরা আরও স্থির নিশ্চয় হলুম যে আমাদের চীন দেশের বর্তমান নেতারা আমাদের স্বার্থের প্রতিকূল নন।" ক্যামেরাটি তিনি ন্যায্য দামেই বিক্রী করেছিলেন! আসবার সময় বার বার খুব হুঁসিয়ারী দিয়েছিলেন কোন জিনিস কেনার আগে দামটা যেন রীতিমত যাচাই করে নিই। এর নাম হংকং!

স্টার কোম্পানীর ফেরী স্টীমারঘাট, তার সামনেই বাস-এর টারমিনাস। হাফ্‌প্যাণ্ট পরা চীনা রিক্সাওয়ালা শূন্য রিক্সা নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পথিক মাত্রকেই মিনতি জানায় ওর রিক্সা ব্যবহারের জন্যে। এখানকার রিক্সাগুলো সবই হাতে-টানা। শুধু রিক্সা চালিয়ে যাদের পেট ভরে না, তারা অন্য ব্যবসাও করে।... অপরিচিত বিদেশীকে নিয়ে তারা এমন জায়গায় ঠেলে নিয়ে যেতে পারে যেখান থেকে আক্ষরিকভাবেই পলায়ন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই, তবে রিক্সাভাড়া বাবদ অর্থদণ্ড কিছু পকেট থেকে খসতে পারে।

হংকং-এর মানুষ বৃটিশের অধীনে খুব 'কড়া' শাসনের মধ্যেই রয়েছে। স্থানীয় সাধারণ মানুষ, দোকানদারেরা বলে, সাবধান, আস্তে কথা বল! ভুলেও বেফাঁস রাজনৈতিক কোন বাক্য মুখে এনো না। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী, হোটেল, এমন কি হয়ত এই দেওয়ালেরও কাণ থাকতে পারে। এ কাণগুলো আমেরিকান, বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগের কাণ। সুতরাং সাবধানে কথা বলাই ভাল।—আর দরকারই বা কি তোমার? এসেছ যখন এখানে, চিত্তবিনোদনের স্থানগুলির সদ্‌ব্যবহার না করা তোমার পক্ষে খুবই মুর্খের কাজ হবে। এত সস্তায় ভাল মদ সারা এশিয়া খুঁজলেও কি পাবে? তা ছাড়া আনুষঙ্গিক সব ব্যবস্থার জন্য এই স্থান কি কম 'সুনাম' অর্জন করেছে? হ্যাঁ—ছিল বটে এককালে সাংহাই, বনেদী স্ফুর্ত্তির মহাপীঠস্থান। কিন্তু কেমন! কমিউনিস্টরা দিয়েছে তো স্থানটির বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে? ওদের কি ধম্মজ্ঞান আছে? রাতারাতি ইঙ্গ-মার্কিন ভদ্রলোকদের মহা ফ্যাসাদে ফেলে দিল আর কি! শেষে এক এক সাহেব দু'চারটা করে মেয়ে আর মদের বোতলগুলো নিয়ে হংকং এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে!

হংকং এর বাহ্যিকরূপ সত্যই মনোরম। যে কোন বিদেশীকে আকৃষ্ট করার মত। রূপসী হংকংকে নাকি বিদেশী এক কবি নাম দিয়েছেন রাণী হংকং।

এই স্বর্গতুল্য হংকং আমার কাছে কিন্তু নরকের মত কুৎসিত বলেই মনে হয়েছে। হংকং যদিও বা রাণী হয় তা হলে ফ্রান্সের লক্ষ লক্ষ মানুষের হাহাকারের মধ্যে ছিল যার সাম্রাজ্য সেই সৌন্দর্যময়ী বিলাসিনী রাণী মেরী এ্যাণ্টয়েনেটের সঙ্গেই হংকং-এর তুলনা করতে হয়।......

* * *

নতুন চীন

২১শে তারিখ বেলা ১১টা ১৫ মিনিটে ট্রেনে উঠেছি। কয়েকটা স্টেশন পেরিয়ে ১২-৩০ মিনিটে বৃটিশ সাম্রাজ্যের শেষ সীমানা লোহো (Lowho) স্টেশনে এসে গাড়ী থামতেই আমরা নেমে পড়লুম।

ছোট খালের উপর একটা সাঁকো। এপারে বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদীদের ইউনিয়ন-জ্যাক যা আমরা পুরুষানুক্রমে দেখে অভ্যস্ত, আর ওপারে নতুন চীনের পাঁচটি সোনার তারকা লাঞ্ছিত লাল নিশান সগর্বে মাথা উঁচু করে পত্ পত্ করে উড়্ছে।

পাসপোর্ট দেখিয়ে আমরা সাঁকো পেরিয়ে এবার নয়া চীনের মাটিতে এসে হাজির হলাম। পিপ্‌লস্ লিবারেশন আর্মির একজন (জনগণের মুক্তি-ফৌজ) অফিসার আমাদের অভ্যর্থনা করে কাঁটা তারের লম্বা বেড়ার পাশ দিয়ে নতুন রেলওয়ে স্টেশন 'শ্যানচুন' (Shyanchun)-এ নিয়ে এলেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্টেশনটি।

লাউড্‌স্পীকারে সমবেত রেকর্ড-সঙ্গীত বাজান হচ্ছিল। বড় বড় দেশনেতাদের প্রতিকৃতি বা দেশের অগ্রগতির বিভিন্ন রূপ সমন্বিত চিত্র দেওয়ালের গায়ে টাঙ্গান রয়েছে। কয়েকজন শ্রমিক আশেপাশেই কাজ করছিলেন, আমাদের দেখে তাঁরা হাততালি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে লাগলেন। ক্যারম-জাতীয় এক রকম খেলা ছোট লাঠি দিয়ে খেলতে হয়, কয়েকজন যুবক তাই নিয়ে মগ্ন। প্ল্যাটফর্মের স্টলের মধ্যে চীনা ভাষায় বহু বই, প্রচার-পত্র ও পত্রিকা রয়েছে ; কিছুলোক সেখানেও ভীড় করেছিলেন ; একটি লম্বা টেবিলের দু'পাশে চেয়ারগুলোতে বসে কয়েকজন নিবিষ্টমনে বই পড়ছিলেন, —সবাই এগিয়ে এলেন সোল্লাসে। ঘণ্টা খানেক পরে একটি ট্রেন এসে থামল। ট্রেন থামতেই, আট দশজন ছেলেমেয়ে হুড়মুড় করে নেমে পড়ল। ওরা সবাই ক্যান্টন, পিকিং কিংবা সাংহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবার জন্য এসেছে সবাই, প্রত্যেকেই ইংরেজী জানে। এরাই আমাদের দেখাশুনা এবং দোভাষীর কাজ করবে বলে জানাল।

আমরা ট্রেনে উঠতে কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ী ছাড়ল। সামনের প্রথম কামরা থেকে একেবারে পিছনের শেষ কামরা অবধি যাওয়া চলে, এমনভাবে 'করিডরের' ব্যবস্থা রয়েছে। একে একে সব কামরাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছি। ট্রেনের প্রত্যেকটি কামরায় এক একটি করে লাউড্ স্পীকার। শেষের দিকে ছোট এক কামরায় ব্রড্‌কাস্টিং রুম। কখনও রেকর্ড বাজান হচ্ছে, কখনও বা যে-জায়গাগুলোর মধ্য দিয়ে গাড়ী যাচ্ছে সেই সমস্ত জায়গার ঐতিহাসিক কোন ঘটনা বা বর্তমান সময়কার বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ব্যাপার বর্ণনা করে চলেছেন এক অল্পবয়স্কা মহিলা। চীনে আরও কয়েকবার ট্রেনে

ভ্রমণ করেছি, সর্বত্রই একই ব্যবস্থা। যাত্রীদের মধ্যে কেউ যদি গান, আবৃত্তি বা বক্তৃতা করার মত থাকেন, তাঁদের সহযোগিতা কামনা করে ব্রড্কাস্টিং রুম থেকে ডাকা হয়।

ট্রেনের কামরাগুলো এয়ার-কণ্ডিশন (তাপ নিয়ন্ত্রণ) করা। গাড়ীর ক্লাশ দু'রকম, আমরা যে গাড়ীতে আছি সেগুলো গদি-আঁটা, অপর গাড়ীর বেঞ্চিগুলো কাঠের, অন্যান্য বন্দোবস্ত সবই এক। যাত্রীদের জন্য একটু বাদে বাদে বিনে পয়সায় পেয়ালাতে করে চা ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে। কাঠের বেঞ্চিতে বসে একটি মহিলা নিবিষ্টমনে লাউড্স্পীকারের গান বা বক্তৃতা শুনছেন, আর হাতে উলের জামা বুনে যাচ্ছেন। মনে পড়ে যায় আমাদের দেশের তৃতীয় শ্রেণীর রেলের কামরার কথা। গাড়ীর দেওয়ালে—ইংরেজী, উর্দু, হিন্দী ও বাংলা চার ভাষায় লেখা "চব্বিশজন বসিবেক" অথচ সেখানে বসেছেন হয়ত চুয়ান্নজন, কেউ বেঞ্চিতে, কেউ বাক্স-পেটরায়, কেউবা বাঙ্কের উপরে। যে কোনও ট্রেনেই হোক, বসার জায়গা নিয়ে কথা কাটাকাটি এমন কি হাতাহাতি পর্যন্ত হয় না এমন ঘটনা বিরল। আমার এক বন্ধুর বাবার নিজের মুখে গল্প শোনা—"সাবধান, চোর জুয়াচোর আপনার নিকটেই আছে" বিজ্ঞাপন দেখে হুঁসিয়ার হবার জন্য পকেটে হাত দিতেই দেখেন কর্ম আগেই কাবার।

কিন্তু এখানকার ট্রেনে এমন হুঁসিয়ারী বিজ্ঞাপন দেওয়ালে ঝোলে না। কারণ শুধু ট্রেনে কেন, সারা চীন দেশ খুঁজলেও একটি চোর ডাকাত মেলা দুষ্কর হবে। আর যাত্রীদের ভীড় কমাবার জন্য বেশি ট্রেনের ব্যবস্থা করেছেন রেল-কর্তৃপক্ষ। গাড়ীর ভিতরটা খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আবর্জনা ফেলবার জন্য একটা বালতির মত রয়েছে, তাতে লম্বা কাঠের হাতলের সঙ্গে একটা ঢাকনা আছে,

হাতল ধরে ঢাকনি খুলে ওখানেই সবাই ফেলছে থুথু কিংবা সিগারেটের টুকরা। অবশ্য আবর্জনা ফেলবার এই আধারটি সমগ্র চীনেরই একটা বৈশিষ্ট্য, স্টেশনে, সিনেমায়, হাসপাতালে, কলেজে চীনের সর্বত্রই এই ব্যবস্থা।

ট্রেন চলেছে দু'পাশের বিস্তৃত শস্য শ্যামল মাঠ পেরিয়ে। মাঠের মধ্যে দু' একটি ঝোপ-জঙ্গল, মনে হয় আমাদের দেশেরই কোন জায়গা দিয়ে চলেছি। মাথায় পাতার তৈরী বড় টুপী, নীল পাজামা ও জামা-পরা কৃষক রমণীরা ক্ষেতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। এক একটি করে ছোট বড় গ্রাম্য স্টেশন পেরিয়ে চলেছি। এক-ইটের গাঁথুনি, টালির দোচালা ঘর নিয়ে বাড়ীগুলো। বাড়ীর সামনে পাতকুয়ো থেকে মেয়েরাই জল তুলছে। হাঁস মুরগী আঙিনায় চ'রে বেড়াচ্ছে। দু' একটি রাস্তা মাঠের মধ্য দিয়ে দূরদূরান্তরের ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়েছে।

গাড়ীর মধ্যে চমৎকার এক ডাইনিং রুম। দ্বিপ্রাহরিক খাওয়ার ব্যবস্থা এখানেই করা হয়েছে। ইংরেজী-জানা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অতি অল্প সময়ের আলাপ পরিচয়ের মধ্য দিয়েই আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা জন্মে গেল। আমি ও কুমারী চেন ইন-ইউ এক টেবিলে খেতে বসেছি। ১৭৷১৮ বছরের মেয়ে। ক্যান্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবার গ্রাজুয়েট হয়েছেন। বোন যেমন বড় ভাইকে 'ভাই-ফোঁটার' দিন এটা ওটা আরও বেশি খাও বলে আব্দার করতে থাকে তেমনিভাবে ওর ইচ্ছানুযায়ী আমায় খেতে বাধ্য করল সে যা হোক ভালই লাগছিল কিন্তু।

দিগন্ত-বিস্তৃত ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট উইয়ের ঢিবির মত দু'একটা পাহাড়। পাহাড়ের

গায়ে সাদা সাদা পাথরে-বাঁধান কবরগুলো দেখা যায়। মাঝে মাঝে দু'একটি খাল। নৌকা চলেছে 'গঞ্জের' দিকে।

বেলা পড়ে এল। অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আলো ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্ত প্রসারী সুফলা শস্যক্ষেত্রের উপর। কলকাতা থেকে ট্রেন পশ্চিমের দিকে রওনা হ'লে যেমন দু'পাশে সংখ্যাহীন অনাবাদী পতিত জমি দেখতে পাওয়া যায়, এখানে দেখছি তার সম্পূর্ণ বিপরীত। মাঠে মাঠে শস্যের সমারোহ। একতিল জমি চীনের বহুদেশ ঘুরেও দেখতে পাইনি, যেখানে চাষ হয় না। অবশ্য কমরেড লো'র কাছে গল্প শুনলাম বিপ্লবের আগে সেখানেও অনাবাদী জমির সংখ্যা খুব কম ছিল না। চাষীদের অপেক্ষাকৃত উঁচু, শুক্‌নো জমি রোদে ফেটে চৌচির হয়ে পড়ে থাকত। আকাশের দিকে চেয়ে জল জল বলে কাতরভাবে ভগবানকে ডাকত। জল না পেলে কঠিন মাটিতে মান্ধাতার আমলের লাঙ্গলের ফলা যে এক ইঞ্চিও ঢুকবে না! যদি বা কখনো দৈবের দয়ায় "মেঘারাণী হাত ধুয়ে দিল পানি," তো মাটি চষা হ'ল। সার-বীজহীন দুর্বল কচি শস্য প্রচণ্ড রোদের তেজে হয়ত আবার পুড়ে শেষ হ'ত। চাষীরা কপালে করাঘাত করত। নির্দয় ভগবানের উপর অভিমান ক'রে, আর তাঁকে ডাকবে না বলে শাসাত, আত্মহত্যা করবে বলে ভয় দেখাত। কিন্তু ভগবান সেদিকে কর্ণপাত না করলেও জমিদার তার বন্দোবস্ত ঠিকই করত। খাজনা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে আত্মহত্যার রাস্তা সুগম করে দিত।

"হোয়াইট হেয়ার্ড গার্ল" (শুক্লকেশী তরুণী) নামক বিখ্যাত অপেরাটিতে দেখেছি তখনকার দিনের বাস্তব চিত্র। জমিদারের অত্যাচারে চাষীর আত্মহত্যা করেও নিস্তার নেই। চাষী-কন্যার দেহ

অপবিত্র হল। সে বাধ্য হল ঘরছাড়া সমাজছাড়া জীবন ধারণে। তার মনে জাগল প্রতিশোধ নেবার দুর্জয় সঙ্কল্প।

তখনকার নিরীহ চাষীরা জানত না যে জল পেতে হ'লে তিন ক্রোশ দূরে যেতে হয় না, জল আছে মাটির বিশ ফিট্ নিচেই। নদীর গতি রোধ ক'রে সেচ ব্যবস্থার কথা তখন তারা কল্পনাই করতে পারতো না। বিগতদিনের চাষীদের দুঃখ দৈন্যের সে সব কথা ভেবে কমরেড লো আজও শিউরে ওঠেন।

আমাদের কাকদ্বীপের কৃষকদের মত হয়ত দু'একটি জেলার কৃষকেরা দাবি দাওয়া নিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার চেষ্টা করতেন। তখনই এগিয়ে আসত জমিদারদের অন্তরঙ্গ বন্ধু চিয়াংএর আমলা কর্মচারীরা মার্কিন মুলুকের তৈরি বন্দুকের সাহায্যে তারা আন্দোলন দমিয়ে দিতে চেষ্টা করত। আজ সে দিনের অবসান হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ঐ চাষীরাই শহরের শ্রমিকদের সঙ্গে এক হয়ে চিয়াং-এর সৈন্যগুলোর হাত থেকে মার্কিন বন্দুক ও অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে এমন তাড়া করল যে শেষ পর্যন্ত তাদের প্রধান সেনাপতিটি দক্ষিণ চীন-সাগরের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে পালিয়ে যেতে বাধ্য হ'ল। সেখানে সেই কাপুরুষ বিষদন্তহীন সর্পের মত ফোঁস্ ফোঁস্ করছে।

চাষীদের আজ কিন্তু জলের জন্যে আর নির্দয় ভগবানের কাছে মিনতি করতে হয় না। জমিদারের অত্যাচারে আত্মহত্যা করতে হয় না। সারা চীনদেশের প্রত্যেক চাষীর প্রতি ইঞ্চি জমিতেই আজ বৈজ্ঞানিক প্রথায় সেচ ও কৃষিব্যবস্থার পত্তন করা হয়েছে। জমিদারের কবলমুক্ত জমির শস্য-উৎপাদন বছরের পর বছর বেড়েই চলেছে। মরুভূমির মত মাটি জলে ভিজে আজ হ'তে চলেছে শস্যশ্যামল। আদিম মরচে-পড়া কৃষিযন্ত্রগুলো যাদুঘরে স্থান পেতে

সুরু করছে। কল্পনার অতীত নয়া কৃষি-ব্যবস্থা আজ চাষীদের প্রাণে নতুন জোয়ার এনে দিয়েছে। অতি ভয়াল রাক্ষসীর মত হুয়াই নদীর প্রলয়ংকরী গতি আজ হয়েছে রুদ্ধ। বন্যার ফলে আশে পাশের চাষীদের আর প্রতি বছর গৃহহীন বা জমিহীন হ'তে হয় না। আমাদের আসামের ব্রহ্মপুত্র বা বাংলার দামোদরের দু'পাশের দুর্ভাগা মানুষের মত আজ প্রকৃতির দিকে চেয়ে আর তাদের কপালে করাঘাত করতে হয় না। সে দেশের নেতারা প্রকৃতির দয়ার উপর লক্ষ লক্ষ নরনারীর ভাগ্য ছেড়ে দেন নি।

গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে মাত্র ছ'মাসের মধ্যে কুড়ি লক্ষ লোকের পরিশ্রমে আজ উদ্ধত হুয়াই নদীর বেপরোয়া গতিবেগ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হয়েছে। যুগ যুগান্তর ধরে ভগবানের দুয়ারে ধর্না দিয়েও যা সম্ভব হয়নি মানুষের চেষ্টায় আজ তা হয়েছে। চীনের প্রকৃত বন্ধু সোবিয়েৎ ইউনিয়নের কয়েকজন বিশেষজ্ঞের সহায়তায়, চীনের সাধারণ মানুষের তৎপরতায়—মাত্র চব্বিশ সপ্তাহে এ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

ক্যাণ্টনে

সূর্যদেব বিদায় নেবার মুখে—গোধূলির ঈষৎ আলোয় অদূরবর্তী ক্যাণ্টন নগর চোখের সম্মুখে জেগে উঠল।

ক্যাণ্টন রেলওয়ে স্টেশনে এসে গাড়ী যখন থামল, লাউড্ স্পীকার থেকে ভেসে আসতে লাগল—"সারা দুনিয়ার সব মানুষের একটিমাত্র মন," ঐক্যতান বাদ্যসহযোগে একতার সমবেত সঙ্গীত। আমরা শ্যানচুন স্টেশনে প্রবেশ করেও এই গান শুনেছিলাম।

আলোয় আলোয় উদ্ভাসিত—সঙ্গীতঝংকারে সারা স্টেশনটি যেন গম্ গম্ করছে। প্ল্যাটফরমে গলায় লাল রুমাল বাঁধা শত

শত 'ইয়ং পাইওনিয়ার' ছেলে মেয়ে ফুলের গুচ্ছ নিয়ে দাঁড়িয়ে। ট্রেন থেকে একে একে নীচে নাম্‌তে লাগলাম। একটি করে ফুলের তোড়া এক একজনের হাতে দিয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে অভিবাদন করেই আমাদের তারা জড়িয়ে ধরতে লাগল। যেন আমাদের বহুদিনকার চেনা। পেছনের সারিতে দাঁড়িয়ে আরও একদল ষোল-সতের বছরের ছেলেমেয়ে। যুব-সংঘের ছাত্র ছাত্রীরা লাউড স্পীকারের গানের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তালে তালে হাত তালি দিয়ে সম্বর্ধনা জানাতে লাগল। বিভিন্ন খবরের কাগজের ফটোগ্রাফার ছবি তুলতে ব্যস্ত। মুভি ফিল্ম-এ ফটো তোলা হচ্ছে দু'দিক থেকে। এ এক কল্পনাতীত অপূর্ব পরিবেশ! সুস্নিগ্ধ আলো আর এই সুমধুর সঙ্গীতে অভিভূত হয়ে গেলাম, যেন স্বর্গের তোরণ দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি; দেবশিশুরা যেন আমায় ঘিরে রয়েছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে শান্তি সংসদের অভ্যর্থনা সমিতির নেতারা। স্মিতহাস্যে করমর্দন করতে লাগলেন প্রত্যেকের সঙ্গে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আমাদের নিয়ে চলেছে প্ল্যাটফরমের বাইরের দিকে—যেখানে আমাদের জন্য সারিবন্দী মোটর অপেক্ষা করছিল।

বাইরে এসে দেখছি আরও অসংখ্য ছাত্র, শ্রমিক শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে। কণ্ঠে তাদের সঙ্গীত। হাততালি দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে লাগল তারা। আমরা এক এক জন প্রতিনিধি এক একটি গাড়ীতে উঠলাম, সঙ্গে এক একজন দোভাষী ছেলে কিংবা মেয়ে, যারা আমাদের সঙ্গে ট্রেনেই আসছিলেন।

কুমারী চেন্ ইন-ইউ আমার সঙ্গে এলেন গাড়ীতে। ক্যাণ্টনের সহস্র সহস্র নাগরিক রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন। রাস্তার মোড়ে মোড়ে, দু'পাশে কিংবা এপার থেকে ওপার অবধি

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লাল কাপড়ে চীনাভাষায় লেখা প্রচার-বার্তা। শান্তি সম্মেলনের প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন ক্যাণ্টনের নাগরিকবৃন্দ ; —তাই ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলিতে।

গাড়ী এসে থামল সেখানকার রাষ্ট্রের নিজস্ব "আই চিউন" (জনগণের ভালোবাসা) হোটেলের সামনে। পনের তলা প্রকাণ্ড বাড়ীর সাত-তলার উপর একটি অতি চমৎকার কক্ষে আমার থাকবার স্থান হ'ল।

রাত্রি আটটার সময় স্থানীয় শান্তি সংসদের অভ্যর্থনা সমিতি আমাদের জন্য এক ভোজ সভার ব্যবস্থা করলেন। চীন দেশীয় রান্নার ডিম, মাছ, মাংস, শাক-সব্‌জি ইত্যাদি উনিশ রকম ব্যঞ্জনে আমাদের তাঁরা আপ্যায়িত করলেন। তখনকার মত আমাদের নেতা ছিলেন শ্রীগোবিন্দ্‌ শাহ্‌। স্থানীয় শান্তি সংসদের নেতৃবৃন্দের বক্তৃতার পর আমাদের তরফ থেকে শ্রীগোবিন্দ্‌ শাহ্‌ স্থানীয় শান্তি সংসদ ও জনসাধারণকে অভিনন্দন জানালেন।

পরের দিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন কাচের জানালা ভেদ ক'রে সূর্যের রক্তিম আভা এসে পড়েছে আমার ঘরখানিতে। হোটেলের সামনেই পার্ল নদী। অসংখ্য নৌকা, ছোট স্টীমার, লঞ্চ, মোটর বোট—নদীতে যেন ঝিলমিল করছে। মেয়েরা দু'হাতে দু'খানা বৈঠা নিয়ে নৌকা বেয়ে চলেছে। একটা মোটর বোট দেখলাম এপার ওপার করে বেড়াচ্ছে। ফেরী মনে হ'ল। নদীর ওপারে দু'একটা কারখানার চিমনি থেকে কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠেছে। অতি মনোরম দৃশ্য।

ছোট্ট জাহাজের মত দেখতে বিভিন্ন প্রকার রঙ্‌করা সুদৃশ্য এক রকম দোতলা বোট দেখতে পাচ্ছি। এখানে এই বোটকে বলে 'হি-সোয়ান'। পাশাপাশি তিন চারটি ঘাট। প্রত্যেক ঘাটেই অমনি

দু'একটা 'হি-সোয়ান' বাঁধা রয়েছে। বোট ঘাটে ভিড়তেই হুড়মুড় করে যাত্রীরা মোট ঘাট নিয়ে নেমে পড়ে। এগুলো এখানকার পুরানো জলযান। প্রতি সন্ধ্যায় শহর থেকে যাত্রী ও মালপত্র বোঝাই করে বিভিন্ন লাইনে বোট পাড়ি জমায় গ্রামের দিকে। গ্রাম থেকেও নিয়মিত যাত্রী নিয়ে কতকগুলো বোট প্রতি সকালে ক্যাণ্টনের ঘাটে এসে ভেড়ে। গ্রাম থেকে এই হয়ত এল ; ঝুড়ি ঝুড়ি ডিম কিংবা বাঁশের খাঁচায় করে কেবল হাঁস, মুরগীই হয়তো নামাচ্ছে। আবার হয়ত পাশের জেটিতে আর একটা বোট এসে থামল। যাত্রী নামবার পর দেখছি চার পা বাঁধা শূয়োর একটার পর একটা লরীতে এনে গাদা করছে।

নীচের রাস্তায় অগণিত লোক চলেছে গাঢ় নীল রংএর জীনের ফুলপ্যাণ্ট, গলা-বন্ধ কোট ও মাথায় একরকম টুপী পরে। কারুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলার পর্যন্ত কারও যেন ফুরসৎ নেই। পথের পাশে দাঁড়িয়ে জটলা করা বা কোন রকম হৈ হল্লা নেই।

আমার ঘরের টেবিলে রাশীকৃত ফল। সিগারেট, দেশলাই। ফ্লাস্ক্ ভর্তি গরম জল। স্নানঘরে প্রসাধনী আধারের উপর একেবারে নতুন টুথপেস্ট, তোয়ালে, গন্ধতেল, এমন কি ক্রীমের শিশি পর্যন্ত সাজান রয়েছে। ঘরে ব্যবহারের জন্য একজোড়া বেতের তৈরি জুতোও রাখা আছে।

প্রাতরাশ সেরে মোটর করে শহর ঘুরতে বেরিয়েছি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তা। আশে পাশে একটুকরা ছেঁড়া কাগজ পর্যন্ত চোখে পড়ছে না। অথচ কুমারী চেন্ ইন-ইউর মুখে শুনলাম মুক্তি ফৌজ এই শহরে প্রথম প্রবেশ করেই পথ ঘাটের নোংরা জঞ্জাল সাফ করেছে প্রায় পঁচিশ টনেরও বেশি।

পথচারী সাধারণ মানুষদের হাবভাব পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে বুঝতে কোনই কষ্ট হয় না যে ওরা স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখতে শুরু করেছে।

বাইরে বেরিয়ে প্রথমে গেলাম সেখানকার পীপলস্ স্টেডিয়াম দেখতে। মাত্র সাড়ে চার মাসের মধ্যে তৈরি হয়েছে। ষাট হাজার লোক ব'সে এবং দাঁড়িয়ে আরও দশ হাজার লোক খেলা দেখতে পারেন এমন সে স্টেডিয়াম। দেখে সত্যি তাজ্জব বনে গেলাম। কি করে সম্ভব হয় এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন একটি বিরাট সুদৃশ্য স্টেডিয়াম তৈরী করা? মাইনে-করা শ্রমিক ছাড়াও স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে কারখানার বা অন্যান্য দেশভক্ত শ্রমিক, ছাত্র-ছাত্রী, যুবকগণ তাঁদের অবসর সময়ে এই গঠনমূলক কাজে স্বেচ্ছায় এসে অংশ গ্রহণ করেছেন সে কাহিনীও শুনলাম। দাঁড়িয়ে স্টেডিয়াম দেখছি আর ভাবছি আমাদের কলকাতার ফুটবল মাঠের কথা,—ইষ্টবেঙ্গল, মোহনবাগান টিমের খেলা; তিন দিন আগে থেকে ক্রীড়ামোদীরা বিছানা বাক্স নিয়ে খেলার মাঠে হাজির হচ্ছেন সুদূর পল্লী ও শহর থেকে। ধস্তাধস্তি মারামারি করে কেউ কেউ খেলা দেখলেন বটে, তাও অতি উচ্চ মাশুল দিয়ে। ব্যবস্থাপকদের হাতে টাকার কতখানি অভাব তা জানি না, কিন্তু এইটুকু জানি যে সুব্যবস্থার জন্য প্রতি বছরই প্রয়োজন হয় তাদের পুলিশের সাহায্য নিতে! প্রতি বছর খেলার সিজ্‌নে খবরের কাগজ বা নাগরিকদের তরফ থেকে মাঝে মাঝে স্টেডিয়ামের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা বা দাবিও ওঠে বটে, কিন্তু খেলার ক'মাস পরে আর কোন উচ্চবাচ্য শোনা যায় না।

সেখানকার ব্যবস্থাও নাকি একদিন আমাদের দেশের মতই

ছিল। খেলা নিয়ে দলাদলি মারামারি, খেলার সিজ্‌নে জুয়াড়ীদের যেন মরসুম লেগে যেত। সে দিন এখন অতীতের ইতিহাস!

একটু দূরে দুটি সুইমিং পুল তৈরি হচ্ছে। একটি বড়দের জন্য, যেখানে পঞ্চাশ হাজার লোক বসতে পারবে। ছোটদের জন্য যেটি সেখানে তিরিশ হাজার লোক বসে সন্তরণ ক্রীড়া দেখতে পারবে। শত শত শ্রমিক কাজ করছিলেন সেখানে। একদল সামনের ক্যান্টিনে পান-ভোজন করছেন। শ্রমিকদের মধ্যে কিছু মেয়েও দেখলাম, খুবই স্বাস্থ্যবতী; পুরুষদের সঙ্গে যেন সমান তালে পা ফেলে কাজ করে চলছেন।

তারপর সেখান থেকে গেলাম হ্যাংইয়াং রেলওয়ে এড্‌মিনিষ্ট্রেশন ব্যুরোতে (ব্যবস্থাপক সংঘ), রেলওয়ে শ্রমিকদের জন্য তৈরি কোয়ার্টার দেখতে। অতি আধুনিক ধাঁচে কংক্রিটের তৈরি দোতালা বাড়ীগুলো। সব একই রকমের বড় রাস্তার পাশেই পর পর তিন সারিতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অনেকগুলো বাড়ী। এক একটা বাড়ীতে অনেকগুলো করে ফ্ল্যাট, একশো শ্রমিক-পরিবারে থাকবার ব্যবস্থা রয়েছে। পরিবারের লোক অনুযায়ী দু'খানা তিনখানা করে ঘর বেঁটে দেওয়া হয়েছে। আমরা যেতেই কয়েকজন মহিলা ও পুরুষ শ্রমিক আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। পুরুষেরা তখন বেশীর ভাগই কাজে বেরিয়ে গেছেন। সুতরাং মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। আমাদের আমন্ত্রণ করে ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে দেখাতে লাগলেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নতুন-কেনা আসবাবপত্রই বেশীর ভাগ শ্রমিকদের ঘরে দেখলাম। দেয়ালের গায়ে নেতাদের ছবি টাঙান। মাও সে-তুংএর ছবি আছে প্রতি ঘরে ঘরেই। কোন কোন ঘরে টেলিফোন ও রেডিও দেখেছি। মেয়েরা আগ্রহ সহকারে দেখাতে লাগলেন, এমন কি রান্নাঘরে

নিয়ে পর্যন্ত। ভাবি, আমাদের দেশের রেলওয়ে শ্রমিকদের বাসস্থানের কথা; বহু শ্রমিককে দেখেছি কোম্পানীর পরিত্যক্ত রেলের মালগাড়ীতে থাকতে। রেলওয়ে কুলীদের বেশীর ভাগই প্ল্যাটফর্মে রাত্রি যাপন করে থাকে। আর শ্রমিকদের জন্য রেলওয়ে কোয়ার্টার মানে ছোট্ট এক একটি কবুতরের খোপ, যার মধ্যে এক এক ঘরে বাস করছেন হয়ত গোটা পরিবারের লোক। জল কল নিয়ে এঘর ওঘরের লোকদের ঝগড়াঝাটি মারামারি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।

সেখানে একজন বর্ষীয়সী মহিলার সঙ্গে আলাপ হল। তাঁর স্বামী রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেন। সারা জীবনই তাঁদের কেটেছে অস্বচ্ছলতার মধ্য দিয়ে। ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দেবার মত সামর্থ্য না থাকায় প্রাইমারী স্কুলেই বড় ছেলের পড়া বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। ভাল পোষাক পরা বা সিনেমা অপেরা দেখতে যাওয়ার কথাত কোনদিন কল্পনাই করতে পারেন নি। কিন্তু গণ-ফৌজ এই সহরে প্রবেশ করার পরদিন থেকেই তাদের জীবনে একের পর এক যেন অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটতে লাগল। শহরের আবর্জনা পরিষ্কার হ'তে লাগল। পুরানো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আরও বিস্তৃত হ'ল। নতুন নতুন আরও তৈরি হতে লাগল। ক্লাব বা সাংস্কৃতিক ভবন তৈরি হ'তে লাগল। নার্সারী কি জিনিষ তাই তিনি আগে জানতেন না। আর আজ তাঁরই ছোট ছেলে-মেয়ে দু'টো সেখানে বিনা পয়সায় মানুষ হয়ে উঠছে। সত্যই তিনি আজ আশ্চর্যান্বিত হ'য়ে ভাবছেন তাদের দেশনেতারা না পারেন এমন কোন জনহিতকর কাজই নেই। তাদের এই রেলওয়ে শ্রমিকদের বাড়ীগুলো তৈরী হ'য়ে গেল, ঐ

সাংস্কৃতিক ভবন, ক্লাব ঘর মনোরম উদ্যান, বিদ্যালয় সবকিছু যেন সম্পূর্ণ হয়ে গেল চায়ের গরমজল ফুটতে যা সময় লাগে তারও আগে। কবে যে কি ঘটছে হিসাব রাখাই মুস্কিল! স্বামী কাজ শেষ করে এক একদিন যেন এক একটা সুখবর নিয়ে বাড়ী ফেরেন। কোনদিন ফিরে বলেন তার বার্ধক্যের সময়ের জন্য "সমাজ বীমা" ব্যবস্থা চালু হ'ল, তার জন্য মাইনে থেকে এক ইয়ানও কাটা যাবে না। কোনদিন এসে খবর দেন ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে বা শিশু নার্সারীতে পাঠাতে আমাদের আর কোনই খরচ দিতে হবে না। শুনে আজগুবি মনে হ'লেও এ অতি বাস্তব সত্য। আমাদের নিজের চোখে সব কিছু ভাল ভাবে পরখ করে দেখতে উপদেশ দেন তিনি।

একটু দূরেই রয়েছে নার্সারী ও একটি প্রাইমারীস্কুল। নার্সারীতে শিশুদের বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণে খেলাধূলার মধ্য দিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটি ঘরে দেখলাম একজন শিক্ষয়িত্রীর পিয়ানো বাজনার তালে তালে পা ফেলে কুড়ি-বাইশটি শিশু কেমন মজাদার ভাবে স্যালুট করে গান গাইছে। অপর ঘরের ছেলেরা নানান্ রকম মডেল তৈরি নিযে ব্যস্ত। ঘর বাড়ী, কারখানা, রেলের রাস্তা—আরও কত কী! এই নার্সারী ও প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষার জন্য ছেলে মেয়েদের কোন ফী দিতে হয় না।

চমৎকার নতুন নতুন সব দোকান; হাসপাতাল ও একটি বিরাট ক্লাব বা সাংস্কৃতিক ভবনও সেখানে রয়েছে। বহু বই, ম্যাগাজিন, পত্র-পত্রিকা দেখলাম। দু'জন মহিলা লাইব্রেরীয়ান এক মনে বই-এর হিসাব করছিলেন। এক হাজার লোক বসার উপযুক্ত একটি

বিরাট হল দেখলাম সেখানে। প্রতি সপ্তাহেই নৃত্য, অপেরা বা সিনেমা দেখান হয়ে থাকে।

২৩শে সেপ্টেম্বর খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠ্‌তে হ'ল। ক্যাণ্টন থেকে প্রায় দেড় হাজার মাইল দূরে পিকিং। প্লেনে যাবার ব্যবস্থা হ'য়েছে। প্রাতরাশ সেরে মোটরে করে বিমান ঘাঁটির দিকে রওনা হলাম। ক্যাণ্টনের শান্তিসংসদের কয়জন বিশিষ্ট নেতা এবং ইয়ং পাইওনিয়ারের ছোট্ট ছোট্ট ছেলে মেয়েরা এসেছেন আমাদের প্লেনে উঠিয়ে দিতে। আমাদের জন্য অর্থাৎ প্রতিনিধিদের জন্যই এই বিশেষ প্লেনের ব্যবস্থা। দশটায় প্লেন ছাড়ল। কাঁচের জানালায় ঝুঁকে দেখছি। সহরতলীর বাড়ী ঘর রেল রাস্তা পথ ঘাট ডিঙিয়ে উড়ে চলেছি। নদীর উপর কয়েকটা ষ্টীমার ভাসছে, নৌকা সারিসরি—তিন চারিটি নদী মিশেছে মোহানায়, তার পাশেই একটা গঞ্জের মত। পিঁপড়ের মত সার দিয়ে মানুষ চলেছে—সবই অস্পষ্ট দেখছি। ছোট ছোট পাহাড়, ক্ষেত, খাল, নদী, গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে চলেছি।

ঘণ্টা তিনেক পর হ্যাঙ্কাউ বন্দরের বিমানঘাঁটি ইউ চ্যং এরোড্রোমে এসে প্লেন থামল। প্লেন থেকে নামতেই প্রথমে ইয়ং পাইওনিয়ারের বালক বালিকারা এক একটি করে ফুলের তোড়া দিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে লাগল। স্থানীয় শান্তি সংসদের নেতাদের সঙ্গে কমরেড লো আলাপ করিয়ে দিলেন। করমর্দন বিনিময়ের পর বিমান ঘাঁটির রেস্তোরাঁয় হাজির হ'লাম। স্থানীয় শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে ও দীর্ঘ জীবন কামনা করে বক্তৃতা করলেন। আমাদের তরফ থেকে শ্রী গোবিন্দ শাহ ও গুজরাটের বিখ্যাত কবি শ্রীউমাশঙ্কর যোশী বক্তৃতা

করলেন। ইয়ং পাইওনিয়ার মেয়েরা গান গাইলেন। অবশেষে আমার গানের পর অনুষ্ঠান শেষ হল।

১২-১৫ মিনিটে আমাদের নিয়ে প্লেন আবার আকাশে উড়ল। এইবার প্লেন চলেছে চীনের অন্যতম সুবৃহৎ নদী ইয়াংসির উপর দিয়ে। বর্তমান চীনা লোক-সরকারের আর এক মহৎ কীর্তি এই ইয়াংসি নদীর বাঁধ নির্মাণ। প্লেনের জানালার দিকে সবাই ঝুঁকে পড়েছে বাঁধ দেখবার জন্য। প্রস্তর নির্মিত প্রকাণ্ড বাঁধ তৈরি ক'রে কূলপ্লাবী বন্যাবেগকে ভীষণভাবে জব্দ করা হয়েছে। নদীর আশে-পাশের গ্রাম, গঞ্জের লোকেরা কোনদিন কল্পনাই করতে পারেন নি যে বন্যা রোধ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হ'তে পারে। দক্ষিণ চীন মুক্ত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লোক-সরকার যখন বন্যা প্রতিরোধ পরিকল্পনা ঘোষণা করল তখন অধিকাংশ গ্রামবাসী, বিশেষ করে বৃদ্ধ বৃদ্ধারা তো হেসেই কুটিকুটি! ভগবান যা করেন তার উপর মানুষের কেরামতি কখনও খাটবে? একথা শুনেছে কেউ কখনো? আজ বুঝি সেইজন্যই গ্রামের অতি বৃদ্ধ বৃদ্ধারাও তাদের প্রিয় মাও সে-তুংকে ভগবানের মতই শ্রদ্ধা করে। ইয়াংসি নদীর দুপারের হাজার হাজার গ্রামের লক্ষ লক্ষ চাষী যখন তাকিয়ে দেখে আদিগন্ত বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রগুলির দিকে, যখন তাদের মনে পড়ে একদা বন্যাক্লিষ্ট জমি আজ দু'তিনগুণ বেশী শস্য ফলায়, তখন তারা এই ব'লে আন্তরিক শুভেচ্ছা আর আশীর্বাদ জানায়—"কমরেড্ মাও তুমি দীর্ঘজীবী হও! আমাদের ঘর বাড়ী, গরু, ঘোড়া ভাসিয়ে নেবার ক্ষমতা যদি ইয়াংসির নষ্ট করতে পার······শুধু তাই নয়, ওর জল আমাদের ইচ্ছামত গম, ধান, কার্পাস ক্ষেতে ব্যবহারের স্থায়ী ব্যবস্থা

যদি তুমি করে থাকতে পার, তাহ'লে তুমি পারবে সারা পৃথিবীর মানুষের দুঃখ ঘোচাতে। তুমি দীর্ঘজীবী হও!"

কখনও কখনও ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে ছবিগুলো দেখছি। কখনও বা জানালা দিয়ে দেখছি নীচের ছোট অসংখ্য নদী ও বহুদূর বিস্তৃত শস্যভূমি। প্লেনের মধ্যেই আবার এক দফা খাওয়া দাওয়া হ'ল। বেলা পড়ে এলো; প্লেনের মহিলা কর্মী এসে জানালেন যে পিকিং নিকটবর্তী। এবার সবাই জানালা দিয়ে ঝুঁকে দেখছি। প্লেন খুব নীচু দিয়েই যাচ্ছিল, ক্ষেত-খামার, বাড়ী-ঘর, নদী প্রভৃতি বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

প্লেন যখন পিকিংয়ের মাটি স্পর্শ করল ঘড়িতে তখন বাজে ৪-৪৫মিনিট। আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্য গলায় লাল স্কার্ফ বাঁধা ইয়ং পাইওনিয়ারের দল ফুলের তোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে। স্থানীয় শান্তি সংসদের কয়েকজন নেতা সঙ্গে ছিলেন ও আমাদের কয়েকজন ভারতীয় প্রতিনিধি যাঁরা মাত্র দু'দিন আগে এখানে এসে পৌঁছেছেন তাঁরাও আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছেন। একে একে নীচে নামতেই কিশোর বাহিনীর ছেলে মেয়েরা একটি করে ফুলের তোড়া দিয়ে যথারীতি অভিবাদন করে আমাদের অভ্যর্থনা করল। নেতাদের সঙ্গে করমর্দনের পর বিশ্রাম-কক্ষে এসে দেখি আমাদের আরও অন্য কয়েকজন প্রতিনিধির সঙ্গে কিশোর বাহিনীর ছেলে মেয়েরা হৈ চৈ নাচ গানে উদ্দাম হ'য়ে উঠেছে। আমাকে দেখেই ছুটে এলেন ডেমোক্রেটিক ভ্যানগার্ডের শৈলেন পাল, ব্যবসায়ী বিজয় ব্যানার্জী ও বাংলার মহিলা নেত্রী পঙ্কজ আচার্য। বল্‌লেন "মশাই শীগ্‌গির মান বাঁচান, এখুনি গান সুরু

আপনার অভাবে আমরাই কোন রকমে চালিয়ে দিয়েছি। এখানে কোন রকমে গাইতে পারলেই হ'ল, কে আর এত বোঝে আমাদের ভাষা!"

বাস্তবিক কে যেন ঐ ছেলেমেয়েদের আমার দিকে লেলিয়ে দিয়েছে এই বলে যে আমি নাকি একজন "গাইয়ে ডেলিগেট"। আর যায় কোথায়! আমার হাত ধরে ছেলেমেয়েরা হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে এল ঘরের প্রশস্ত জায়গাটিতে। আমার এক হাতে তখন বি-ও-এ-সির দেওয়া একটি ছোট ব্যাগ, অপর হাতে ফুলের গুচ্ছ। একটি মেয়ে আমার হাত থেকে সব নিয়ে আমার বোঝা লাঘব করে আমায় গান ধরতে বলল। কি করি অগত্যা ধরতে হ'ল গান, 'নওজোয়ান, নওজোয়ান'। আমাদের সঙ্গে ধরলেন শান্তি কমিটির শৈলেন পাল, বিজয় ব্যানার্জী ও পঙ্কজ আচার্য। এইবার নাচ সুরু হ'ল—কেউই রেহাই পাচ্ছেন না। ঐ ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে শ্রীমতী পঙ্কজ আচার্য পর্যন্ত নাচতে বাধ্য হলেন।

পিকিং শহরে

মোটরে করে রওনা হলাম পিকিং শহরের দিকে। ৬টায় এসে হাজির হলাম পিকিং হোটেলে। সাততলা প্রকাণ্ড বাড়ী। দোতলার ২০৫ নম্বর ঘরে আমার ও মনোজদার স্থান হল। বিরাট হলঘরের মত এক কামরায় আমরা দু'জন ছাড়া আর ছিলেন বিখ্যাত আইনজ্ঞ, উত্তর প্রদেশের শান্তি কমিটির সহ-সভাপতি ব্রিজরাজ কিশোর।

হোটেলে প্রবেশ করলেই প্রকাণ্ড হল ঘর। তারই মধ্যে বাঁ

দিকে পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস, ব্যাঙ্ক ও স্টেশনারি দোকান। ডান দিকে বুক স্টল। বিভিন্ন ভাষার বই রয়েছে। হলঘরের দু'দিকেই টেবিলের চারপাশে কতগুলো করে সোফা পাতা রয়েছে। একটা লিফট্ অহরহ উঠছে নামছে। মাঝখানের বিরাট হলটি ছাড়া আরও দুটি প্রকাণ্ড হল রয়েছে। একটি নাচের ঘর ও অপরটিতে রয়েছে একটি স্টেজ। সাদা স্ক্রীনের উপর প্রকাণ্ড একটি শ্বেত কপোত আঁকা।

জামা কাপড় কাচতে বা চুল দাড়ি কামাতে বাইরে যেতে হয় না। লণ্ড্রী ও সেলুন নীচ তলাতেই রয়েছে।

রাত্রে শান্তি সংসদের অভ্যর্থনা কমিটি এক ভোজ সভার ব্যবস্থা করলেন। একুশ রকম চীনা রান্নার তরিতরকারি পরিবেশন করা হল।

ঘুম থেকে উঠেই দেখি কলা, আপেল, আঙ্গুর ইত্যাদি নানাবিধ ফল, শীতল পানীয়, চকোলেট, সিগারেট টেবিলের উপর রাশীকৃত সাজান রয়েছে। তাছাড়া সুইচ টিপলেই হোটেলের লোক এসে হাজির হবে। যা খুশি অর্ডার দাও, দুধ, কফি, কেক্, স্যাণ্ডউইচ্, কি চাই। তারপর বিল এনে দেবে, একটা সই করলেই লেঠা চুকে গেল। প্রত্যেক কামরাতেই এক একটি করে টেলিফোন রয়েছে। দরকার হলে শহরের যে কোন জায়গায় অথবা পাশের কামরার লোকদের সঙ্গে যতবার খুশি কথা বলতে বাধা নেই।

বিভিন্ন দেশ থেকে গণ্যমান্য দর্শক বা প্রতিনিধিরা দলে দলে এই নগরে এসে পৌছেছেন। "পিকিং হোটেল" পুরানো বনেদী হোটেল হলেও এত অতিথির স্থান সঙ্কুলান হওয়া সেখানে অসম্ভব, তাই তাড়াতাড়ি দরকার হল আর একটা হোটেলের।

সিং ইউ কোম্পানী চার মাসের মধ্যে দরকার মেটাবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। অবশ্য চার মাসেরও দরকার হয়নি, মাত্র পঁচাত্তর দিনের মধ্যেই এক বিরাট হোটেল তৈরি করে ফেললেন তাঁরা। হোটেলের নাম—'পীস্' বা 'শান্তি' হোটেল। আগে পিকিং হোটেলই এই শহরের সর্বোচ্চ বাড়ী ছিল, কিন্তু বর্তমানে তার চেয়েও উঁচু হ'ল "পীস্ হোটেল"।

প্রকাণ্ড আটতলা বাড়ী। স্বয়ংক্রিয় লিফ্‌ট দু'টো, নাচ ঘর, অভ্যর্থনা কক্ষ। অতি আধুনিক স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি সব কিছুই একেবারে ক্রটিহীন। প্রায় দু'শো অতি চমৎকার রুচিসম্মত ঘর নিয়ে এই বিরাট হোটেল। কি করে যে মাত্র পঁচাত্তর দিনের মধ্যে তৈরি হ'ল ভাবতেও আশ্চর্য লাগে।

পিকিং-এ পৌঁছেই শুনলাম যে "এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার শান্তি সম্মেলনের" তারিখ ২রা অক্টোবর পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাতে সুদীর্ঘ সময় পেলাম। এই সময়ের মধ্যে সম্মেলন উপলক্ষে আগত বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি ও অতিথি-বৃন্দের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করার প্রচুর সুযোগ ঘটল। সোবিয়েৎ কবি তারশুন জাদে, তুর্কি কবি নাজিম হিকমত, জাপানের প্রতিভাবান অভিনেতা নাকামুরা, চীনের বিখ্যাত নাট্যকার সাও ইয়েই, বিখ্যাত অভিনেতা মি-লান-ফাঙ এবং কলম্বো, কোস্টারিকা, চিলি, কানাডা ও অন্যান্য দেশ থেকে আগত শিল্পী সাহিত্যিকদের সঙ্গে যেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে লাগল। শান্তি আন্দোলনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ এই সব বুদ্ধিজীবীদের সাহচর্যে আমি অপূর্ব আনন্দ ও প্রেরণা পেলাম। প্রতি মুহূর্তেই কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে লাগলাম।

নয়াচীনের রাজধানী পিকিং চীনের বর্তমান ও অতীত ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ। এখানকার পথ, ঘাট, স্থাপত্য, ঘর-বাড়ী, প্রাচীর, লেক—সবকিছুই হল জাতীয় ঐতিহ্যের মূর্ত প্রতিচ্ছবি। মিঙ্ রাজবংশ ১৪০৩ খৃষ্টাব্দে চীন দেশের রাজধানী পিপিংফুর নাম বদল করে নতুন নাম দেয় পিকিং।

পাঁচলক্ষ বছর পূর্ব থেকে শুরু করে আজ অবধি পিকিং শহরের যে অত্যন্ত শিক্ষাপূর্ণ ইতিহাস তা নিয়ে গর্বভরে আলোচনা করে পিকিংবাসীরা। পাঁচলক্ষ বছরের পুরোনা কঙ্কাল, সে যুগের পাথরের অস্ত্রশস্ত্র, আগুনের ব্যবহার, এ ছাড়া আরও বহু প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায় পিকিংএর আশে পাশের অঞ্চল থেকে।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বৃটেন ও ফ্রান্স মিলে এই দেশ অধিকার করে। ১৮৮০ সালে আবার বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, ইটালি, জার্মানি, রাশিয়া, জাপান, অষ্ট্রিয়া এই আটটি শক্তি চীনকে পদানত করে। চরম লুণ্ঠনে ভয়াবহ ক্ষতিসাধন করে তারা।

গত মহাযুদ্ধে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে এই শহরের নরনারী নিদারুণভাবে লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হয়। সেখানকার বিখ্যাত নাট্যকার সাও ইয়েই-র কাছে গল্প শুনেছি, এই পিকিং শহর জাপানী ফ্যাশিস্টদের হাতে থাকার সময়কার (১৯৩৭-১৯৪৫) দুঃখের কাহিনী। শুনেছি, সারা শহরের মানুষকে গোলামে পরিণত করার চক্রান্তে লিপ্ত একদল দেশী বিশ্বাসঘাতক কিভাবে জাপানীদের সাহায্য করেছিল। শুনেছি, জাপানীরা পালিয়ে যাবার আগে সারা শহরময় যে ভীষণ লুটতরাজ খুন জখম চালিয়েছিল তার অতি সকরুণ কাহিনী—বলতে বলতে নাট্যকারের কণ্ঠস্বর আর্দ্র হয়ে যায়। এই শহরের নরনারী বহু দুঃখ কষ্ট সহ্য করেও বার

বার সংগ্রাম করেছেন এই সব সাম্রাজ্যবাদী দেশ বা স্বদেশী দালালদের বিরুদ্ধে।

১৯১৯ সালে রুশিয়া সমাজবাদী বিপ্লবের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সর্বহারাদের নেতৃত্বে চীনের মানুষেরা এই পিকিং শহর থেকেই শুরু করে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ '৪ঠা-মে আন্দোলন', যে-আন্দোলন আজকের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের গোড়াপত্তন করে,—যে-বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে দেশের শ্রমজীবী সর্বহারাদের নেতৃত্বে আজ পৃথিবীর এক বিশাল ভূমিখণ্ডে সমাজবাদী রাষ্ট্র গড়ার ভিত্তি রচনা করেছে।

৪ঠা-মে আন্দোলনের পর তাদের প্রায় প্রতিটি দিনই কেটেছে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। পঁচিশলক্ষ অধিবাসী প্রথম এই পিকিং থেকেই শোনে তাদের মহান্ নেতা মাও সে-তুং এর উদাত্ত কণ্ঠ: "আজ থেকে আমাদের দেশ হতে রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদী আমলাতন্ত্রের চিরতরে উচ্ছেদ হল"।

তাই, যে-পিকিং নগরী তৈরি হয়েছিল বেত্রাঘাতে জর্জরিত, অন্ধকার গুহা-বন্দী একদল শ্রমজীবীর তাজা রক্তে, আজ সেই পিকিং নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত, সেই শ্রমজীবী সর্বহারারই নেতৃত্বাধীন। তাই আজ পিকিং মহাচীনের রাজধানী এবং শান্তির প্রধান দুর্গ।

চীনের রাজধানী এই পিকিং শহরে আমি সাতাশদিন ছিলাম। রাস্তা-ঘাট দেখে ও মানুষদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে যেটুকু জেনেছি সে সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই আমায় বলতে হয় এখানকার স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথা। এ শহরের স্বাস্থ্য ও আরাম আগে শুধু মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পুরানো চিয়াং আমলের সরকার শুধু ধনিক গোষ্ঠীদের সুযোগ

সুবিধার জন্তই আলো, জল ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা করত। কিন্তু আজ নাগরিকদের হাতে রাষ্ট্র যাওয়ার পর তাদেরই তত্ত্বাবধানে রয়েছে এই সমস্ত আলো, জল, রাস্তা, পার্কের সুব্যবস্থা। আগেকার অপরিচ্ছন্ন ও পরিত্যক্ত এঁদো গলিতে পর্যন্ত এসেছে আমূল পরিবর্তন।

মুক্তি-ফৌজ এই শহরে প্রবেশ করার পর তাদের প্রথম কাজই ছিল মান্ধাতার আমল থেকে স্তূপীকৃত হাজার মণ আবর্জনা অপসারিত করা। একমাত্র ১৯৫০ সালেই শহরের একান্ন মাইল পথ সংস্কার করা হয় এবং ষোল মাইল পথ নতুনভাবে সংযোজিত করা হয়। আজকাল পিকিং-এর প্রতিটি রাস্তা, উদ্যান, লেক, পথঘাট অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এমন কি তিন এন-চিও-এর কোলাহল মুখরিত নোংরা বাজারটিও আজ নতুন রূপ ধারণ করেছে। পিকিংএর অধিবাসীরা আজ গর্ব করে বলে থাকেন "আমরা যখন তিন এন-চিওএর জঞ্জাল পরিষ্কার করে তাকে পরিচ্ছন্ন করতে পেরেছি তখন আমাদের পক্ষে সারা পৃথিবীর আবর্জনাও অপসারিত করা সম্ভব।"

চিয়াংএর আমলে কোন এক নগরপাল এই শহরকে মশা মাছির উপদ্রব থেকে রক্ষা করার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেছিলেন। স্বাস্থ্যবিদ্‌গণের সঙ্গেও বহু আলাপ আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা হয়,—সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে সম্পর্কহীন আমলা কর্মচারীদের অবহেলায় শেষ পর্যন্ত এই মহৎ উদ্দেশ্য পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু এই দুরূহ কাজ সাধন করা বর্তমানে সম্ভবপর হয়েছে অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যেই, জনসাধারণ ও সরকারের সমবেত ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়।

বর্তমানে পৌরসভা নগরের মধ্যে কয়েকটি সুন্দর স্বাস্থ্যনিবাস গড়ে তুলেছেন। সাধারণ লোকদের জন্য অতি আধুনিক এবং যুগোপযোগী মনোরম বাসভবন গড়ে তোলা হচ্ছে। তিনটি অতি মনোরম অট্টালিকা এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। প্রত্যেকটিতে একশ' করে ঘর; তা ছাড়াও সরকারের সহায়তায় এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বহু বাড়ী তৈরি হচ্ছে যাতে সাধারণ শ্রমিকেরাও সুষ্ঠুভাবে সপরিবারে শান্তিতে বসবাস করতে পারেন।

পিকিংএর পুরাতন সৌধগুলি, যেমন বৌদ্ধ বা অন্যান্য ধর্মমন্দির বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টায় আজ নতুন রূপ ধারণ করেছে। পুরোহিত বা পরিব্রাজকদের ক্রিয়াকলাপ যাতে নিরুপদ্রব ও সর্বাঙ্গ-সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে তার কোনও ত্রুটি তাঁরা রাখেন নি।

পিকিং শহরের মধ্যেই আছে দেওয়ালে-ঘেরা একটি অঞ্চল—আর একটি নগরই বলা যায় তাকে। ওর নাম হল 'ফরবিডেন সিটি' বা নিষিদ্ধ নগর। পুরুষানুক্রমে অসংখ্য রাজরাজড়া পত্নী-পরিবার গোষ্ঠীবর্গ নিয়ে বাস করে গেছেন ওখানে। শত শত রাজপ্রাসাদ, সরোবর, কৃত্রিম পাহাড়, ঝরণা, প্রমোদ উদ্যান, রঙ্গমঞ্চ সবই রয়েছে এই স্বয়ংসম্পূর্ণ নিষিদ্ধ শহরে। কারুকার্য ও শিল্পের বহু নিদর্শন, জাতীয় ঐতিহ্যের বহু প্রতিচ্ছবি রয়েছে সেখানে। আগে জনসাধারণের কোন প্রবেশাধিকার ছিল না বলেই নিষিদ্ধ শহর নাম দেওয়া হয়েছিল। আজ নগর সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। ভিতরে একটি বিরাট উদ্যান, নাম দেওয়া হয়েছে সান ইয়াৎ-সেন পার্ক। দেখলাম বিরাট মিউজিয়াম, লাইব্রেরীও ভিতরে রয়েছে। ছাত্র ও শ্রমিকদের ছুটি উপভোগ করার মত বহু ব্যবস্থাই আজ করা হয়েছে।

২৫ সেপ্টেম্বর সকালের প্রাতরাশ সেরে দলবল নিয়ে একসঙ্গে গেলাম "গ্রীষ্ম-প্রাসাদ" দেখতে।

গ্রীষ্ম প্রাসাদ

চীন দেশের রাজপরিবারগুলির গ্রীষ্মকালীন আবাস 'ই হো-উয়ান' (গ্রীষ্ম-প্রাসাদ) পিকিং শহরের উত্তর পশ্চিম দিকে। এই গ্রীষ্মাবাসের আয়তন এত প্রকাণ্ড যে একে আর একটি নগর বলা চলে। স্থানটির চারভাগের তিনভাগ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে বিখ্যাত কুনমিং হ্রদ। বিস্তৃত উদ্যান, তার মধ্যে বিরাজ করছে অসংখ্য কৃত্রিম পাহাড়, মনোরম গাছপালা, পুষ্করিণী ও সরোবর। উদ্যান ও উঁচু টিলার উপরে রয়েছে অসংখ্য ভিলা। সুউচ্চ দেয়াল দিয়ে সমস্ত স্থানটি ঘেরা।

শুনলাম জায়গাটি সৌন্দর্যের দিক থেকে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। একথা বোধ হয় সত্যিই অস্বীকার করা চলে না।

সুবিস্তীর্ণ হ্রদ। তার একদিকটা ঢাকা রয়েছে পদ্ম পাতায়। একটু এগিয়ে একটি চমৎকার বাঁধান ঘাট। ঘাটে রয়েছে অসংখ্য নৌকা। প্রস্তর নির্মিত পথ দিয়ে চলছি। ডান দিকে সারি সারি প্রাসাদ। সম্মুখে ধাতু নির্মিত একজোড়া সুবৃহৎ সিংহ মূর্তি রয়েছে। সম্রাটদের বিলাসভবন এটা। তার পশ্চাতে আর একটি বিরাট কক্ষ। চিং বংশের রাজা 'কুয়াং-সু'কে বন্দী করা হয়েছিল এই কক্ষে। বর্তমানে এই প্রাসাদগুলো সাংস্কৃতিক নিদর্শনের প্রদর্শনী-গৃহরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে।

গেট পেরিয়ে এগিয়ে গেলাম আর এক মহলে। এটাকে বলা

হয় "তি হো-ইয়ান"। একটি ত্রিতল রঙ্গমঞ্চ। এই মঞ্চটি এমনভাবে তৈরী যে অভিনেতারা অভিনয়ের সময় উপর, নীচ, ডানদিক বা বাঁদিক—যে কোন দিক থেকেই মঞ্চে প্রবেশ করতে পারে। মঞ্চটি সত্যই অপুর্ব ও গঠনকুশলতার দিক থেকে একেবারে অভিনব।

নাট্যমঞ্চের পশ্চিমদিকে "লো-সাহ-তাং" নামে প্রকাণ্ড ঘর। সম্রাজ্ঞী "জু-সিং"এর শয়ন কক্ষ রূপে ব্যবহৃত হোত। বর্তমানে এই প্রকোষ্ঠে সূচি শিল্প, মৃন্ময়মূর্তি শিল্প ও অন্যান্য কলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে।

একটির পর একটি প্রস্তর নির্মিত মহল ও উদ্যান পেরিয়ে হ্রদের তীরের সুদীর্ঘ ঘূর্ণ্যমান উপবেশন-মঞ্চের কাছে এলাম। হ্রদের মধ্যে র'য়েছে একটি সবুজ দ্বীপ। তারই মধ্যে র'য়েছে ছোট ছোট পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে এবং উপরে রয়েছে অট্টালিকা ও অতি মনোরম আবাসগৃহ। ঘরগুলো হল্‌দে রঙের টালির ও তাতে নানা কারুকার্যমণ্ডিত মহামূল্যবান্ পাথর সন্নিবিষ্ট। বৌদ্ধ উপাসনা-মন্দিরও রয়েছে পাহাড়ের উপর। একটি আট-কোণা প্যাগোডা আকারের কাঠের চারতলা বাড়ী। ভেতরে রয়েছে মার্বল পাথরের মেঝে। ভারতীয় লোহাকাঠের তৈরী বাড়ীটি প্রকাণ্ড এক গুপ্ত স্তম্ভের উপর দৃঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অদ্ভুত ধরনের বাড়ীটি। আরও একটা এই রকম বাড়ী রয়েছে একটু ডান দিকে। বাড়ীটির সবটাই তামার তৈরি। একশ' পঁচাত্তর টন হবে বাড়ীটির ওজন।

গত যুদ্ধে জাপানী আক্রমণকারীরা এই বাড়ীটির দরজা জানালা সব লটে নিযে যায়। শুধু এইটিই নয়, জাপানীরা উদ্যান-হ্রদের বহু মূল্যবান্ বস্তু হয় লুট করে, নয় তো ধ্বংস করে রেখে যায়। কুয়োমিণ্টাং সরকারের অবহেলার জন্যও বহু কিছু নষ্ট হয়েছিল।

বর্তমানে দেখলাম সমস্ত মহলটিকে সম্পূর্ণরূপে মেরামত ও সংস্কার করা হচ্ছে। লেকের মধ্যে রয়েছে একটি সিমেণ্টের তৈরি প্রকাণ্ড নৌকা; এটাকে বর্তমানে জাহাজের মত করা হয়েছে। এর ডেকের উপর দাঁড়ালে দেখা যায় নগর ও পশ্চিমের পাহাড়গুলোর মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। এখান থেকে পায়ে হেঁটে ব্ল্যাকহীল বা নৌকায় "নাগরাজের মন্দিরে" চলছে দলে দলে দর্শনপ্রার্থী।

হ্রদের এপার থেকে ওপার অবধি একটি প্রস্তর নির্মিত সেতু। আর একদিকে পাহাড়ের পাশের উপত্যকার মধ্য দিয়ে গেছে একটি প্রকাণ্ড পরিখা। ঘন বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়ে আবর্তনশীল জলস্রোত ব'য়ে চলেছে। পরিখার নাম "ব্ল্যাক সি"। হ্রদের মধ্যে আরও ছোট ছোট দু'একটি দ্বীপ র'য়েছে। তার মধ্যে "পরী-দ্বীপ" উল্লেখযোগ্য। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে ছোট ছোট বসবার স্থান। তরুগুল্মে আচ্ছাদিত উত্থানে রয়েছে ঘর বাড়ী মন্দির। যে সেতু দ্বারা দ্বীপটি সংযুক্ত, তাকে অবলম্বন ক'রে আছে কয়েকটি প্রস্তর নির্মিত সিংহ মূর্তির স্তম্ভ।

চীনের সম্রাটেরা অগণ্য দাস-দাসী উপপত্নী নিয়ে বিলাস ব্যসনে কাটাতেন—তার বহু সাক্ষ্য রয়েছে এই গ্রীষ্মকালীন আবাসে।

আমাদের দেশে বৃটিশ আমলে লাট বড়লাটেরা যেমন দার্জিলিং কিংবা সিমলার মত স্থানে গ্রীষ্মকালীন আবাসে গিয়ে বিশ্রাম লাভ করতেন, ঠিক তেমনি চীনের সম্রাটেরা এবং চিয়াং আমলে বড় বড় সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভৃতি এসে বাস করতেন এই "গ্রীষ্ম-প্রাসাদে"। বৃটিশের উত্তরাধিকারী আমাদের বর্তমান দেশনায়কেরা অনেকাংশে হয়তো পূর্বের রেওয়াজটি বজায় রেখে চলেছেন। কিন্তু চীনের বর্তমান নায়কগণ এই নিয়মটি একেবারেই ভেঙ্গে দিয়েছেন।

এই বিরাট বিরাট প্রাসাদ, উদ্যান, লেক আজ চীনের সর্বশ্রেণীর লোকদের জন্য। তাই ছাত্র যুবকেরা আজ দেখেছি লেকের মধ্যে নৌকা বাইচ্ খেলছে ; উদ্যান, সরোবর-তীর জুড়ে খেলা করছে ছোট ছেলে মেয়েরা। বহু প্রাসাদ অস্থায়ীভাবে দখল করে আছেন চীনের বিভিন্ন স্থানের শত সহস্র শ্রমিক তাদের অবসর মুহূর্তগুলো সার্থক করতে।

* * *

২৫শে সেপ্টেম্বরেই ভারতের রাষ্ট্রদূত মাননীয় শ্রীরাঘবাইয়ান আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন বিকেলের দিকে যাবার জন্য। ৩টা ৫০ মিনিটে রাষ্ট্রদূতাবাসে হাজির হ'লাম। গাড়ী থেকে নামতেই দু'জন অফিসার অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেলেন। শ্রীযুক্ত ও শ্রীযুক্তা রাঘবাইয়ান খুব সৌজন্যভরে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করে নিলেন।

দূতাবাসের জনৈক অফিসারের সঙ্গে গল্পে জমে গেলাম। সুপুরুষ হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোক, হাসিখুসি সদালাপী। চীন সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন যে এ দেশে ভেজাল বলতে কিছু নেই। তিনি আরো জানালেন যে এদেশে চোর নেই ; চীন আসবার সময় হংকং থেকে তার কলমটি পকেটমার হয়েছে অথচ এখানে ইচ্ছা করে অসতর্ক হয়েও কোন দিন কিছু খোয়া যাবার সম্ভাবনা নেই। তারপর শুনলাম ৫০ হাজার টন চাল চীন আমাদের দিচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আমাদের দেশের একদল সংবাদ-পত্র প্রচার করেছিল, চীন আগের বারে যে চাল ভারতকে দিয়েছিল সে চাল নাকি পচা, মানুষের খাবার অনুপযুক্ত ?—" তিনি বাধা দিয়ে বল্লেন "একেবারে বাজে কথা। চীন ভারতের মানুষকে মারবার জন্য খাদ্য দেয়নি, বাঁচাবার জন্যই দিয়েছে।" কি দামে চাল সওদা করলেন, জানতে চাইলে—তিনি আমতা আমতা করে কথাটি এড়িয়ে গেলেন। বিলাতী সিগারেট ও

চাইনীজ লেমনেড প্রচুর পরিমাণে পরিবেশন করে তাঁরা আমাদের আপ্যায়িত করলেন।

আর একদিনও তাঁর ওখানে আমরা নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। কিন্তু সেদিন অন্যত্র ব্যস্ত থাকায় আমার নিজের যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি।

সোবিয়েৎ প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভোজসভা

রাত্রি আটটায় সোবিয়েৎ প্রতিনিধিরা আমাদের ভারতীয় প্রতিনিধিদের এক ডিনার পার্টি দিলেন। সোবিয়েৎ প্রতিনিধিদের মুখপাত্র প্রফেসর আই. আই. এনিসিমভ শান্তিপ্রিয় ভারতবাসীদের উদ্দেশ্যে ও সমবেত প্রতিনিধিগণকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তৃতা করলেন। আমাদের প্রধান নেতা ডক্টর কিচলু সারা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শান্তি-তীর্থের অধিবাসী ও তাদের প্রতিনিধিদের প্রতি অভিনন্দন জানিয়ে ভাষণ দিলেন। তারপর স্বাস্থ্য কামনা ও ভোজনের পর বিখ্যাত সোবিয়েৎ-কবি মির্জা তারশুন জাদে তাঁর একখানি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করলেন। আমিও বাংলাদেশের একখানা পল্লী সঙ্গীত শোনাবার সৌভাগ্য অর্জন করলাম। অতি মনোরম ও আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ হল।

চীনের প্রাচীর

পরের দিন ২৬শে সেপ্টেম্বর প্রাতরাশ সেরে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি মিলে একখানা স্পেশাল ট্রেনে রওনা হলাম পৃথিবীর প্রাচীন সপ্তাশ্চর্যের এক আশ্চর্য চীনের বিখ্যাত প্রাচীর দেখতে। ট্রেন শহরতলী ছাড়িয়ে গ্রামের দিকে এসে পড়েছে। দু'পাশে শস্য-শ্যামল মাঠ।

ট্রেনের মধ্যে লাউড স্পীকারে বক্তৃতা, গান—বিশেষ করে মহা-প্রাচীর দেখে আবার ট্রেনে ফিরবার সময় যে গান বাজনা আবৃত্তির ব্যবস্থা হয়েছিল তাকে 'আন্তর্জাতিক জলসা' নাম দেওয়া যেতে পারে। বিভিন্ন দেশের শিল্পী ও রসজ্ঞরা নিজের নিজের ভাষায় গান ও আবৃত্তি শুরু ক'রে দিলেন। অবশ্য দোভাষীরা যথাসময়েই সেগুলির মানে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। এই ভাবে গান বাজনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশের জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় হতে লাগল। আমি নিজে এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পেরে নিজেকে ধন্যই মনে করেছিলাম। অনেক কিছু শিখতে পেরেছিলাম ও অপূর্ব আনন্দ লাভও করেছিলাম।

ঘণ্টা তিনেক পরে একটি ছোট স্টেশনে এসে ট্রেন থামল। স্টেশনের দু'পাশেই ছোট ছোট পাহাড়, এক পাশের পাহাড়ের উপর দিয়ে চীনের প্রাচীর—কোথাও উঁচু, কোথাও ঢালু হ'য়ে দূর দূরান্তরে গিয়ে মিশেছে। ট্রেন থেকে নেমেই রেল লাইনের পাশ দিয়ে প্রাচীরের দিকে এগুতে লাগলাম। দেয়ালের প্রশস্ত স্থানটির উপর উঠতেই প্রায় দম ফুরিয়ে গেছে। সোবিয়েৎ, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, আমেরিকা, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া, বার্মা, চিলি, কানাডা ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের লোক বিভিন্ন পোষাকে পরস্পর পরস্পরের কাঁধে কাঁধ দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে উপরের দিক উঠতে লাগলনে।

চিং বংশের প্রথম সম্রাট চিং সি হুয়াং বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য পনের শত মাইল দীর্ঘ, তিরিশ ফুট উঁচু ও পনের থেকে পঁচিশ ফুট চওড়া এই বিরাট প্রাচীর তৈরি করেন। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে কুড়ি-বাইশ বছর আগে ছোটবেলায় ইতিহাসে-পড়া চীনের বিখ্যাত মহা-প্রাচীরের উপর আজ আমি দাঁড়িয়ে। প্রচণ্ড প্রখর সূর্য মাথার

উপর। প্রাচীরের মাঝে মাঝে এক একটা বিশ্রামের স্থান রয়েছে। প্রাচীরের উঁচু চূড়ায় এক বিশ্রাম-স্থানে দাঁড়িয়ে দেখছি পাহাড়ের পর পাহাড় যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মত দিগন্তে মিলিয়ে গেছে। তার উপর দিয়ে গেছে এই মহা-প্রাচীর। দেখছি পাহাড়ের পাদদেশে এলোমেলো-ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে স্থানীয় অধিবাসীদের ঘরবাড়ী। একটা মাল বোঝাই ট্রেন সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে পাহাড়ের কোল ঘেঁসে চলেছে। জীবনে আর কোনও দিন এই অভূতপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করার সুযোগ হবে কি না জানিনা, কিন্তু চোখ অন্ধ হ'য়ে গেলেও, এই মনোরম দৃশ্যপট সারা জীবন দেখতে পাব একথা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি। ছোটবেলায় ইতিহাসে যা পড়েছিলাম তা অক্ষরে অক্ষরেই সত্যি। দুনিয়ার অত্যাশ্চর্য কীর্তি এই সুদীর্ঘ প্রাচীর এত প্রশস্ত যে দশজন অশ্বারোহী পাশাপাশি এর উপর দিয়ে অনায়াসে দৌড়ে চলে যেতে পারে।

আবার উপরের দিকে উঠবার চেষ্টা করি। একদল যখন অনেক উপরের দিকে উঠে গেছে, তখন আর এক দলকে আমরাও আবার পেছনে ফেলে এগুচ্ছি। উচ্চতম শীর্ষ এখনও দু'শ ফুটের কম হবে না। ক্রমে উঁচু হ'য়ে উপরের দিকে উঠেছে। এইবার আর পারছিনা, সত্যিই হাঁপিয়ে পড়েছি।

ঠিক দশ বারো গজ পেছনের দিকেই ছিলেন আমাদের নৃত্যশিল্পী শ্রীমতি ভাটে। তরতর করে উঠে প্রায় আমায় ধরে ফেললেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি, আর পারছেন না নাকি ?" পারছি না মানে ? পৌরুষে আঘাত লাগল। ভাবছি শেষে হার মানব মহিলার কাছে ! আরও পাঁচ দশজন মহিলা যে উপরের দিকে না উঠে গেছেন এমন নয়। ভিয়েৎনামের একজন মহিলা প্রতিনিধিকে তো স্পষ্টই

দেখতে পাচ্ছি, অবশ্য তাতে মোটেই আশ্চর্য হচ্ছি না কারণ এই মহিলা হলেন ভিয়েৎনাম গেরিলা বাহিনীর একজন নেত্রী।

যাই হোক, এবার একটি সুবিধা পেয়ে গেলাম। চীনের নাট্যকার সাও-ইয়েই বসে বিশ্রাম করছেন। আমিও তাঁর পাশে গিয়ে বসে গল্প জুড়ে দিলাম। এই নাট্যকারের সঙ্গে সেই দিনই ট্রেনের মধ্যে আলাপ হয়েছিল। পরবর্তীকালে অন্তরঙ্গ হয়েছি বললে অত্যুক্তি হয় না।

বলছিলেন নাট্যকার: জাপানীরা গত যুদ্ধের সময় এসে এই মহাপ্রাচীরের বহুস্থান নষ্ট করেছিল। জাপানীদের তাড়িয়ে দেবার পর চিয়াং কাইশেকের পক্ষে কিন্তু আর সম্ভব হয়নি এর সংস্কার করা। কিন্তু বর্তমান সরকার মাত্র সামান্য কিছু দিনের মধ্যেই এই বিরাট প্রাচীরের আমূল সংস্কার সাধন করতে সক্ষম হয়েছেন।

এবার সবাই নীচে নামছেন। আমিও সঙ্গে আছি। একটি স্টেশনে এসে হাজির হলাম। স্টেশনটির কি নাম আমার মনে নেই। সবাই হাত পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করতে বসলাম। ঠাণ্ডা শরবত গ্লাসের পর গ্লাস নিঃশেষ ক'রে তবে সুস্থ হই।

তারপর আবার ট্রেনে উঠলাম। ট্রেনে আবার শুরু হোল আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—যার বর্ণনা আগেই দিয়েছি। সন্ধ্যার কিছু আগেই পিকিংএ ফিরে এলাম।

* * *

পরের দিন ২৭শে সেপ্টেম্বর। সকাল ৯টায় হোটেলের নীচের তলায় এক বিশ্রামকক্ষে সারা বিশ্ব শান্তি-কাউন্সিলের সম্পাদক আইভর মণ্টেগুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। তাঁর মুখে শান্তি আন্দোলনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা শুনে বহু শিক্ষা ও শান্তি আন্দোলনের মধ্যে আরও গভীরভাবে অংশ গ্রহণের প্রেরণা লাভ করলাম।

সেইদিনই বেলা দু'টোয় বৃটেনের মহিলা নেত্রী স্তালিন-পুরস্কার-প্রাপ্তা অন্যতম শ্রেষ্ঠ শান্তি-সংগ্রামী শ্রীমতি মোনিকা ফেলটনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। মাত্র কয়েকদিন হল তিনি এই দ্বিতীয়বার কোরিয়া রণাঙ্গন দর্শন করে ফিরেছেন।

কোরিয়া যুদ্ধের বর্তমান অবস্থা, আমেরিকান সৈনিকদের কীর্তি-কলাপ এবং উভয় পক্ষের যুদ্ধ-বন্দীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, সে সম্বন্ধে যখন তিনি বলতে লাগলেন তখন সত্যিই অনেক মূল্যবান্ তথ্য জানতে পারলাম।

ভারতবর্ষ থেকে কোরিয়া রণাঙ্গনের সত্যিকারের খবর কতটুকুই বা আমরা পাই। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা খবরগুলো ছেঁকে পাঠায়। আমরাও সে খবরগুলো পড়ে রামের ঘাড়ে শ্যামের দোষ চাপাই। যদিবা কোন কাগজ প্রতিক্রিয়ার বেড়াজাল ভেদ করে কোন সত্যি খবর প্রকাশ করে, আমরা তাকেই হয়ত সন্দেহ করতে আরম্ভ করি। আমাদের দেশের এবং বিদেশের খবরের কাগজগুলি যে মালিকদের ব্যবসা ও রাজনৈতিক স্বার্থেই ছাপা হয় সে কথা হয়তো অনেকেরই উপর-উপর জানা আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এদের মোহ ও প্রভাব থেকে অনেকেই মুক্ত হয়ে উঠতে পারেন না।

রাত্রি আটটায় ভিয়েৎনামের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিলাম। ওখানকার গেরিলা-বাহিনীর একজন নেত্রী একটি সারগর্ভ ভাষণে আমাদের চমৎকৃত করলেন। আমাদের তরফ থেকেও ভিয়েৎনামের মহান্ নেতা হো চি-মিনের দীর্ঘ জীবন এবং তাঁর জনগণের কল্যাণ কামনা করে ভাষণ দেওয়া হল। তাদের গৌরব-জনক সংগ্রাম খুব শীঘ্রই সাফল্য লাভ করবে সে বিষয়ে আমরা যে নিঃসন্দেহ সে কথাও ভাষণে জানিয়ে দেওয়া হল।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির শ্রীযুক্তা মঞ্জুশ্রী দেবী গাইলেন রবীন্দ্রনাথের গান 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'।

ভিয়েৎনামের প্রতিনিধিদের তরফ থেকে শ্রীযুক্তা মঞ্জুশ্রী দেবীকে এবং আমাকে হো চি-মিনের প্রতিমূর্তি আঁকা দুটো ব্যাজ উপহার দেওয়ার পর এক মনোরম পরিবেশের মধ্যে সেদিনকার অনুষ্ঠান শেষ হ'ল।

২৮শে সেপ্টেম্বর গেলাম সেখানকার চারুকলা প্রদর্শনী দেখতে। চীন তো শিল্পীরই দেশ। সে দেশের প্রায় প্রত্যেক লোকেই অল্প বিস্তর তুলির টান দিতে জানে। শুনেছি মাও সে-তুং নিজে পর্যন্ত খুব ভাল ছবি আঁকতে জানেন।

বিভিন্ন শিল্পীদের আঁকা বিস্তর ছবি প্রকাণ্ড ঘরের উপরের ও নীচেকার দেয়ালগুলোতে টাঙানো রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে নীচেই লেখা রয়েছে প্রত্যেকটি ছবির পরিচয়। দেশের অতি পুরানো দিনের বহু ঘটনা, ঐতিহাসিক বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও সামাজিক কাহিনীর নিখুঁত চিত্র রয়েছে। একে একে দেখে যাচ্ছি জাতীয় ঐতিহ্যের নানান্ প্রতিচ্ছবি। দেশের বর্তমান কল-কারখানা, কৃষিক্ষেত্রের অগ্রগতির বাস্তব চিত্রগুলো থেকে সে দেশকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ জানবার সুযোগ পেলাম ও শিক্ষা গ্রহণ করার মত প্রচুর খোরাক সংগ্রহ করলাম।

আমাদের সঙ্গেও একজন চিত্রশিল্পী ছিলেন, বোম্বের হুসেন সাহেব। তাঁকে লক্ষ্য করলাম তিনি যেন চোখ দিয়ে ছবিগুলোকে গিলতে লাগলেন এবং সেখানে বসেই বহু ছবির প্রতিলিপি অঙ্কন করতে শুরু করলেন।

শান্তি-সম্মেলন শেষ হবার পর হুসেন সাহেবের বহু ছবি, যা তিনি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন অথবা ওখানে বসে এঁকেছেন, সে সব ছবি

নিয়েও এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ছবিগুলো ওখানকার শিল্প-রসিক মহলে খুবই প্রশংসা অর্জন করেছে।

রাত্রে গেলাম পিকিং ফিল্ম্ স্টুডিওর তৈরি সেণ্ট্রাল সিনেমা ব্যুরোর বিখ্যাত ছবি "দি হুয়াই রিভার মাস্ট্ বি হারনেস্ড্" ("হুয়াই নদীর গতিনিয়ন্ত্রণ করতেই হবে") দেখতে। কি ভাবে তা করা সম্ভব হ'লো তারই আদ্যোপান্ত ঘটনা। প্রায় দু'ঘণ্টার ছবি। এই রকম বিষয়-বস্তুর উপর যে এত দীর্ঘ ছবি তোলা সম্ভব এবং তা দর্শককে এত আনন্দ দিতে সক্ষম, না দেখলে কল্পনায়ও আনতে পারতাম না।

চীনের বর্তমান দিনের সব কিছুই আজ স্বতন্ত্র। সে দেশের প্রতি মুহূর্তই আজ অগ্রগতির মুহূর্ত। নিভৃত পল্লীর একজন চাষীও আজ জানতে চায় সুবিশাল চীনের কোথায় কি সুবিপুল পরিবর্তন ঘটছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা সুযোগও পাচ্ছে পত্র পত্রিকা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মারফত প্রতিদিনকার নতুন নতুন সুবিরাট কর্মকাণ্ডের খবরাখবর রাখবার। দেশের সর্বশ্রেণীর লোকেরা আজ ছায়াছবিতে এই ধরনের নৃত্য-গীতমুখর বাস্তব জীবনের চিত্র দেখে আনন্দ পায়। সাংস্কৃতিক কর্মীরাও এই ধরনের শিক্ষাপ্রদ আনন্দের পরিবেশনে যথাযোগ্য অংশগ্রহণ করছেন।

চীনের মানুষেরা আজ ট্রুম্যান-আইসেনহাওয়ারের এবং দালাল দেশনেতাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে বলেই "হুয়াই নদীর গতিনিয়ন্ত্রণ করতেই হবে" ছবি দেখে আনন্দ পায়; এবং ওদের জীবনের বাস্তব চিত্র চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হতে দেখে আমি বিদেশী হয়েও যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করেছি ও যথেষ্ট শিক্ষালাভ করেছি ঠিক ঐ কারণেই।

বইখানির একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এর সঙ্গীতাংশ। প্রত্যেকটি ঘটনার সঙ্গে তা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে—বিশেষ ক'রে ছবিটির আবহ সঙ্গীত আমাদের কাছে অত্যন্ত উপভোগ্য মনে হয়েছিল।

ছবিখানির বিষয়বস্তু এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম, যাতে পাঠকেরা সেখানকার এক অতি কঠোর বাস্তব কাহিনী আদ্যোপান্ত জানতে পারেন।—

হুয়াই নদী হল এমন এক নদী যা মনে জাগাত ত্রাস, জাগাত আতঙ্ক। জাতীয় মুক্তির আগে যে সব লোক হুয়াই নদীর উপত্যকায় বাস করত, তাদের প্রতিটি বর্ষাকালেই মৃত্যুর বিভীষিকার সম্মুখীন হ'তে হোত। হুয়াই নদীর বন্যার প্রকোপে তাদের প্রতি বছরেই হত ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি।

যুগ যুগ ধরে চীনের শাসক শ্রেণী এই হুয়াই নদীকে অবহেলা করে এসেছে। এই নদীর কোন সংস্কারই তারা করেনি। হুয়াই নদীর গর্ভ থেকে পলিমাটি সরিয়ে ফেলে তাকে গভীর করা হয়নি অনেক কাল; ফলে এই নদী ক্রমশই শুকিয়ে অগভীর হয়ে আসছিল। ১৯৩৮ সালে চিয়াং কাই-শেকের অক্ষম সৈন্যেরা জাপ-সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যদের আক্রমণ রুখতে না পারায় তারা হুয়া-ইউয়ান-কোন্-এ পীত নদীর বাঁধ ভেঙ্গে দেয়। এই বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে যে প্রবল জলপ্লাবনের সৃষ্টি হয় তার সবটাই গিয়ে হুয়াই নদীর গর্ভে পড়ে। ক্রমান্বয়ে নয় বছর ধরে পীত নদীর এই কর্দমাক্ত জল হুয়াই নদীর দুই তীরকে বিধ্বস্ত করে আসছিল।

সেই থেকে এতদিন পর্যন্ত প্রত্যেক গ্রীষ্মেই নদীর গর্ভে যে বিপুল পরিমাণ জল সঞ্চিত হয়ে যেত তার নির্গমনের কোন রাস্তা না

থাকায় বন্যায় হুয়াই নদীর উপত্যকা ভেসে যেতো। ১৯৪৯ সালে হুয়াই নদীর বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল সংস্কার করা হয় বটে কিন্তু যে ভয়ঙ্কর বিপদ সুদীর্ঘ কাল ধরে হুয়াই নদীর জলস্রোত থেকে উদ্ভূত হয়ে আসছে তা এত অল্প সময়ের মধ্যেই রুদ্ধ করা গেল না। অধিকন্তু ১৯৫১ সালে প্রচণ্ড বন্যা দুই তীর বিধ্বস্ত করে ভাসিয়ে দিয়ে গেল। এই অবস্থার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার বন্যাবিধ্বস্ত লোকদের অত্যন্ত যত্ন সহকারে বহু পরিমাণে খাদ্য দ্রব্য ও অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করেন এবং সেই নদীকে কেমন করে আয়ত্তে আনা যায় সেই সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য একটি বৈঠক আহ্বান করেন। চেয়ারম্যান মাও সে-তুং সোজাসুজিই ঘোষণা করেন যে "হুয়াই নদীর গতিকে চিরদিনের জন্য নিয়ন্ত্রণ করে নতুন করে গড়ে তুলতেই হবে"।

হুয়াই নদীর সমগ্র এলাকা শূন্য থেকে পরিদর্শন করবার জন্য বিমান পাঠিয়ে দেওয়া হল। বহু পর্যবেক্ষক হুয়াই নদীর এই সংস্কারমূলক কাজ আরম্ভ করবার জন্য নদী ও পাহাড় অতিক্রম করল।

হুয়াই নদীর জন্য একটি "বাঁধ পরিকল্পনা পরিষদ" গঠন করা হল। ১৯৫১ সালে এই বৈঠক বাঁধের একটি প্রথম খসড়া নকশা তৈরি করল এবং মাও সে-তুংএর "হুয়াই নদীর গতি-নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে" এই ডাক হুয়াই নদীর দুই তীরের গ্রামে পৌছে দিতে লাগল। ফলে সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে প্রচুর উদ্দীপনার সঞ্চার হোল, এবং প্রথমেই দুইলক্ষ ছয় শতাধিক লোক হুয়াই নদীকে বাঁধবার এই সৃষ্টিশীল কাজে যোগ দেবার জন্য এগিয়ে এলো। প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি দিয়ে এই বাঁধ নির্মাণ কাজের সহায়তা করবার জন্যে সাংহাই এর প্রায় একশত কারখানা দিবারাত্র কাজ করে গেছে। ট্রেন, স্টীমার, ঘোড়ার গাড়ী, এমন কি গরুর গাড়ী

করেও নানা দিক থেকে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস এসে পৌছায়।

কেন্দ্রীয় মহামারী প্রতিরোধক সঙ্ঘ, সাংস্কৃতিক সমিতি বা গাইয়ে বাজিয়েদের সঙ্ঘ এবং সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ও যন্ত্রবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্রছাত্রী স্বেচ্ছায় সেই কাজে এসে যোগ দিয়েছিল। গণমুক্তি ফৌজের সৈন্যেরা এসেও এই কার্যে অংশ গ্রহণ করেছিল অর্থাৎ এক কথায় হুয়াই নদীর ১৯৫১ সালের এই প্রথম সংস্কারমূলক কাজ সমগ্র দেশেরই আন্তরিক সহায়তা ও সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করেছিল।

১৯৫১ সালের এই বাঁধ নির্মাণের মূল কথা ছিল—"অতি বৃষ্টিতে অল্প ক্ষতি এবং অল্প বৃষ্টিতে কোন ক্ষতিই নয়"।

হুয়াই নদীর প্রথম মুখ্য কাজই ছিল বন্যার জলকে পরিরক্ষণ করা। বহুবিধ অসুবিধা ও বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও চীনের শ্রমিকরা নানারূপ খননযন্ত্র দ্বারা নদীগর্ভকে কর্দমমুক্ত করে। ঐ ভাবে হুয়াই নদীর ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়ার গতিরোধে তারা কৃতকার্য হয়। তারপর হুয়াই নদীর বাঁধ নির্মাণ যখন সম্পূর্ণ শেষ হোল তখন দেখা গেল তার দুই তীরে এত প্রচুর ফসল উৎপাদিত হয়েছে যা নাকি চীনের অধিবাসীরা বহু শতাব্দী ধরে কল্পনায়ও আনতে পারে নি। চেয়ারম্যান মাও সে-তুং-এর গৌরবময় নেতৃত্বাধীনে চীনের লোক তাদের শ্রমকুশলতার দ্বারা প্রাকৃতিক বিপদকে অতিক্রম ক'রে অবশেষে সামাজিক জীবনের বিকাশ সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। এই ভাবেই সৃষ্টিশীল শ্রমের স্পর্শে ধ্বংসের শক্তি রূপান্তরিত হয়েছে সৃষ্টির শক্তিতে।

* * * *

২৯শে সেপ্টেম্বর রাত্রি সাড়ে আটটায় একখানা স্টেশন ওয়াগনে করে আমরা কয়েকজন শহর ঘুরতে বেরিয়েছি। আমাদের সঙ্গে ছিলেন ভারতীয় পার্লামেণ্টের বিরোধীদলের নেতা কমরেড্ এ. কে. গোপালন। বাংলার শান্তি সংসদের অমিয় বাবু, মহিলা নেত্রী পঙ্কজ আচার্য এবং মঞ্জুশ্রী দেবীও ছিলেন।

চীন জনগণতন্ত্রের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব ১লা অক্টোবরের এখনও তিন দিন বাকি। কিন্তু এই মহোৎসবের প্রস্তুতি চলছে পাঁচ সাত দিন আগে থেকেই। সরকারী দোকানগুলো সাতদিনের জন্য স্পেশাল কন্সেশন ঘোষণা করায় একমাত্র ২৪শে সেপ্টেম্বরই আড়াই গুণ পোষাক পরিচ্ছদ, তিন গুণ জুতা মোজা, চার গুণ ঘড়ি এবং সাত গুণ সিল্ক, সৌখীন ব্রকেড্ ও সাটিন বেশি বিক্রয় হয়েছে অন্যান্য দিনের তুলনায়।

পিকিংএর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাস্তা পেরিয়ে গাড়ী চলছে। দেখছি বাড়ী আর দোকানের সামনে লাল সালু দিয়ে অজস্র তোরণ তৈরি করা হয়েছে। আলো দিয়ে বিভিন্ন রকম সাজ সজ্জা। প্রতি গৃহে লাল নিশানের সমারোহ। লাল সালুতে লেখা বিভিন্ন শ্লোগান। আলো দিয়ে চীনা ভাষায় সব শ্লোগান ও বিভিন্ন নেতাদের মূর্তি তৈরি করা হয়েছে। ছেলে বুড়ো সবাই মেতেছে সাজানো-গোছানোর কাজে। এক বৃদ্ধকে দেখলাম মই বেয়ে একটি প্রকাণ্ড তোরণের উপরে মাও সে-তুংএর ছবি আঁটতে ব্যস্ত। জীবনের সমারোহে বৃদ্ধের দেহে-মনেও তারুণ্যের উচ্ছ্বাস। সবই অপূর্ব! আলোয় আলোয় প্রতিটি গৃহ উদ্ভাসিত। রেলওয়ে স্টেশন নিশানে নিশানে লালে লাল হয়ে গেছে। তারই পশ্চাদ্‌পটে শোভা পাচ্ছে নীল আলো দিয়ে তৈরি এক বিরাটকায় শান্তি কপোত। ...আমাদের দেখে রাস্তার

লোকেরা উল্লাসে চিৎকার করছে "হো পিং ওয়ান্ সে"—"শান্তি জিন্দাবাদ"। আমরাও চিৎকার করছি, "মাও সে-তুং জিন্দাবাদ"।

বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে ঘুরে অবশেষে "তিয়েন এন-মেন" স্কোয়ারে গাড়ী থামল। "তিয়েন এন-মেন"র বাংলা অর্থ "শান্তির স্বর্গদ্বার"। শক্তিশালী অথচ সুস্নিগ্ধ বিদ্যুৎ দীপাবলীর আলোতে এমন মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল যে সত্যিই স্থানটিকে স্বর্গতুল্য বলা চলে।

পিকিং শহরের ঠিক মাঝখানে তিয়েন এন-মেন গেট্ অবস্থিত। একশ' ষাট একর জমি নিয়ে একটি প্রকাণ্ড বিস্তৃত স্কোয়ার। তার সামনে বিরাট উচ্চ এক তোরণ। ভিতরে প্রবেশ করবার জন্য পাঁচটি সুড়ঙ্গ রয়েছে। সামনে খুব ছোট খাল। ওটাকে বলা হয় "চিন সুই হো" নদী ('রজত শুভ্র তোয়ধারা')। পাঁচটি মর্মর-সেতু রয়েছে—তোরণের ভিতরে প্রবেশ করার পাঁচটি সুড়ঙ্গের ঠিক মুখোমুখিভাবে। ফটকের উপরটা অতি প্রকাণ্ড নহবৎখানার মত। মঞ্চও ছাদ দু'প্রস্থ টালির তৈরি, হল্‌দে রঙের। সারা প্রাচীরটি দক্ষশিল্পীর হাতের তুলিতে চিত্রিত করা।

প্রশস্ত স্থানটিতে অতি সুন্দর কয়েকটি বিজয়-স্তম্ভ মাথা উঁচু করে আছে। আর র'য়েছে কয়েকটি পাথরের সিংহ-মূর্তি। শহীদদের স্মরণার্থে অতি উচ্চ এক স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা হয়েছে। সারা চীন দেশের মানুষ এটিকে খুব পবিত্র স্থান বলে মনে করে। একদিন যা ছিল সাধারণ মানুষের পক্ষে নিষিদ্ধ এলাকা, আজ তা লক্ষ লক্ষ লোকের সভা বা সমাবেশের মুক্ত স্থান। ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর এই তিয়েন এন-মেন এর উপর কমরেড মাও সে-তুং নয়া গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পঞ্চ তারকালাঞ্ছিত রক্ত পতাকা স্বহস্তে উত্তোলন করেছিলেন। স্কোয়ারের মধ্যে, রাস্তার

পাশে গাড়ী থামতেই আমরা হুড় মুড় করে নেমে পড়লাম। সেখানে কাজ করছিলেন কিছু শ্রমিক ও উৎসাহী ছাত্র। কেমন সাজানো গোছানো হচ্ছে তা দেখবার জন্যও অনেক লোক এসে ভীড় করেছেন। আমাদের দেখামাত্র এসে ঘিরে দাঁড়াতে লাগলেন। সোল্লাসে চিৎকার করতে লাগলেন "হো পিং ওয়ান সে," "ভারত চীন মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক"—আমরাও আমাদের ভাষায় শ্লোগান দিতে লাগলাম। কমরেড গোপালন চীন জনগণতান্ত্রিক সরকারের তৃতীয় বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বক্তৃতা করলেন। কমরেড লো চীনা ভাষায় তা তর্জমা করে দিতেই সকলে হর্ষধ্বনি ও করতালি দিয়ে প্রত্যভিনন্দন জানাল।

মাও সে-তুং এর সঙ্গে ভোজানুষ্ঠান

৩০শে সেপ্টেম্বর সকালে হোটেলের কামরায় বসে ডায়েরী লিখছিলাম। আমাদের সমস্ত দোভাষীদের অধিকর্তা কমরেড ইয়াং একখানি নিমন্ত্রণ-লিপি এনে হাতে দিলেন। চীন গণতন্ত্রের তৃতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সভাপতি মাও সে-তুং বিদেশী অতিথিদের জন্য সেদিন সন্ধ্যায় এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করেছেন : তারই নিমন্ত্রণ পত্র।

সারাদিন ধরে ভাবছি কখন সন্ধ্যা হবে, কখন নিমন্ত্রণ রক্ষার সুযোগে মাও সে-তুং এর দর্শন লাভের সৌভাগ্য অর্জন করব। মাত্র এই দশদিন চীনে থেকেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি এই দেশে কী বিরাট পরিবর্তনই না ঘটে গেছে! বিরাট এবং জটিল অর্থনৈতিক সমস্যা প্রায় সমাধানের পথে। সারাদেশ থেকে বেকার

সমস্যা প্রায় নির্মূল করে এনেছে। দক্ষিণচীনে খুব সামান্য কিছু সংখ্যক বেকার আপাতত থাকলেও তাদের জন্য "বেকার ভাতা"র বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এই বছরের মধ্যেই সরকার লুপ্তপ্রায় এই সমস্যাকে সমূলে উৎপাটন করবেন স্থির করেছেন। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে বিপ্লব ঘটেছে সমস্ত পৃথিবীর মানুষের কাছে তা সবচেয়ে বিস্ময়কর। নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইতিমধ্যেই জয়যুক্ত হয়েছে। সাংস্কৃতিক অগ্রগতির আয়োজন ও অভিযান চলেছে সারা দেশ জুড়ে।

এক একদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভেবেছি, কি করে এটা সম্ভব হ'ল। আমাদের দেশনেতাদের মুখে বা বেতারের ভাষণে শুনেছি, খবরের কাগজে বিবৃতি পাঠ করেছি, কতবার তাঁরা বলেছেন আমাদের হাতে তো আর "আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ" নেই যে মাত্র এই ক' বছরের মধ্যে সব কিছু করে দেব। ভাবছি, আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপটা কি তাহ'লে চীন দেশের নেতাদের হাতে গিয়ে পড়ল নাকি! তা না হ'লে তিন বছরের মধ্যে তারা যে পরিবর্তন ঘটিয়েছেন তা আমাদের তিরিশ বছরেও সম্ভব হবে কি না সে কথা হলফ করে কে বলতে পারে?

সে কথা এখন যাক। চীনের এই বিশাল রূপান্তরের যিনি কর্ণধার তাঁর দর্শনলাভ আমার কাছে অপূর্ব সৌভাগ্যের বিষয়।

যথাসময়ে রওনা হ'লাম। বড় বড় রাস্তা পেরিয়ে চলছি। সহস্র সহস্র আলোক-মালায় সজ্জিত বাড়ী বা দোকানগুলো পেছনে ফেলে আমাদের বাস গেট্ পেরিয়ে "নিষিদ্ধ প্রাসাদের" মধ্যে এসে থামল। আগের আমলে এই প্রাসাদে জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, তাই এই নামকরণ। আমরা সুশৃঙ্খলভাবে প্রাসাদোপম হল ঘরের দিকে এগুচ্ছি। জনগণতান্ত্রিক চীনের সহ-রাষ্ট্রপতি জেনারেল

চু-তে, সান ইয়াৎ-সেনের সহকর্মিণী ও সহধর্মিণী মাদাম সুং চিং লিং। প্রধান মন্ত্রী চৌ এন-লাই, সহকারী প্রধান মন্ত্রী কুও মো-জো প্রমুখ নেতৃবৃন্দ আমাদের করমর্দন করে অভ্যর্থনা জানাতে লাগলেন। আমরা সুসজ্জিত হলঘরে প্রবেশ করলাম। ঠিক সাতটা বাজতেই মাও সে-তুং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে হলটিতে প্রবেশ করলেন। এঁরা উপস্থিত হওয়া মাত্র ব্যাণ্ডবাদ্য বেজে উঠল। সার্চলাইট ঝল্‌কে উঠল। বিভিন্নদেশের প্রতিনিধিদের কণ্ঠে নিজ নিজ ভাষায় "কমরেড মাও সে-তুং জিন্দাবাদ" ধ্বনিতে পনেরো মিনিট ধরে সমগ্র হলটি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো।

কমরেড মাও অভ্যাগত প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে এক নাতি-দীর্ঘ ভাষণ দিলেন—"হে বন্ধুগণ, মহান চীনা প্রজাতন্ত্রের আজ তৃতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস। আমরা সারা বছব ধরে চীনের জন-সাধারণের উন্নতির জন্য ও সারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে চলেছি এবং আশা করছি আগামী বছর আরও এগিয়ে যেতে পারব।

"চীন জনগণতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক!

"চীনে অবস্থিত সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে, চীনের বাইরে ও চীন দেশে যারা অবস্থান করছেন তাদের সকলের মধ্যে প্রীতি ও একতার বন্ধন দৃঢ় হোক!

"চীন সোবিয়েৎ মৈত্রী ও ঐক্য দীর্ঘজীবী হোক!

"চীন মঙ্গোলিয়ান বন্ধুত্ব ও ঐক্য দীর্ঘজীবী হোক!

"চীন এবং নতুন গণতান্ত্রিক দেশ সমূহের মধ্যে বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হোক!

"সমস্ত এশিয়াবাসীদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও একতা চিরস্থায়ী হোক!

"এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার দেশ সমূহের যে শান্তি সম্মেলন তা সফল হোক!

"পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মধ্যে মৈত্রী ও একতা সংস্থাপিত ও চির-স্থায়ী হোক!

—আবার উচ্চ দীর্ঘায়িত করতালি ও হর্ষধ্বনি!

অতঃপর উপস্থিত অভ্যাগতদের স্বাস্থ্য কামনা করা হল; শুরু হল খানা পিনা। জেনারেল চু-তে ও প্রধান মন্ত্রী চৌ এন-লাই সকলের পাশে পাশে এসে স্বাস্থ্য কামনার প্রতীক হিসাবে পানীয় গ্রহণ করতে লাগলেন আর সামনে যিনিই হোন তাঁকেই আলিঙ্গন করতে লাগলেন। প্রধান মন্ত্রী চৌ এন-লাই আমার শূন্য পাত্রে নিজ হাতে ঢেলে দিলেন পানীয়; জড়িয়ে ধরলেন তাঁর বুকে। কি অপূর্ব পরিবেশ! ধন্য হয়ে গেলাম শুধু একথা ভেবেই যে নিজদেশের প্রধান মন্ত্রী কোনদিন আমায় আলিঙ্গন করবেন একথা কল্পনা করাও যেখানে অসম্ভব, সেখানে অন্য দেশের প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে কোলাকুলি সম্ভব হল এই আমার পক্ষেও।

প্রচণ্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এই আনন্দোজ্জ্বল ভোজ-অনুষ্ঠান চমৎকার এক ঐক্য ও প্রীতির আবহাওয়ার মধ্যে শেষ হল।

হোটেলের কক্ষে অধিক রাত্রি অবধি জেগে রয়েছি। মাও সে-তুংএর কণ্ঠের ভাষা যেন সুর হ'য়ে আমার কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে: "এশিয়াবাসী সমস্ত মানুষের ঐক্য চিরস্থায়ী হোক্—চিরস্থায়ী হোক সারা দুনিয়ার মানুষের মৈত্রী।" হঠাৎ একটা কথা মনে এল;—মাও সে-তুং সভায় এলেন কোন পথ দিয়ে? যে পথেই আসুন ভোজ সভার হল-ঘরের সামনের রাস্তা তো তাঁর পার হতেই হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য! ভোজ সভায় হাজির হবার পথে দু'একজন শান্তি রক্ষক ছাড়া কোথাও সঙ্গীনধারী পাহারাদার বা দেহরক্ষী তো দেখলাম না।

কিছুদিন আগে আমাদের কলকাতার এক ঘটনা মনে পড়ল। আমাদের কোন এক রাষ্ট্র-নেতা কলকাতা এসেছেন। দমদম বিমান-ঘাঁটি থেকে রাজ্যপাল-ভবনে যাবেন। গ্রে স্ট্রীট্ সেণ্টাল এভিনিউর মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছি! রাস্তার দু'পাশে কাতারে কাতারে পুলিশ দাঁড়িয়ে, ঘোড়সওয়ার বাহিনী টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, সার্জেণ্ট অফিসারদের জীপ বা মোটর সাইকেল দ্রুত গতিতে যাতায়াত করছে, সাদা পোষাকে রয়েছে কত শত অজানা গুপ্ত প্রহরী! রিক্সাওয়ালা বা গরুর গাড়ীওয়ালাকে ধমক দেওয়া হচ্ছে, তাড়াতাড়ি গলিতে ঢোকবার জন্য; সাধারণের যানবাহন বাস ট্রাম চলাচল একদম বন্ধ! প্রায় কুড়ি মিনিট পরে সার্জেণ্ট ও অফিসারের কয়েকখানা গাড়ী সোঁ সোঁ করে বেরিয়ে যেতেই পাহারাওয়ালা, দেহ-রক্ষীগণ সচকিত হ'য়ে উঠল। বুঝলাম এইবার তিনি আসছেন!

সে এক দৃশ্য আর এই আরেক! স্বদেশ ভারত আর বিদেশ এই চীন। কি হতে পারত আর কি হয়নি—তারই যেন দুটি দৃশ্য।

নয়াচীনের প্রতিষ্ঠা দিবস

পরের দিন ১লা অক্টোবর। চীন জনগণতন্ত্রের তৃতীয় বার্ষিকী উদযাপনের দিন। এই দিনটির কথা আমার জীবন-পঞ্জীর পাতায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে চিরদিন। আমার জীবনে হয়ত অনেকবার আসবে এই প্রতিষ্ঠা দিবস, কিন্তু এই দিবস উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের নৃত্যগীতোচ্ছল মিছিলের দৃশ্য নিজের চোখে হয়ত আর দেখার সৌভাগ্য হয়ে উঠবে না। তবু শুভদিন যখনই আসবে আমার জীবনে, তখনই মনের মণিকোঠায় জ্বল জ্বল করবে এই কয়দিনের চিত্র আর গর্ববোধ

করব এই বলে যে আমিও ছিলাম এই অবিস্মরণীয় উৎসবের একজন অংশীদার।

সকাল সকাল প্রাতরাশ সেরে শান্তি সংসদের বাসে করে চলেছি। "তিয়েন এন-মেন" যদিও খুবই কাছে, তবুও সামনে দিয়ে এখন যাবার উপায় নেই। পেছনের গেট দিয়ে অধুনা অবারিত পুরাতন "নিষিদ্ধ স্কোয়ারে" প্রবেশ করে সামনের দিকে এগিয়ে এলাম। বিশ্ব-বিখ্যাত এই "শান্তির স্বর্গদ্বার" ; পাশেই মর্মর নির্মিত সুন্দর গ্যালারি। উপরে উঠে দাঁড়ালাম। পাথরে বাঁধান বিস্তীর্ণ স্কোয়ার। ওপাশে সুশৃঙ্খলভাবে সহস্র সহস্র ইয়ং পাইওনিয়ার বালক বালিকা রাশি রাশি রঙ্ বেরঙ ফুলের গুচ্ছ নিয়ে দাঁড়িয়ে। দূর থেকে অস্পষ্ট ঔজ্জ্বল্যে দেখা যাচ্ছিল তাদের। আর এক পাশে দাঁড়িয়ে শত সহস্র বাদ্যযন্ত্রীর দল। পোষাক পরিচ্ছদ চমক লাগার মত।

উৎসব আরম্ভ হ'তে এখনও ছ'মিনিট বাকি। এই প্রসঙ্গে আমাদের নিজের দেশের স্বাধীনতা দিবসের কথা স্মরণে আসা খুবই স্বাভাবিক। প্রথম বর্ষে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট হঠাৎ স্বাধীনতা পেয়ে গেলাম গভীর রাত্রে। বাইরে হৈ চৈ চীৎকারে হুড়মুড় করে ঘুম ভেঙ্গে উঠলাম। বেতারের গান ও ভাষণের মধ্য দিয়ে জানলাম, এই—এইবার স্বাধীনতা হচ্ছে। কে কাকে স্বাধীনতা দিল, কোন কোন ভাগ্যবান্ মহাপ্রভুর ছাত ফুটো হয়ে শিকে ছিঁড়ে পড়ল, মধ্যরাত্রির তন্দ্রা-বিজড়িত চেতনায় তা ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না। তথাপি স্বাধীনতা পাওয়ার আনন্দে জনসাধারণের সেই উদ্দাম উল্লাস যেন সবাইয়ের সঙ্গে আমাকেও পেয়ে বসল—তারপর বছর ঘুরে পাঁচ পাঁচটি স্বাধীনতা দিবস জীবনে এলো—আর গেলো। আজ চেয়ে দেখি জনসাধারণের মনে সে উল্লাস আর নেই। জীবন-ধারণের সংগ্রামে

যেন তাঁরা ক্লান্ত। স্বাধীনতা দিবস এল আর গেল কিন্তু তরঙ্গ সৃষ্টি করলনা। আর চীনে?…

চীনদেশের কোটি কোটি লোক তাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা এবং সারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প নিয়ে শান্তির স্বর্গদ্বার (তিয়েন এন-মেন) দিয়ে পিকিং নগরাভ্যন্তরে যাত্রা করল। চীনা জনগণের অতি প্রিয় এই সুন্দর রাজধানী শত সহস্র বৈচিত্র্যময় পতাকায় শোভিত হয়ে আজ দেশ প্রেমেরই জয় জয়কার ঘোষণা করছে।

আমাদের হোটেলের সামনে দিয়ে প্রকাণ্ড যে রাস্তা তিয়েন এন-মেন-এর প্রশস্ত স্কোয়ার ভেদ করে গেছে তার মধ্য দিয়ে বহুবার যাতায়াত করেছি। তার সৌষ্ঠব আজ যেন আরও উজ্জ্বল, আরও উচ্ছল রূপ ধারণ করেছে। জীবন ও সৌন্দর্য্যে এই পটভূমিকায় মাও সে-তুং এর বিরাট প্রতিমূর্তি আজ ভাস্বররূপ ধারণ করেছে। অপরূপ মহিমায় শোভা পাচ্ছে পঞ্চ-তারকা লাঞ্ছিত বিশাল বিশাল রক্ত পতাকার সমারোহ।

ঠিক দশটায় মাও সে-তুং তিয়েন এন-মেন-এর বক্তৃতা মঞ্চের অলিন্দে আবির্ভূত হোলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল বাদ্য যন্ত্রের ঐক্যতান সুর-ঝংকার। জয়োল্লাসের মধ্যে শোনা গেল মহান্ নেতার সম্মানার্থে তোপধ্বনি—আটাশবার। মাও সে-তুংএর সঙ্গে বক্তৃতা-মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সহ-রাষ্ট্রপতি চু-তে, মাদাম সুং, পিকিং নগরপাল পেং-চেন, প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই, সহকারী প্রধান মন্ত্রী কুও মো-জো ইত্যাদি আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি। মঙ্গোলিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রধান মন্ত্রী সেডেন-বলও বক্তৃতামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

মঞ্চের দু'পাশে প্রস্তর নির্মিত সুউচ্চ দুটি গ্যালারি। এই গ্যালারিতে উপস্থিত রয়েছেন বিভিন্ন দেশ থেকে আমন্ত্রিত জনসাধারণের প্রতিনিধি

ও বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতগণ, সোবিয়েৎ বিশেষজ্ঞরা এবং আমরা যারা এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার শান্তি সম্মেলনে যোগদান করতে এসেছি। মুহুর্মুহু সোল্লাস করতালি ও "মাও সে-তুং জিন্দাবাদ" ধ্বনি দিয়ে আমরা প্রত্যেকেই তাঁকে অভিবাদন জানালাম।

বিস্তীর্ণ স্কোয়ারের ওপারেও অসংখ্য দর্শক দাঁড়িয়ে। বিভিন্ন পোষাক পরিচ্ছদে ও সামরিক সাজে সজ্জিত হয়ে স্থানে স্থানে জমায়েত হয়েছে শত সহস্র মানুষ।

চীন মুক্তিফৌজের প্রধান সেনাপতি চু-তে একটি জীপে করে সামরিক প্রদর্শনী পরিদর্শন করতে থাকলেন। তারপর আবার বক্তৃতা মঞ্চে এসেই কমরেড মাওকে করমর্দনে অভিবাদন জানিয়ে এক নাতিদীর্ঘ বিবৃতি দিলেন:

"আমার বন্ধুগণ! সেনাপতি ও যোদ্ধা, কর্মী ও শ্রমিকগণ! আমার মুক্তিফৌজের জল, স্থল ও বিমান বাহিনীর সৈনিকগণ! আমার দেশের শান্তি প্রিয় জনগণ! আজ আমরা সকলেই একত্র সমবেত হয়ে চীনের জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা দিবসের তৃতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান অতি আনন্দের সহিত উদযাপন করছি!

"গত তিন বছর ধরে আমরা চীনের লোকেরা সভাপতি মাও সে-তুং-এর নেতৃত্বাধীনে বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনমূলক কার্যে আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছি। একমাত্র তাইওয়ান ব্যতীত সমগ্র চীনভূমি আজ মুক্ত। আমাদের জাতীয় রক্ষা-বাহিনী আজ পূর্বাপেক্ষা আরও শক্তিশালী। মার্কিন আক্রমণকারীদের প্রতিহত করবার, কোরিয়াকে সাহায্য করবার ব্যাপারে চীনের জনগণ অধিকতর সাফল্য লাভ করছে।

"চীনের স্বেচ্ছাসেবক ও কোরিয়ার সৈন্যেরা আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীদের উপর নির্মম আঘাত হেনেছে। সমগ্র দেশময়

ভূমি সংস্কার হয়েছে। সমস্ত সংখ্যালঘু জাতির লোকদের সঙ্গে এক অভূতপূর্ব্ব একতার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে।·· ···উৎপাদন-বৃদ্ধির দিকে অসীম উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে।······সারা দেশময় নতুন সামাজিক ব্যবস্থার পত্তন হয়েছে। পুনর্বাসন ও জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার সু-সম্পন্ন হয়েছে। প্রত্যেকটি লোকের জীবনের মান ক্রমোন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে।······সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি হয়েছে। মুক্তি-ফৌজের জন্য সামরিক সজ্জা সুসম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং আমি আপনাদের ও প্রতিটি দেশবাসীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

"কিন্তু আমরা কিছুতেই ভুলতে পারছিনা যে মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদীরা এখনও আমাদের তাইওয়ান ভূভাগের উপর আক্রমণ চালিয়ে তা দখলে রাখবার চেষ্টা করছে। আক্রমণাত্মক যুদ্ধ বিস্তারের উদ্দেশ্যে আজ তারা শান্তিকামী নিরীহ কোরীয়দের ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেছে। নির্বিচারে বোমা বর্ষণ ও জীবাণুযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

"অতএব আমাদের স্বদেশ রক্ষার জন্য ও সুদূর প্রাচ্য ও সমস্ত পৃথিবীর শান্তি সংরক্ষণের জন্য আমি আপনাদের অনুরোধ করছি যে আপনারা সর্বদাই হুঁশিয়ার থাকুন······তাইওয়ান-এর মুক্তির জন্য ও জাতীয় সংগঠনমূলক কার্যে আরও সাফল্য লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ হোন।

"চীন মুক্তি ফৌজ দীর্ঘজীবী হোক!

"চীন প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক!

"জন সাধারণের ঐক্য দীর্ঘজীবী হোক!

"চীন জনগণের বিজয়ের পথপ্রদর্শক কমিউনিস্ট পার্টি দীর্ঘজীবী হোক! চীন জনগণের সুমহান্ নেতা সভাপতি মাও সে-তুং দীর্ঘজীবী হোন!"
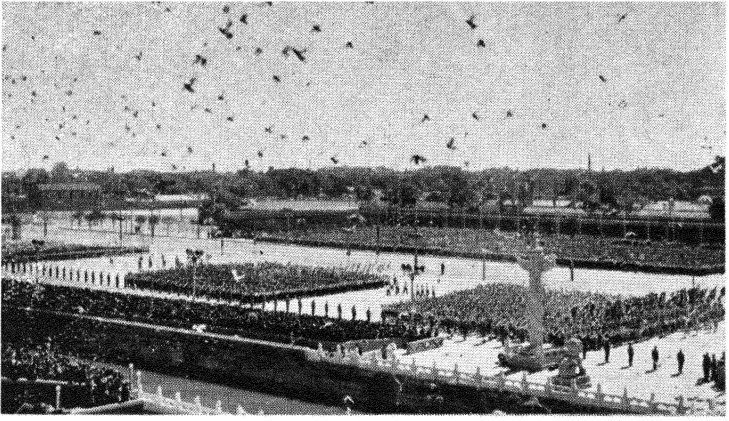
শান্তির কপোত আকাশে উড়িয়ে চীনা গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের তৃতীয় বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

জাতীয় দিবস ও পিকিং শান্তি সম্মেলনের উৎসব সজ্জার জন্য পিকিংয়ের মেয়েরা কাগজের ফুল, নক্শা ইত্যাদি তৈরি করতে ব্যস্ত।

তিয়েন আন্-মেন স্কোয়ারে তৃতীয় জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিক মিছিল।
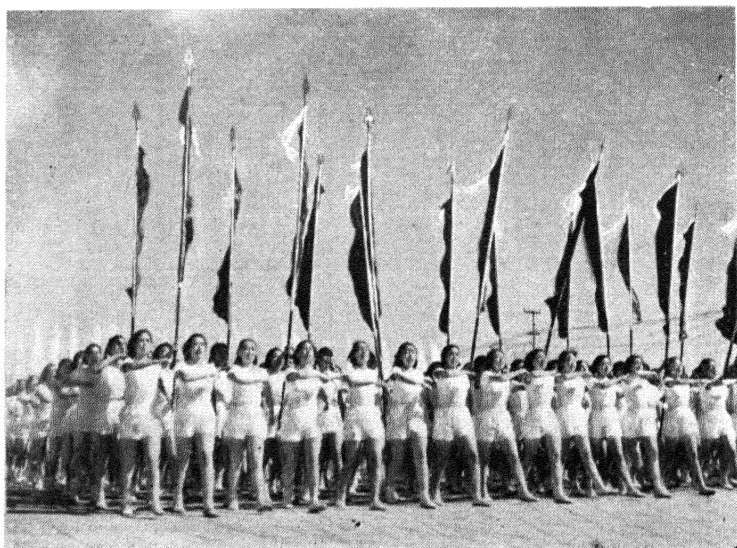
তিয়েন আন্-মেন স্কোয়ারে সহস্রাধিক তরুণী মিছিল ক'রে চলেছে প্রতি পদক্ষেপে নয়াচীনের যৌবন, স্বাস্থ্য ও প্রাচুর্য ঘোষণা ক'রে।

পাঁচ লক্ষ নরনারীর মিছিল

তারপর প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ চু-তের কাছে থেকে 'নির্দেশনামা' পাবার পর সমস্ত বিভাগের সৈনিকেরা একটি নিখুঁত সঙ্ঘবদ্ধ ব্যূহ রচনা ক'রে যখন স্কোয়ারের মধ্য দিয়ে শোভাযাত্রা ক'রে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন চারদিক থেকে দর্শকবৃন্দ করতালি ও হর্ষধ্বনি দিতে লাগল "মুক্তি ফৌজ দীর্ঘজীবী হোক," "জেনারেল চু-তে দীর্ঘজীবী হোন!" সামরিক প্রদর্শনীর অগ্রভাগ অধিকার করে চলছেন বিমান ও নৌ বিভাগের লোকেরা। তারপর এগিয়ে আসতে লাগলেন সমগ্র পদাতিক সৈন্যবাহিনী। তাদের অনুসরণ ক'রে এগিয়ে চলেছেন বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর ষোলটি স্বদেশরক্ষীদল। মাতৃভূমিকে সমস্ত শক্তি দিয়ে রক্ষা করবার জন্য এঁরা যে প্রস্তুত, সহস্র সহস্র সৈনিকের দৃঢ় পদক্ষেপের মধ্য দিয়েই যেন তা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

একে একে এগিয়ে চলে ঘোড়-সওয়ার, সাইকেল ও মোটর বাহিনী। এগিয়ে চলে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হাজার হাজার মোটর ট্রাক ও ট্যাঙ্ক বাহিনী এবং আরও অনেক রকম সাঁজোয়া গাড়ি—যার নাম আমার জানা নেই। তারপর মাথার উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান এসে নীচু হয়ে আবার উপরে উঠে চলে যেতে লাগল।

সহস্র সহস্র সৈনিকের পেছনে সামরিক কায়দায় মার্চ করে নানা বর্ণের পতাকা-তরঙ্গের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসছিল বেসামরিক স্বেচ্ছাসেবক দল। মাও সে-তুং-এর আহ্বান সম্বলিত বিভিন্ন পোস্টার দেখা যাচ্ছে এই জনসমুদ্রের মধ্যে। মনোমুগ্ধকর ও উদ্দীপনাময় এই প্রদর্শনী দেখে সত্যিই অভিভূত হয়ে যেতে হয়। মার্কস, এঙ্গেল্‌স্‌,

লেনিন, স্তালিন, মাও সে-তুং, ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন, লিউ শাও-চি, চু-তে প্রভৃতির এবং আরও অনেক মনীষীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছবি বহন করে চলেছেন প্রদর্শনকারীরা। শান্তির প্রতীক শ্বেত কপোতের ছবি অঙ্কিত সহস্র সহস্র নীল পতাকা নিয়ে চলেছেন যুবা, বৃদ্ধ, শিশু ও নারী—শান্তি প্রতিষ্ঠার এক দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। দশ সহস্র লোকের একদল স্বেচ্ছাসেবক চেয়ারম্যান মাও সে-তুংকে দেখবামাত্র বিপুল আনন্দোল্লাসে অসংখ্য বেলুন আকাশে উড়িয়ে দিল। প্রায় দশ হাজার নারী ও শিশুর এক বিরাট বাহিনী বক্তৃতা মঞ্চের ঠিক সম্মুখীন হয়েই সহস্র সহস্র শ্বেত কপোত আকাশে উড়িয়ে দিল। সারা আকাশ জুড়ে রঙিন বেলুন ও পাখীরা উড়ছে। অদ্ভুত দৃশ্য দেখে দর্শকমণ্ডলী ঘন ঘন করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাতে লাগল।

তারপর এল এক লক্ষ শ্রমিকের এক বিরাট মিছিল। মাত্র এই সামান্য ক'বছরের মধ্যে শিল্পক্ষেত্রে যে সব বিরাট বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়েছে তারই কতগুলো নিখুঁত চিত্র তারা সাক্ষ্য হিসাবে বহন করে চলেছে। তার মধ্যে ছিল মাত্র পঁচাত্তর দিনের মধ্যে তৈরি শান্তি-হোটেলের সুবৃহৎ অট্টালিকার এক বিরাট চিত্র। অসীম উদ্দীপনা ও উল্লাসের মধ্যে অবিরত ধ্বনি উঠছে "মাও সে-তুং দীর্ঘজীবী হোন্", "চীন প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক"।

তারপর এল সহস্র সহস্র কৃষাণদল। সহরের বহিরাঞ্চল থেকে এঁরা এসেছেন। উজ্জ্বল পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে সহস্র সহস্র কৃষক রমণী চলেছেন ভূমি-সংস্কারের পর তাঁদের উন্নতির বিভিন্ন চিত্র বহন করে। উল্লসিত আওয়াজ করে চলেছেন, "মাও সে-তুং দীর্ঘজীবী হোন্", "চীন প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক", ."সোবিয়েৎ

জনগণকে অভিনন্দন জানাই", "স্তালিন দীর্ঘজীবী হোন্", "কোরিয়া ভিয়েৎনামের বীর সন্তানদের অভিনন্দন জানাই", "পৃথিবীর শান্তি রক্ষার জন্য যারা সর্বদাই সচেতন তাদের অভিনন্দন জানাই"।

মিছিল চলছে তো চলছেই—জনস্রোতের যেন আর শেষ নেই। চলছে অফিস-কর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের এক বিরাট মিছিল—বীজাণুযুদ্ধ ও আমেরিকান আক্রমণকারীদের তীব্র নিন্দা-যুক্ত ছবি ও পোস্টার বহন করে। চলছেন ছাত্র ও শিক্ষকগণ—আট দশ ফুট উঁচু মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিন, মাও সে-তুং, গর্কী প্রমুখ মনীষীগণের বিভিন্ন বইয়ের প্রচ্ছদপটের চিত্র অথবা গোটা বই-এরই একটি মডেল বহন ক'রে। মিছিল চলেছে তো চলেছেই······ মাথার উপর প্রচণ্ড রৌদ্র। কারো সেদিক ভ্রূক্ষেপ নেই। দর্শকগণ ঘন ঘন করতালি দিয়ে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছেন। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত এক এক দল আসে, জয়োল্লাস করতে করতে চলে যায় অন্য দলকে আসবার সুযোগ দিয়ে। চলেছেন সাহিত্যিক-বৃন্দ, চলেছেন চিত্র-শিল্পীগণ নিজের অঙ্কিত দেশ বিদেশের নেতাদের ছবি বহন করে। তারপর চলেছে গীতবাদ্য সহকারে গায়ক ও বাদ্যযন্ত্রী দল। চলেছে অপেরা ও ফিল্মের অভিনেতা ও অভিনেত্রী-দল। চীন মুক্ত হবার পর শিল্পীগণ যে ছবি বা অপেরায় যে যে চরিত্রে অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেছেন সেই বিশেষ চরিত্রের পোষাকেই সজ্জিত হ'য়ে এসেছেন।

মিছিল দেখছি তন্ময় হ'য়ে। আমার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন পুণার বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী রোহিনী ভাটে। এই দৃশ্যে উদ্দীপিত হ'য়ে তিনি আমার হাত দুটো ধরে বল্লেন, এঁরা সত্যিই স্বাধীনতা পেয়েছে !······আমাদের দেশে কবে এমন দিন আসবে যেদিন

লক্ষ লক্ষ ছাত্র, যুবা, নারী, বৃদ্ধ বা শিশুদের সাথে আমরা শিল্পীরাও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মিছিলে যোগ দেব!……

শোভাযাত্রা তখনও শেষ হয় নি। বৈজ্ঞানিক ও তাদের ছাত্ররা চলেছেন বিজ্ঞান পুস্তক ও আধুনিক কল কারখানার যন্ত্রপাতির ছবি বা মডেল নিয়ে। "যুদ্ধ বন্দীদের হাত থেকে মারণাস্ত্র ছিনিয়ে নাও", "কোরিয়ার জীবাণু যুদ্ধে ব্যাপৃত মার্কিনদের আমরা ঘৃণা করি" ইত্যাদি অবিরাম ধ্বনি দিয়ে চলেছেন তাঁরা।

তারপর চলেছেন প্রায় সহস্রাধিক স্বাস্থ্যবতী তরুণী চলমান্ ক্রীড়া নৈপুণ্যে সকলকে মুগ্ধ করে। এরপর এল বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বিরাট এক শোভাযাত্রা। শান্তির প্রতীক শ্বেত কপোতের প্রতিমূর্তি হাতে সন্ন্যাসীরা চলেছেন এই মিছিলের গৌরব আরও বর্ধিত করে। বক্তৃতা মঞ্চের উপর মাও সে-তুং এবং অন্যান্য নেতারা তখনও দাঁড়িয়ে। সন্ন্যাসীরা বার বার তাঁদের দীর্ঘায়ু কামনায় মঞ্চের দিকে হস্ত উত্তোলন করে মন্দ্র কণ্ঠে উচ্চারণ করছিলেন, "মাও সে-তুং তুমি দীর্ঘজীবী হও! চীন প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক"।

চীন জনগণের রাজনৈতিক পরামর্শ পরিষদের তরফ থেকে মাও সে-তুংকে একখানা জাতীয় পতাকা উপহার দেওয়া হল।

মাও সে-তুং এতক্ষণ মঞ্চের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন। বেলা দু'টো বাজতে পাচ মিনিট বাকী। প্রদর্শনী শেষ হতেই মাও সে-তুংকে উদ্দেশ করে দীর্ঘায়িত জয়ধ্বনি চলতে লাগল। এবার মাও সে-তুং সুউচ্চ মঞ্চের ডান দিকটায় এগিয়ে আসতে লাগলেন— যে দিকটায় আমাদের গ্যালারি ছিল। মাথার টুপি খুলে বারবার আমাদের তিনি অভিনন্দন জানালেন। আমরাও প্রত্যুত্তরে বিভিন্ন

ভাষায় "মাও সে-তুং ওয়ান্ সোয়ে" ("দীর্ঘজীবী হোন") বলে চীৎকার করে সমস্ত মন উজাড় করে অভিনন্দন জানাতে লাগলাম।

অবশেষে লক্ষ লক্ষ লোকের সেই মহা-মিছিল শেষ হল। অসীম উদ্দীপনা ও নতুন চেতনা লাভ করে হোটেলে ফিরে এলাম। কমরেড ইয়াং (দোভাষী) সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছেন ছায়ার মত। যা দেখি, যা না বুঝি জিজ্ঞেস করি ইয়াংকে। জবাব পেতে এক নিমেষও দেরি হয় না। শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, দ্বিধা নেই, বিরক্তির ভাব নেই ; খালি সুবিধা-অসুবিধার কথা ওঁকে বলে যাও—কি দেখতে চাই, কি খেতে চাই বল, ব্যবস্থার দায়িত্ব পালন করতেই তিনি আছেন। মাঝে মাঝে নিজেই লজ্জিত হ'য়ে ভাবতাম লোকটার কাণের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করে চলেছি—যাক্, খানিকক্ষণ ওঁকে বিরাম দিই। কিন্তু আমি চুপ করে থাকলে যেন তিনি অস্বস্তি বোধ করেন। বার বার মুখের পানে তাকান। তবু যদি প্রশ্ন না করি নিজেই হয়ত বলতে সুরু করেন "ঐ যে বৌদ্ধ মন্দির দেখছ, জাপানী সৈন্যেরা এর ভিতরের স্থাপত্য-শিল্পগুলো পর্যন্ত সহ্য করতে পারত না। দেয়ালের কারুকার্য ইচ্ছা করেই নষ্ট করত। দামী জিনিসগুলো অবশ্য বহু আগেই লুঠ করা শেষ হয়েছিল।······যদি কোনও সাহসী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি মন্দিরের দ্রব্য-সামগ্রী ধ্বংস না করবার জন্য আবেদন জানাত, সঙ্গে সঙ্গে তারা বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তার পেটের মধ্যে গুঁতো দিত আর চোখ রাঙ্গিয়ে সাবধান করে দিত অযাচিত উপদেশ না দেবার জন্য।" বলতে বলতে কমরেড ইয়াং-এর কণ্ঠস্বর আর্দ্র হয়ে আসে। তিনি বলেন, "ভারতবাসীর অতি বড় সৌভাগ্য যে গত যুদ্ধে জাপানের অধীনে একদিনও তাদের থাকতে হয়নি।"

কমরেড ইয়াং অনুরোধ জানায় তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নিতে। সন্ধ্যা হতেই আবার যেতে হবে তিয়েন এন্-মেন্ স্কোয়ারে।

যথাসময়ে আবার হাজির হলাম সেই গ্যালারিতে। এখন দেখছি নবরূপে নব সজ্জায় সজ্জিত হয়েছে তিয়েন এন্-মেন স্কোয়ার। উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত কত শত অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক কায়দায় তৈরি বাতি, তারও আলো কী স্নিগ্ধ আর চমৎকার! সারা শহরময় উৎসব চলেছে। আতসবাজি পোড়ান হচ্ছিল। কত রকম যে সব বাজি! আগুনের ছোট্ট এক স্ফুলিঙ্গ আকাশে ছিটকে উঠল। শূন্যে গিয়েই সহস্র তারায় ঝরে পড়ল। কখনো বা একটি ছোট তারার মত আলো আকাশ ভেদ করে গিয়ে লাল, নীল, সবুজ রঙের ফুলঝুরি বা চমৎকার মালায় পরিণত হ'ল। এক রকম বাজি আকাশের গায়ে আঁকছে বিভিন্ন রঙের আলোর লিখন বিভিন্ন ভাষায়—"শান্তি···শান্তি···শান্তি···"। আরও কত বিচিত্র আশ্চর্য বাজি—দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক যাদু-রাজ্যে এসে পড়েছি।

শহরের অনেকটা জায়গায় শোনা যেতে পারে এমন ভাবে লাউড্ স্পীকার ফিট্ করা হয়েছে—তাতে শোনা যাচ্ছে মার্চের সুরে অথবা দ্রুত লয়ের লোক-সঙ্গীত। তালে তালে নাচছে সহস্র সহস্র নরনারী, বালক বালিকা। এইবার আর গ্যালারিতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। কুমারী ওয়াং সি-মিংএর হাত ধরে নীচে নেমে জনসমুদ্রের মধ্যে মিশে গেলাম। বালক বালিকাদের মধ্যে একদল তালে তালে নৃত্য করছে আর গান গাইছে। অন্যান্য সবাই গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে তালে তালে হাত তালি দিয়ে আনন্দ উপভোগ করছে। বিরাট স্কোয়ারের সবখানি জুড়ে এমনি কত যে দল চক্রাকারে বিভক্ত হয়ে হৈ হুল্লোড় করে চলেছে তার সীমা

সংখ্যা নেই। কুমারী ওয়াং ভীড়ের হাত থেকে আমায় রক্ষা করার জন্য দু'হাত প্রসারিত করে এগুতে লাগলেন। এক জায়গায় দেখলাম একদল ছেলে মেয়ে আমাদের তারাবাবুকে (মার্ক্সিস্ট-ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা) ধরেছেন গীত ও নৃত্যে তাদের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করার জন্য। তারাবাবু বোধ হয় নিজে এড়াবার জন্যই আমাকে দেখিয়ে দিলেন। কুমারী ওয়াংকে এতক্ষণ বন্ধু বলেই জানতাম, কিন্তু এবার তিনিও আমার সঙ্গে 'বিশ্বাসঘাতকতা' করলেন দেখছি! নিজেদের ভাষায় কি চীৎকার করে বলতেই ছেলে মেয়ের দল হাত ধরে টেনে নামাল তাদের আসরে। অনন্যোপায় হয়ে যোগ দিতে হোল। এইবার তালে তালে নিজের খুশিমত গাইছি ও নাচছি তাদের সঙ্গে। তারাবাবুও রেহাই পেলেন না। তাদের সঙ্গে নাচতে হ'ল হাতে হাত ধ'রে এলোপাথাড়ি নৃত্য!

তারপর এগিয়ে গেলাম......দেখছি আমাদের শ্রীমতী ভাটেও নৃত্য করছিলেন একদল ছেলে মেয়ের সঙ্গে। তারাবাবু ও আমি গিয়ে যোগ দিলাম। ভাল-মন্দর বাছ বিচার নেই, তালে তালে পা ফেলতে পারলেই হোল। যার তাল জ্ঞান নেই? লম্ফ ঝম্ফ করলেই বা ক্ষতি কি! এখানে নিন্দার বালাই নেই, ওদের সঙ্গে একত্র হয়ে লাফাতে পারলেই হ'ল। আবার এগিয়ে গিয়ে আর এক দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছি, সেখানে গিয়ে দেখলাম পাকিস্তানের কয়েকজন প্রতিনিধি নাচছেন আর গাইছেন। স্থর কি বেস্থর, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবার নেই। হঠাৎ কমরেড ইয়াং এসে হাজির। ছেলে-মেয়েদের কাছে ঘোষণা করলেন, "ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা একত্রে এইবার নাচ গান করবেন।" শ্রীমতী ভাটে স্থরু করলেন নৃত্য, আমি ধরলাম গান। সঙ্গে যোগ দিলেন পাকিস্তানের কয়েকজন

প্রতিনিধি। পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পুর্ব বাংলা কমিটির সম্পাদক জনাব মজিবুর রহমান, ঢাকার "যুগদাবী" কাগজের সম্পাদক মহম্মদ ইলিয়াস, আমাদের তারাবাবু, কাশ্মীরের নাদিম প্রভৃতি চীনা ছেলেমেয়েদের সাথে একত্র হয়ে হাত ধরাধরি করে লম্ফ ঝম্ফ সুরু করে দিয়েছেন। আমি গান গাইছি। আশেপাশে সবাই করতালি দিচ্ছে। সে এক অপুর্ব পরিবেশ!

আবার অন্য একদিকে রওনা হলাম। এবার দেখছি আমাদের মনোজদা (সু-সাহিত্যিক মনোজ বসু) কয়েকটি ছেলেমেয়ের হাত ধরে নাচছেন। অবশ্য আজ কেউ কারো নাচ গান দেখে শুনে আশ্চর্য হচ্ছি না। আশ্চর্য লাগে শুধু যারা নাচ গান করছে না তাদের দেখে।

এইবার ভীড় কিছুটা কমে আসছে। আস্তে আস্তে হোটেলের দিকে রওনা হলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমায় ঘিরে চলেছে একদল কিশোর কিশোরী। ওরা গাইছে "স্যাংলী দ্ সিজ হলা লাদি ফিও"………। ওদের সঙ্গে আমিও গাইছি "সারা দুনিয়ার সব মানুষের একটিমাত্র মন": চীন দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতাদের অতি প্রিয় সঙ্গীত। এ গানখানি যে কত শতবার আমরা শুনেছি তার ইয়ত্তা নেই। শুনে আমরাও অনেকে শিখে ফেলেছি।

রাত ঠিক দেড়টায় হোটেলের গেটের সামনে এসে পৌছলাম। এইবার ছাড়াছাড়ির পালা। কিছুতেই ওরা ছাড়তে চায় না। চলতি পথিকেরাও ভীড় করে দাঁড়ায়। বালক বালিকাদের মাথার উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দেয় করমর্দন করার জন্য। তখন যদি কোন শিল্পী সে-দৃশ্য ছবিতে আঁকতেন, দেখা যেত একরাশ ফুলের মধ্যে যেন আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি……

······হোটেলের রিভলভিং দরজা দিয়ে যখন ভিতরে ঢুকলাম শত শত "গুণগ্রাহী" বালক বালিকার ভীড় তখনও কমেনি।

পিকিং শান্তি সম্মেলন শুরু

পরের দিন ২রা অক্টোবর এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার শান্তি সম্মেলন শুরু হবে বিকাল ৩টায়। গতকাল অনেক রাত পর্যন্ত হৈ চৈ করেছি, স্নুতরাং দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর দিবা নিদ্রার প্রয়োজন বোধ করা খুবই স্বাভাবিক। তারপর শীতও কম পড়েনি— চল্লিশ ডিগ্রীর নীচেই হবে।

হাল ফ্যাশনের স্প্রীং-এর খাট, বসলে তা প্রায় দেড়ফুট বসে যায়। দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপর মোলায়েম লেপ; তার উপর আর একখানি কম্বল চাপিয়ে মহা আরামে ঘুমোচ্ছি। যথাসময়ে কমরেড ইয়াং এসে হাজির, "উঠুন—সময় হয়ে গেছে। নীচে গাড়ী প্রস্তুত।"

চীনে থাকাকালীন আমাদের অনেকেরই মাঝে মাঝে একটি বিষয়ে খুবই অস্নুবিধায় পড়তে হয়েছিল। সেটি হল আমাদের সময়নিষ্ঠার অভাব। সে দেশের মানুষরা আজকাল যেন কাঁটায় কাঁটায় চলে। বারোটায় কথা হ'লে, সোয়া বারোটা হওয়ার যো নেই। তিয়েন-সিন জেলার সারা-চীন শ্রমিক সংঘের অন্যতম নেতা বিখ্যাত স্নবশিল্পী কমরেড লিউ চি একদিন আমাকে টেলিফোন করলেন—"কখন তোমার সময় হবে? আমি দেখা করতে চাই।" আমি পরের দিন সাড়ে চারটার থেকে পাঁচটার মধ্যে আসতে অনুরোধ করলাম। তিনি তার উত্তরে আবার জানতে চাইলেন —"ঠিক টাইম কটায়, সাড়ে চারটা না পাঁচটায়"। আমরা বাঙালী লোক। আমাদের এমনিই এসব ব্যাপারে একটা দুর্নাম আছে···

"বাঙালীর টাইম"। আমি গান বাজনার লাইনের লোক, আমাদের দুর্নাম তো আরও বেশি। আমায় তো বেশ কয়েকদিন এ নিয়ে বিভ্রাটে পড়তে হয়েছিল। তাড়াতাড়ি কোন কাজে রওনা হতে নোটবুক কিংবা ফাউণ্টেন্‌পেন ফেলে আসি, ফাউণ্টেন্‌ পেন আনি তো ডেলিগেট কার্ড আনতে ভুলে যাই। যে সব ছেলেমেয়েদের উপর আমাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ছিল তারা যে আমাদের তাড়নায় পাগল হয়ে যায়নি, সেটাই আশ্চর্য!

যাই হোক্, প্রথম দিনের সম্মেলন হবে, প্রচণ্ড উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে সম্মেলনের হলের সামনে হাজির হলাম। অনেক মোটর, বাস অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে আগেই এসে পৌঁছেছে।

স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতিনিধির কার্ড দেখিয়ে হলের মধ্যে প্রবেশ করলাম। বিরাট হল ঘর। নানা রকম কারু-চিত্রে বিচিত্রিত। মাত্র দুদিন আগে এই হলে এসেছিলাম মাও সে-তুং-এর ভোজ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে। কিন্তু এখন তা একেবারেই চেনবার যো নেই। ব্যবস্থাদি সাজ-সরঞ্জামের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে—মঞ্চের পেছনে শ্রেষ্ঠ চিত্রকর পিকাসোর অনুকরণে অঙ্কিত সুবৃহৎ এক শান্তি-কপোত। তার দু'পাশে রয়েছে সাঁইত্রিশটি দেশের জাতীয় পতাকা। এই সুদৃশ্য হলটিতে যেন সত্যিই শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রতিনিধি বা দর্শকগণের জন্য নির্দিষ্ট আসনের উপর সেই সেই দেশের জাতীয় পতাকা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছিল। অবশ্য পতাকার নীচে দেশের নামগুলোও লেখা ছিল।

হলের প্রায় মাঝখানে আমাদের ভারতবর্ষের প্রতিনিধিবৃন্দের আসন দেওয়া হয়েছে। প্রতিনিধি সংখ্যাও আমাদের সবচেয়ে বেশি ছিল। আমাদের উনষাট জন, তারপরেই পাকিস্তানের

প্রতিনিধি সংখ্যা তিরিশ জন। সোবিয়েৎ ইউনিয়নের প্রতিনিধি ছিলেন ছ'জন।

প্রতিনিধিদের মধ্যে অনেকেই এসেছেন বহু দূর-দুরান্তর থেকে, পর্বত মহাসাগর ডিঙিয়ে, বহু বাধা বিপত্তি, সরকারী নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে। এই প্রসঙ্গে জাপানী প্রতিনিধিদের বিশেষভাবে শ্রদ্ধা না জানালে আমার দিক থেকে মস্ত ত্রুটি থেকে যাবে।······যোশিদা গভর্নমেণ্ট সেখানে একজনকেও ছাড়পত্র দেয় নি; তবুও কিন্তু সেখান থেকে অধ্যাপক, শিল্পী, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, ব্যবসায়ী ছাত্র প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর পনেরজন প্রতিনিধি এই শান্তি সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন!

প্রথমত প্রস্তুতি কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিউ-নিং আই প্রেসিডিয়ামের তেষট্টি জনের মধ্য থেকে আজকের জন্য বিশেষ-ভাবে যাঁরা সভার কার্য পরিচালনা করবেন তাঁদের নাম ঘোষণা করলেন। তাঁরা হলেন মাদাম সুং চিং-লিং (চীন), ডাঃ কিচলু (ভারত), মহম্মদ ইফতিখারউদ্দীন (পাকিস্তান), হিরোশি মিনামি (জাপান), ইডিউয়ার্ডো ডেলভারডি (কস্টারিকা)।

নাম ঘোষণার পর নিজ নিজ আসন গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই বাদ্যযন্ত্রাদি বেজে উঠল। মুহূর্ত মধ্যে একদল কালো হাফ্‌প্যাণ্ট, সাদা জামা, গলায় লাল রুমাল বাঁধা দশ বার বছরের ছেলেমেয়ে (ইয়ং পাইওনীয়র) হলের মধ্যে প্রবেশ ক'রে সভাপতিদের প্রত্যেকের হাতে ফুলের তোড়া উপহার দিল। সভাপতিবৃন্দ ছেলেদের আলিঙ্গন করে উপরে তুলে ধরলেন। আমরা হলের প্রত্যেক প্রতিনিধি ঘন ঘন করতালি দিয়ে এই অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করলাম।

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার ১৬০ কোটি লোকের প্রতিনিধিবৃন্দের এই বিরাট সম্মেলন। প্রথম উদ্বোধনী বক্তৃতা করলেন মাদাম সুং। তারপর একে একে ডাঃ কিচ্‌লু, পাকিস্তানের পীর মানকি শরীফ, জাপানের হিরোশি মিনামি প্রভৃতি বক্তৃতা করলেন।

চীনের কর্ণধার মাও সে-তুং এর নিকট থেকে যখন অভিনন্দন বাণী পৌছল, তখন সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দ সকলেই দাঁড়িয়ে উঠে করতালি দিয়ে শ্রদ্ধা ও হর্ষ জ্ঞাপন করলেন।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শান্তি আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ নেতাদের অভিনন্দন বাণীও পড়ে শোনান হ'ল, যেমন, বিশ্বশান্তি সংসদের সভাপতি জোলিও কুরি, বিশ্বশান্তি সংসদের সদস্য পাবলো নেরুদা, ও বিখ্যাত নিগ্রো গায়ক পল রবসন প্রভৃতির বাণী।

নীচে আমি ডাঃ কিচলুর অভিভাষণটি তাঁর নিজের মুখে যেমন শুনেছিলাম সেইভাবেই তুলে দিলাম—

ডাঃ কিচলু যা বলেছিলেন

প্রিয় সভাপতি, সভাপতি মঞ্চের সভ্যগণ ও প্রতিনিধিবৃন্দ!

—শান্তিকামী ভারতবাসীর পক্ষ থেকে আমি এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার শান্তিরক্ষকদের অভিবাদন জানাচ্ছি।

—ভারতের লোকেরা এই অধিবেশনের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে, এবং সমগ্র এশিয়ায় ও এমন কি সমস্ত পৃথিবীতে শান্তিকে প্রতিষ্ঠিত করবার মহান্ উদ্দেশ্য এই অধিবেশনের মধ্যে নিহিত রয়েছে—ভারতবাসী সে কথাও ভাবে। এবং একমাত্র এই কারণেই ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে যোগদান করেছেন।

—ভারতের শান্তি-প্রেমিকদের পক্ষ থেকে আমি চীনের গণতন্ত্রকে অভিবাদন জানাচ্ছি। এবং চেয়ারম্যান মাও সে-তুং-এর নেতৃত্বাধীনে যে সব শক্তিশালী ও বীর সৈনিক সমগ্র এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, তাদের অভিবাদন জানাচ্ছি।

—যেদিন থেকে আমরা চীন গণতন্ত্রের রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করেছি, সেদিন থেকেই আমরা চীনবাসীর আন্তরিক বন্ধুত্ব ও আতিথেয়তায় মুগ্ধ হ'য়ে গেছি। এবং তাদের শান্তিমূলক গঠনকাজে ও চীন গণতন্ত্রের তৃতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবসের কার্যকলাপে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়েছি।

—বর্বর আমেরিকান সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে যে সব বীর কোরিয়াবাসী তাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও শান্তিকে রক্ষা করবার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে—তাদের এবং কোরিয়ার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে অভিবাদন জানাচ্ছি।

—ভিয়েৎনাম এবং মালয়ের যে সব অধিবাসীরা তাদের জাতীয় স্বাধীনতা এবং তাদের জনগণের শান্তিপুর্ণ ও মুক্ত জীবন যাপনের ধারাকে অব্যাহত রাখবার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে আমি তাদেরও অভিবাদন জানাচ্ছি।

—জাপানের যে সব প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে যোগদান করবার জন্যে ভীতি প্রদর্শন ও প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করেছেন আমি তাদেরও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

—আমেরিকার শান্তিকামী মানবদেরও আমি অভিবাদন জানাচ্ছি, শান্তিকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তাঁদের বহু বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে সমগ্র পৃথিবীতে শান্তিকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আমেরিকাবাসীরা

পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীদের কাছ থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্বন্ধেরই পরিচয় পাবে।

—আমাদের এই মহাসম্মেলনে যোগদান করবার জন্যে নিউজিল্যাণ্ড, ল্যাটিন আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও মধ্য এশিয়ার যে সব প্রতিনিধিরা সমস্ত রকম বাধা অতিক্রম করেছেন আমি তাঁদেরও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

—আমি নিজেকে আরও অধিকতর সুখী মনে করছি এইজন্যে যে, আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী পাকিস্তান আজ এই সম্মেলনে তার অনেক প্রতিনিধিকে পাঠিয়েছে। আমি তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি—আর আমি এ কথাও মনে করি যে এই সম্মেলনে আমাদের উভয়ের মধ্যে যে বন্ধুত্ব ও শুভেচ্ছার বিনিময় হ'ল তা ভবিষ্যতে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আরও গভীর আকার ধারণ করবে।

-শান্তি দীর্ঘজীবী হোক! এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার শান্তিসম্মেলনের সাফল্য কামনা করি।

* * *

এরপর বলেছিলেন পীর মানকি শরীফ। তার বক্তৃতাটিও তুলে দেবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। যতটা মনে আছে নীচে দিয়ে দিলাম—

…"পাকিস্তান শান্তিসংসদ ও পাকিস্তানের শান্তি আন্দোলনের পক্ষ থেকে আমি এই এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার সম্মেলনকে অভিবাদন জানাচ্ছি। এই সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের থেকে যে সব প্রতিনিধিরা সমবেত হয়েছেন তাঁদের সঙ্গে যে আজ সম্মিলিত হ'তে পেরেছি—তাতে আমি নিজে গর্ব অনুভব করছি। শান্তি হচ্ছে

অবিভাজ্য এবং এই শান্তিকে কোন দেশ বা কোন ব্যক্তি একা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। সুতরাং এই শান্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে, প্রয়োজন হয় বিভিন্ন দেশের ও দশের সমবেত চেষ্টা। আমরা এখন শান্তিকে চিরপ্রতিষ্ঠিত করতে দৃঢ়সঙ্কল্প হ'য়েছি। পরস্পর সহানুভূতি ও বন্ধুত্ব ও ভালবাসার দ্বারা আমরা বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে এই শান্তিকে প্রতিষ্ঠিত করব। শুধু ইচ্ছা থাকলেই শান্তি আনা যায় না। সুতরাং এই শান্তিকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আমাদের সমবেত চেষ্টা ও নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবনের প্রয়োজন।

"......কাশ্মীর নিয়ে ভারত ও পাকিস্তান এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলছে, তাতে এশিয়ার এই দুই রাজ্যের বন্ধুত্ব ব্যাহত হচ্ছে এবং তাতে যুদ্ধমূলক এমন কতকগুলি খরচের প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে যে খরচ দুই দেশের কেউই বহন করতে অপারগ। এবং তার ফলে উভয় রাষ্ট্রই ইংরেজ ও আমেরিকাকে তাদের স্বকীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নিজেদের মধ্যে ডেকে আনছে।

"এটা খুবই আনন্দের বিষয় যে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদ্বয় এই সম্মেলনে যোগদান করতে পেরে এই সমস্যার সমাধান করবার একটা পূর্ণ সুযোগ পেয়েছে। এবং আন্তরিকতার সঙ্গে আশা ও উপলব্ধি করছে যে ভারত ও পাকিস্তান, এমন কি সমগ্র পৃথিবীর শান্তিকামী লোকেরা যে শান্তি-প্রতিষ্ঠার কামনা করছে, তা বন্ধুত্ব-মূলকভাবেই সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। শান্তি দীর্ঘজীবী হোক...সমস্ত জাতির স্বাধীনতা দীর্ঘজীবী হোক !!"

* * *

পরের দিন ৩রা অক্টোবর সকাল ৯টায় পাকিস্তানের প্রতিনিধি পাকিস্তান পার্লামেণ্টের সভ্য মিঞা ইফ্‌তিখারউদ্দীন সম্মেলন

উদ্বোধন করলেন। চীন ও জাপানের প্রতিনিধিদ্বয়ের বক্তৃতার পর সকালের অধিবেশন শেষ হল।

হোটেলে ফিরে এলাম সাড়ে এগারোটায়। ঘরে বসে মনোজদার সঙ্গে গল্প করছি। কতরকম হাসি ঠাট্টা আমাদের নিজেদের খাওয়া-দাওয়া চলাফেরার বিভ্রাট নিয়ে। আমরা যেন চীনদেশের নাত্-জামাই হয়ে আছি। তোফা তোয়াজের উপর দিনগুলো কাটিয়ে যাচ্ছি। ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে গেলাম। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খাসা বাথরুমটি। হাতমুখ ধুলাম গরমজলে। সুবৃহৎ টবের মধ্যে গরম জল ভর্তি করে প্রায় গা ডুবিয়ে স্নান সেরে যেন দয়া করে ব্রেকফাস্টে রওনা হলাম। তেতলা, চারতলা ফুঁড়ে লিফট্ একেবারে ছাদের উপর বিরাট ডাইনিং হলের সম্মুখে এসে থামল। সাদা কালো পীত গৌর ইত্যাদি বিভিন্ন বর্ণের নরনারী প্রায় একই সময় বিভিন্ন টেবিলে ছড়িয়ে আছে। তারমধ্যে যে কোন একটা টেবিলে গিয়ে বসলাম।

আমাদের নাদুস-নুদুস্ বন্ধুটি দেখছি আগেই এসে বসে আছেন। "মেন্যু" দেখে খাবার অর্ডার দিই। কোনটা কিসের মাংস, কি রকম তার স্বাদ, কে জানে? ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করি, কি কি খেলেন? তিনি উত্তর দিলেন "ওঃ সামান্য"। আমি নাক-কান-কাটা লোক, আমার কাছে সামান্য-টামান্য নেই। ভাল লাগলে চেয়ে-চিন্তে নিতেও আমার কোন লজ্জা নেই। পূর্বোল্লিখিত ভদ্র-লোকটি টুকরো টুকরো আপেল বা আঙ্গুর মুখে পুরছেন; আর আমায় দেখিয়ে মনোজদাকে বলছেন "খানেওয়ালা যদি কেউ থাকেন তবে উনিই আছেন"। অবশ্য হোটেলের মহিলা কর্মী বিল নিয়ে যখন এলেন, সত্যকথা বলতে কি, দেখলাম যে তিনি সামান্য যা খেয়েছেন

তাতেই তার বিল আমার প্রায় ডবল। যাই হোক্ বিল যত খুশি উঠুক না কেন, কার কি আসে যায়; বিলের উপর একটা সই করলেই হ'ল, আমরা তো অতিথি!

এমনি দুপুরেও আর এক পত্তন চলে যাকে বলা হয় লাঞ্চ। আবার রাত সাতটা থেকে শুরু হয় ডিনার। এরকম ব্যবস্থা যাদের জন্য তাদের জামাই-ষষ্ঠীর জামাইয়ের সঙ্গে ছাড়া আর কার সঙ্গে তুলনা করা চলে বলুন! আবার বোতাম টিপি—"কি চাই?" "কোট প্যাণ্টুলুন ইস্তিরি করার ব্যবস্থা করতে হবে"—"তথাস্তু"।

নীচের তলায় গেলাম দাড়ি কামাতে। সেলুনের কর্মী এক অদ্ভুত আরাম কেদারায় বসিয়ে হাতল ঘোরাতে লাগল। আমি ততক্ষণে প্রায় চিৎ হয়ে গেলাম। তারপর বহু কায়দা কানুন করে মহা আরাম দিয়ে দাড়ি কামাতে লাগল। একদিন দাড়ি কামাতে কামাতে আমি তো ঘুমিয়েই পড়লাম! চুল কাটলাম একদিন। মাথাটিকে কাৎ, সোজা, বাঁকা করে বৈদ্যুতিক যন্ত্র দিয়ে চুল ছাঁটল, তারপর ভেজা চুলগুলো যন্ত্রের সাহায্যে শুকনো করে দিল।

যাই হোক এবার কাজের কথায় আসছি। বসে গল্প করছি, শ্রীমতী পেরিন (সেক্রেটারী) এসে জানালেন ঠিক একটার সময় নীচের বড় হল-ঘরে জাপানী প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমাদের ভারতীয় প্রতিনিধিদের একত্র দ্বিপ্রহারিক ভোজানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যথা সময় যেন হাজির থাকি।

অনুষ্ঠান শুরু হল। খাওয়া দাওয়ার পর জাপানের বিখ্যাত অভিনেতা নাকামুরা বক্তৃতা করলেন, আমাদের দু'দেশের শান্তিপ্রিয় মানুষদের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হোক্ এই কামনা করে।

বিকালের অধিবেশন শুরু করেন বিখ্যাত তুর্কি কবি নাজিম হিকমৎ।

এই প্রসঙ্গে সম্মেলন-ভবনে বসেই লেখা তাঁর একটা কবিতা এখানে উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। কবিতাটি অনুবাদ করেছেন গীতিকার শ্রীঅরূপ ভট্টাচার্য। কবিতাটির নাম— "কপোত ও আটত্রিশটি তরুশাখা"।—

"আটত্রিশটি পতাকা রয়েছে একটি সভাগৃহে,
যেন মনে হয় একটি গাছের আটত্রিশটি শাখা।
এই আটত্রিশটি পতাকা-শাখার মধ্য থেকে
আনন্দে ডানা নাড়ছে শান্তির শ্বেত কপোত।
হে পিকিংএর শ্বেত কপোত,
মাতৃস্তন-দুগ্ধের চেয়েও শুভ্র
হে মোর শ্বেত কপোত,
তোমার নীড়-রচনার জন্যে
পিকিং দিয়েছে তার লাল পতাকার মধ্যে
তোমাকে সর্বোচ্চ স্থান।"

বিরামের পর অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি ভিক্টর জেমস্‌ জাপানী সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করেন। তারপর সমস্ত প্রতিনিধির বিশেষভাবে মনোযোগ দৃষ্টি আকর্ষণ করল যে-ঘটনা সেটি হ'ল—হলের পিছনের অংশ থেকে হঠাৎ বাদ্যযন্ত্রের গীতঝঙ্কার। চীনের গণতান্ত্রিক নারী সঙ্ঘের একদল মহিলা প্রতিনিধি হলের মধ্যে প্রবেশ করলেন। মঞ্চের উপর সভাপতিমণ্ডলীর প্রত্যেককে এক এক গুচ্ছ ফুলের তোড়া উপহার দিয়ে অভিনন্দন জানালেন। সমবেত প্রত্যেক প্রতিনিধি দাঁড়িয়ে ঘন ঘন করতালি দিয়ে প্রীতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতে লাগলেন। বিভিন্ন প্রতিনিধির বক্তৃতার পর ছ'টার সময় সেদিনকার মত সভার কাজ শেষ হয়।

রাত্রি আটটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া শেষ করে হোটেলের গাড়ী নিয়ে আমরা কয়েকজন রওনা হ'লাম—পে-হাই পার্কে।

পে-হাই পার্কে পূর্ণিমা

পে-হাই পার্ক (উত্তর হ্রদের উদ্যান) রাজপ্রাসাদের যাদুঘরের উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত। একটি বিরাট হ্রদের ধারে অতি মনোরম এই বিরাট উদ্যানটি। এই হ্রদ খনন ক'রে যে মাটি উঠেছে তা দিয়ে তৈরি হয়েছে ছোট ছোট কতকগুলি কৃত্রিম পাহাড়। এই সুন্দর উদ্যানটির ইতিহাস প্রায় ৮০০ বছরের। সম্রাটদের আনন্দ উপভোগের জন্য প্রায় ন' হাজার একর জমি ও জলাভূমি নিয়ে এই উদ্যানটি তৈরি হয়। ১৯২৫ সনের আগে পর্যন্ত এই পার্কটিতে জন-সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, অর্থাৎ এটা ছিল নিষিদ্ধ শহরেরই সমগোত্রীয়।

চিয়াং-এর আমলে সংস্কারের অভাবে উদ্যানটি পড়ে ছিল শ্রীহীন অবস্থায়, মানুষের ব্যবহারের অনুপযোগী হ'য়ে। তারপর পিকিং মুক্ত হবার পর পার্কটির আমূল সংস্কার করা হয়। নতুন করে হ্রদটি আবার খনন করে তার শত শত টন মাটি দিয়ে আরও কয়েকটি সুদৃশ্য কৃত্রিম পাহাড় তৈরি করা হয়। বর্তমানে শ্রমিক ও ছাত্রদের বিশ্রাম উপভোগের জন্য এটি একটি চমৎকার স্থানে পরিণত হয়েছে।

স্থানীয় পিপলস্ ইউনিভারসিটির অধ্যাপক চেন ছিলেন আমাদের সঙ্গে। অধ্যাপক চেনের সঙ্গে আমাদের ভারতীয় প্রতিনিধিদের দহরম মহরমটা যেন খুব বেশি বলেই মনে হ'ল। কিছুদিন আগে চীনা সাংস্কৃতিক মিশনের সঙ্গে তিনি এসেছিলেন ভারত ভ্রমণে। কিছুদিন কলকাতায়ও ছিলেন। শ্রদ্ধেয় পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর নিজের লেখা

একখানি উপন্যাস আমার হাতে দিয়েছিলেন চেনকে পৌঁছে দেবার জন্য। আমি অবশ্য পিকিং পৌঁছানর দু'একদিন পরেই তাঁর হাতে পৌঁছে দিয়েছিলাম সেটি। সেই সুবাদে খাতিরটা যেন আমার সঙ্গেই বেশি করে হয়েছিল।

অধ্যাপক চেন বিশেষ আগ্রহ করে কেন এই রাত্রে নিয়ে এলেন পে-হাই পার্কে তা বুঝলাম একটু পরেই। মর্মর-নির্মিত একটি সেতু পার হ'য়ে উদ্যানে প্রবেশ করেই দেখি ছেলে মেয়েরা, তরুণ তরুণীরা এমন কি বৃদ্ধ বৃদ্ধারা পর্যন্ত হ্রদের তীরে ভীড় করে আছে নৌকা বেড়াবার জন্য।

আজ পিকিংবাসীর "পূর্ণিমার দিন"; স্কুল কলেজের হোস্টেলের গেট দশটা পর্যন্ত খোলা থাকবে। ছেলে মেয়েরা আজ তাই দল বেঁধে পার্কে পার্কে মহোৎসব করে বেড়াবে।

নানাবিধ লতা ও বৃক্ষে সুসজ্জিত মনোরম এই প্রমোদ উদ্যান। এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে কত শত মর্মর-বেদী। সারা পার্ক জুড়ে মাতামাতি করছে ছেলে মেয়ের দল। একটি কৃত্রিম পাহাড়ের উপর গ্রামোফোন বাজাচ্ছে একদল তরুণ তরুণী। কেউ কেউ বাজাচ্ছে মাউথ অর্গান। কেউ কেউ বা পিয়ানো একর্ডিয়নের সঙ্গে তালে তালে নাচ গান করছে। পূর্ণিমা চাঁদের শুভ্র জ্যোৎস্না যেন স্নান করিয়ে দিচ্ছে ভ্রমণ-বিলাসীদের। একটু দূরে কতকগুলি রেস্তোরাঁ। তাতেও ভীড় জমেছে বিস্তর। হ্রদের মধ্যে ভাস্‌ছে কতকগুলি নৌকা। তার মধ্যে থেকেও শোনা যাচ্ছে কল-হাস্য গীত-বাদ্য। চিত্তাকর্ষক এই পরিবেশ সত্যই উপভোগ্য। পূর্ণিমা পূর্ণতারই অঙ্গীকার। সার্থক এই রাত্রি!......

এইবার আমরা একখানি প্রকাণ্ড নৌকায় উঠলাম। মন্থর গতিতে

নৌকা চলেছে। অধ্যাপক চেন আমাকে গান গাইতে অনুরোধ করলেন। আমি ধরলাম পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালী স্থর "অকূল দরিয়ার বুঝি কূল নাই রে"। আমার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্যান্য বন্ধুরাও যোগ দিলেন। এইবার আশে পাশের ছোট ছোট নৌকাগুলো আমাদের নৌকার খুব কাছে ঘেঁসে এল। আমাদের গান শুনে মোহিত হয়ে আসছিল একথা বলছি না। চীনের এই পুর্ণিমা সমারোহের ভাগীদার হ'ল কোন্ সে ভিন্‌দেশী অতিথিরা, হয়ত সেই কৌতূহলেই তারা আসছিল। একখানি নৌকায় কয়েকজন পিয়ানো একর্ডিয়ন বাজিয়ে গান গাইছিল এতক্ষণ, বিদেশী ভাষা ও স্থর শুনে তারাও ঘনিয়ে এলো আমাদের নৌকার পাশে। আমি তাদের তিন জনকে হাত ইশারা করে অনুরোধ করা মাত্র হুড় দাড় করে লাফিয়ে এলো আমাদের নৌকায়। আবার শুরু হ'ল আমাদের গান। এক চীনা তরুণ প্রাণপণ চেষ্টা করে চল্‌ল আমাদের কণ্ঠের সঙ্গে তার যন্ত্র মেলাতে।

ফুট্ ফুটে জ্যোৎস্নার মধ্যে এ যেন এক তরণী-বাহিনীর শোভাযাত্রা। স্থন্দর! অপূর্ব!! শতগুণ উৎসাহে আবার গান ধরি "নাও ছাড়িয়া দে—পাল উড়াইয়া দে, তর তরাইয়া চলুক্ রে নাও পদ্মানদী বাইয়া।" আশে পাশের নৌকা থেকে গানের তালে তালে করতালি ভেসে আস্‌তে লাগল। নৌকার বৈঠাগুলো পড়ছে তালে তালে—"তর তরাইয়া চলুক্ রে নাও পদ্মানদী বাইয়া।"

নৌকা ঘুরে এসে ঘাটে থামল। আমাদের এই অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানা দেখে পারের লোকজন অনেকেই এতক্ষণ বিস্ময়বোধ করছিল। আমরা পারে উঠতেই সব ঘিরে ধরল। অধ্যাপক চেন নিজ ভাষায় আমাদের পরিচয় জানালেন—"ভারত থেকে এসেছেন—শান্তি সম্মেলনের প্রতিনিধি হয়ে।" শোনা মাত্র করতালি ভেঙে পড়ল—

অভিনন্দনের পর অভিনন্দন। আর যেন শেষ হয় না। ছেলে বুড়ো সবাই হাত বাড়িয়ে দেয় করমর্দন করার জন্য। আমরা গান ধরি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আবার সেই সাঁকো পেরিয়ে গাড়ীতে না উঠ্‌ছি ততক্ষণ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে তরুণ তরুণীদের এক বিরাট মিছিল।

গাড়ী ছাড়তেই চীৎকার ওঠে শত শত কণ্ঠে—"হো পিং ওয়ান সোয়ে !"—"শান্তি দীর্ঘজীবী হোক্ !" পে-হাই পার্কে এরপরে আরও একদিন এসেছিলাম, সেদিনও মনোজদা, বৈদ্যনাথ বাবু, নীলিমা দেবী প্রভৃতি মিলে নৌকায় বেড়িয়েছি। কিন্তু শারদীয়া পূর্ণিমার সেই সরসী-বিহারের অপূর্ব স্মৃতি চিরদিনই আমার মনে ফিরে ফিরে আসবে কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে।

গাড়ীতে আসবার সময় তিয়েন এন-মেন স্কোয়ারে দেখলাম ঠিক পয়লা অক্টোবরের মতই তরুণ তরুণীরা তেমনি ভাবে নাচ গান করে চলেছে।—আবার সেখানে গিয়ে যোগ দিলাম। ধুতি পাঞ্জাবী শাল গায়ে বিদেশীকে নিয়ে মাতামাতির যেন আর অন্ত নেই। হৈ-হুল্লোড়, নাচ-গান করে হোটেলে ফিরলাম রাত্রি আড়াইটায়। শুয়ে শুয়ে ভাবলাম—কলকাতায় আজ কোজাগরী পূর্ণিমার "উৎসব"। পিকিং এর পূর্ণিমা উৎসবের কাছে তা তরুণী বিধবার শুভ্র পরিচ্ছদের মতই ম্লান বিমর্ষ।

"শুক্লকেশী তরুণী"

সেদিন ৪ঠা অক্টোবর। রাত্রি আটটায় গেলাম সুবিখ্যাত অপেরা "শুক্লকেশী তরুণী" ("হোয়াইট্ হেয়ার্ড গার্ল") দেখতে। এই বইখানি দেখেনি এমন লোক বর্তমান চীনে কেউ আছে কিনা সন্দেহ। বই

শেষ হবার পর আমরা কয়েকজন সাজঘরে গেলাম। সমস্ত শিল্পীরা করতালি দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। একে একে সকলের সঙ্গে পরিচিত হলাম। মুক্তি ফৌজের পোষাকে "তা চুনে"র ভূমিকায় ইউ তেও-নিংকে দেখে ডাঃ কিচলু তো বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

কৃষক কন্যা সিয়ার-এর উপর জমিদারের অত্যাচার, বিশেষ করে নিভৃতকক্ষে অসহায় অবস্থায় বল প্রয়োগের দৃশ্য এতই বাস্তব ও নির্মম হয়ে ফুটে উঠছিল যে দর্শকগণের মধ্যে অনেকে সত্যি সত্যিই ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েছিলেন। তারপর সিয়ার যখন গান গেয়ে তার অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করছিল, চোখের জল রোধ করা সত্যই অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। বইখানি দেখতে দেখতে তার অপূর্ব সংগীতের মধ্যে কতবারই না নিজেকে হারিয়ে ফেলছিলাম! গল্পটি হল এই :

চীনের একটি গ্রাম। কৃষকেরা জমিদারের খাজনা দিতে পারে না। গরীব ইয়াং অত্যাচারের ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। নববর্ষের উৎসব। সিয়ার বাড়ীতে খুব সামান্য ভোজের আয়োজন করেছে। এসেছে তা চুন। সিয়ারকে সে ভালবাসে। তা চুনের সংগে এসেছেন তা চুনের মা। জমিদারের ভয়ে সাতদিন পরে ইয়াং লুকিয়ে বাড়ীতে এলো। কিন্তু জমিদারের লোক টের পেয়ে তাকে নিয়ে গেল ধরে। জমিদার তাকে নিয়ে খাজনার বাবদ সিয়ারকে জামিনস্বরূপ জোর করে লিখিয়ে নিলেন। মনের ক্ষোভে ইয়াং আত্মহত্যা করল। জমিদারের গোমস্তা জোর করে সিয়ারকে নিয়ে এলো মালিকের বাড়ীতে। জমিদারের মায়ের দাসী নিযুক্ত হলো সিয়ার! জমিদারের গোমস্তা মাউজেচিনকে প্রহার করে তা চুন দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং শেষে পীতনদীর ওপারে গিয়ে লাল ফৌজে যোগদান করে। জমিদার লালসা

চরিতার্থ করবার জন্য একদিন জোর ক'রে সিয়ারের উপর পাশবিক অত্যাচার করে। সিয়ার জমিদার বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যায়—দাসী চ্যাং তাকে সাহায্য করে। সকলে জানে সিয়ার নদীতে ডুবে মরেছে। সিয়ার কিন্তু আত্মগোপন ক'রে থাকে এক পর্বত গুহায়। ক্রমে ক্রমে তার চুল সাদা হয়ে যায়। সে মাঝে মাঝে পাহাড়ের নীচে নেমে আসত। চাষীরা তাকে পরীভ্রম করত ব'লে ক্রমে রটে গেল "শুক্লকেশী এক ডাইনী" এসেছে পাহাড়ে। এমন সময় জাপানীদের পরাজিত করে লাল-ফৌজ ঐ অঞ্চল অধিকার করে নিল। তা চুন এল লাল-ফৌজের সেনাপতি হয়ে। জমিদারের লোক "শুক্লকেশী" ডাইনীর ভয় দেখিয়ে লাল-ফৌজের খাজনা মকুব অভিযান ব্যর্থ করে দিতে চাইল। তা চুন কিন্তু এই ডাইনীর কথা বিশ্বাস করে না। সে যায় পাহাড়ে। অবশেষে সিয়ারের সঙ্গে হ'ল তার মিলন। দেশের লোক সব জানতে পারল। জমিদারকে সকলের সামনে ধরে আনা হল। স্থানীয় গণ-আদালত করল তার বিচার। মুক্ত হল অত্যাচারিত জন-সাধারণ।

* * *

৫ই অক্টোবর। ব্রেকফাস্ট সেরে নিজের কামরায় এসে জানতে পারলাম হোটেলের নীচের অভ্যর্থনা-কক্ষে পিকিংএর সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা মি লান্ ফাঙ এবং তরুণ নাট্যকার সাও-ইয়েই অপেক্ষা করছেন আমার জন্য।

পিকিং অপেরা শিল্পী এই মি লান্-ফাঙ্এর সঙ্গে সম্মেলন ভবনে আলাপ হয়; নাট্যকার সাও-ইয়েই আলাপ করিয়ে দেন। এরা দু' জনেই প্রত্যহ দর্শক হিসাবে উপস্থিত থাকতেন। বিশ্রামের সময় প্রায়

প্রতিদিনই আমরা মিলতাম এবং আলাপ ও গল্প বেশ আন্তরিকতার সঙ্গেই চলত। তখন পর্যন্ত এই অভিনেতার সত্যিকার প্রতিভা সম্বন্ধে সম্যক্‌ভাবে পরিচয় লাভের সুযোগ হয়ে ওঠে নি। আমি অবশ্য তাঁর হাব-ভাব লক্ষ্য করতাম খুব মনোযোগ সহকারে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ। অতীব সুশ্রী তাঁর নাক মুখ। কথা বলেন বেশ ধীরে। বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে, একথা উনি নিজে যখন বলছিলেন আমি তো ঠাট্টা ভেবেছিলাম, পঁয়ত্রিশের উপরে বলে মনেই হবে না। সবচেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেছিলাম তাঁকে উনিশ কুড়ি বছরের তরুণীর ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখে।

দু'জনকে অভ্যর্থনা করে নিজের কামরায় নিয়ে এলাম। আমাদের দেশের শিল্পীদের সম্বন্ধে তিনি জানতে চাইলেন। বললাম বিশেষ করে তাদের আর্থিক দুরবস্থার কথা। ৫০।৬০ বছরের পুরানো রঙ্গমঞ্চ-গুলোর দরজা আজ কি করে বন্ধ হ'তে বসেছে তার কথা।

মি লান্‌-ফাঙ শুনতে শুনতে যেন ধৈর্যচ্যুত হলেন। আমায় বাধা দিয়ে বল্লেন—"এ তো" তুমি আমাদের দেশের কথাই বলছ—অর্থাৎ আমাদের দেশের মুক্ত হওয়ার আগেকার অবস্থার কথা।" তারপর তিনি শুরু করলেন তখনকার দিনের নাট্য-জগতের দুঃখ-দৈন্যের করুণ ইতিহাস। বাস্তবিক আমাদের দেশের বর্তমান দিনগুলোর সঙ্গে কি অদ্ভুত মিল!

পাক-ভারত প্রতিনিধিদের প্রীতিসম্মেলন

ঠিক সেদিনই পাকিস্তানের প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে আমাদের ভোজানুষ্ঠান শুরু হ'ল বেলা একটার সময়। ভোজ সভায় দু'পক্ষের প্রতিনিধিবৃন্দ একের পর এক যখন বক্তৃতা করতে লাগলেন, চোখের

জল রোধ করতে হয়েছিল বহুকষ্টে। একই ভাষা, একই সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী আমরা ভারত ও পাকিস্তানের মানুষ, কোনো এক স্বার্থপর শক্তি আমাদের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করেছে তা যেন নতুন করে সবাই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে। আমাদের মনোজদা বক্তৃতা করলেন আবেগময়ী ভাষায়। পাক প্রতিনিধিদলের নেতা পীর মানকি শরীফ, পুর্ববঙ্গ আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আতাওর রহমান, শিখ নেতা ত্রিলোক সিং প্রভৃতি বক্তার বক্তৃতা প্রত্যেকের মর্মে আলোড়ন তুল্‌ল। আমিও গান গাইবার সৌভাগ্য লাভ করলাম—

তুমি যে আমার বন্ধু
আমি যে তোমার বন্ধু
তুমি যে আমার বন্ধুরে……।
তোমার আমার মধ্যে হায়রে বাঁধল বালুর বাঁধ
সেই বাঁধ ভাঙ্গিব তুমি আমি কাঁধে দিয়ে কাঁধ।

* * *

তোমার আমার দু'দেশেরই লক্ষ মানুষ মরে
সেই সুযোগে দুশমন্ মোদের লুটের পাহাড় গড়ে।
ইত্যাদি…………

উপরোক্ত গানের ভাষা বা সুরের মধ্যে কোন অভিনবত্ব ছিল না বটে, কিন্তু সৃষ্টিতে আন্তরিকতার কার্পণ্য ছিল না। পরের দিন স্থানীয় দৈনিক কাগজগুলোতে আমাদের এই যুক্ত ভোজানুষ্ঠানের ঘটনাটিকে খবর হিসাবে খুবই গুরুত্ব দিয়েছিল। তার মধ্যে পিকিংএর শ্রেষ্ঠ চীনা ভাষার দৈনিক "পীপলস ডেইলীতে" আগাগোড়া গানটির অনুবাদ মুদ্রিত করে তাঁরা আমার উদ্দেশ্যকে সার্থক ও ধন্য করেছিলেন।

পরের দিন ঘটল বিশেষ এক ঘটনা। চেকোশ্লোভাকিয়ার স্থানীয় রাষ্ট্রদূত-অফিসের এস্‌বার্থ এমিল নামীয় এক যুবক কর্মীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল। তাঁদের জাতীয় দিবসের উৎসব উপলক্ষে রাত্রের কনসার্ট পার্টিতে যোগদান করবার জন্য আমাকে তিনি বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন।

চেকোশ্লোভাকিয়ার একদল শিল্পী ঠিক সেই সময়টায় একটি সাংস্কৃতিক মিশন নিয়ে সমস্ত চীন ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করবার জন্যই মাত্র দু'একদিন পূর্বে সব শিল্পীরা পিকিং এসে জমায়েত হয়েছেন।

যথাসময়ে বিরাট হলঘরটিতে উপস্থিত হলাম। বাদ্যযন্ত্রীদের জন্য যে প্ল্যাটফরম রয়েছে, সেখানে বসে প্রায় চল্লিশজন চেক্ সঙ্গীতজ্ঞ। অতি অপূর্ব সুরে বাজিয়ে চলেছেন ঐক্যতান যন্ত্রসঙ্গীত। তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম। মিঃ এস্‌বার্থ এসে আপ্যায়ন করে একটি টেবিলের সামনে এনে বসালেন। টেবিলে খাবার ও পানীয় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে।

নৃত্যগীত চলছে। তাদের জাতীয় সংগীত এবং লোক-নৃত্য খুব আনন্দের সঙ্গেই উপভোগ করতে লাগলাম। রাত্রি প্রায় দু'টোয় অনুষ্ঠান শেষ হবার পর আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বললাম —"চেক্ প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক"। আমাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরলেন এস্‌বার্থ, যার অর্থ হ'ল "তোমার আমার বন্ধুত্বও দীর্ঘজীবী হোক।"

বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে তাঁর একটি কথা আমার চিরদিন স্মরণ থাকবে: "চীনের বিস্ময়কর অগ্রগতি দেখে তুমি যেমন মুগ্ধ হয়েছ তার চাইতে কোনও অংশে কম মুগ্ধ হবে না আমাদের দেশের শান্তিপূর্ণ

পুনর্গঠন কাজ দেখবার সুযোগ পেলে।" হেসে জানালাম,—"সুযোগের প্রতীক্ষায় রইলাম।"

* * * *

পরেরদিন ঘুম থেকে উঠতে দেরি হ'ল। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। দিনের পর দিন তাপমান যন্ত্রের কাঁটা নীচের দিকেই নেমে চলেছে।

গলায় ঠাণ্ডা লেগেছে। খুক্ খুক্ করে দু'একবার কেশেছি, দোভাষী কুমারী চেন-ইয়েন্ ঘরে ঢুকলেন।

"তুমি কাশছ?"

"হ্যাঁ, একটু ঠাণ্ডা লেগেছে—তেমন কিছু নয়।"

ঘণ্টাখানেক পরে কুমারী চেন ইয়েন্ এক ডাক্তার ও নার্স নিয়ে হাজির।

"কি ব্যাপার?"

"তোমার যে কাশি হয়েছে!"

"কাশি! এমন কি কাশি যার জন্য ডাক্তার ও নার্স নিয়ে এলে?"

"ডাক্তার দেখান ভাল।"

"সামান্য কাশির জন্যই ডাক্তার, বল কি! একমাত্র যক্ষ্মা কাশি হলে না হয় ডাক্তার ডাকবার কথা ভাবতুম।"

যাই হোক ডাক্তার এবার পরীক্ষা শুরু করলেন গলা, বুক, পিঠ, কখনো কাৎ, কখনো চিৎ করে শুইয়ে।

ভাবছি ওরা কি সত্যিই যক্ষ্মা কাশি হয়েছে বলে ঠাউরিয়েছে নাকি? তা না হলে এমন অস্বাভাবিক ভাবেই বা পরীক্ষা করবেন কেন?

ডাক্তার এক প্রেস্ক্রিপসন্ লিখে দিলেন কুমারী চেন ইয়েনের হাতে। আরও বলে দিলেন একটি মাফ্লার সব সময় যেন গলায় জড়িয়ে রাখি।

"তোমার মাফলার নেই ?"

"র‍্যাপার তো আছে—তাই না হয় গলায় জড়িয়ে রাখছি।"

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর কুমারী চেন ইয়েন্ ঘরে প্রবেশ করলেন এক প্যাকেট ওষুধ, আর একটি চমৎকার উলের মাফ্লার নিয়ে।

অন্যান্য বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলতে লাগল—আগে বললে না কেন ভাই, তোমার মত না হয় আমরাও একটু খুক্ খুক্ করে কাশতাম।

ডাক্তার দেখিয়ে যেমন লাভ হোল একটি উলের মাফলার, তেমন লোকসানও হ'ল দেখছি কম না।

ডাক্তারের হুকুম মাফিক সারাদিন নজরবন্দী অবস্থায় থাকতে বাধ্য করলেন কুমারী চেন ইয়েন্। কড়া পাহারায় আছি—বিছানায় শুয়ে সময় কাটে না। কী-ই বা এমন অসুখ! যাই হোক্, হোটেলের মধ্যেই পায়চারি করছি। নীচের নাচঘরটি সম্পূর্ণ ফাঁকা পেয়ে পিয়ানোতে ঠুন্ ঠান্ করে নিজেই নিজের বাজনার তারিফ করতে লাগলাম।

*　　*　　*　　*

পাকিস্তানের শান্তি সংসদের জেনারেল সেক্রেটারী মুজিবর রহমান ও "যুগদাবী" কাগজের সম্পাদক মহম্মদ ইলিয়াস্ রাত্রে খাওয়ার পর কাজ না থাকলেই এসে হাজির হতেন আমাদের ঘরে। মনোজদাও থাকতেন। আমরা সবাই পূর্ববঙ্গীয়। রহস্যালাপ, গল্প, বেশ ভালই জমত। আমরা নিজেরা যখন কথাবার্তা বলতাম আমাদের কক্ষসাথী

শ্রীব্রিজরাজ কিশোর মুখের দিক চেয়ে থাকতেন হাঁ করে। সবই তার কাছে অবোধ্য। চীন, ইওরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিদের কাছে কন্‌ফারেন্স হলের মধ্যেও এমন বহু ঘটনা ঘটেছে যাতে আমাদের আন্তরিক মেলামেশা ও একই ভাষায় কথা বলতে দেখে ওঁরা আশ্চর্য হয়ে যেতেন। একদিন আমেরিকার প্রতিনিধি জিজ্ঞাসা করলেন, পাকিস্তানের লোকটির ভাষা আমরা বুঝতে পারি কিনা। একই ভাষা আমাদের মাতৃভাষা শুনে তিনি তো অবাক হয়ে গেলেন। আমরা বলি এইবার বোঝো, তোমাদের মুরুব্বিদের কাণ্ডকারখানা একবার!

এই প্রসঙ্গে মুজিবর রহমানের একটু পরিচয় দেওয়া অসঙ্গত হবে না। পূর্ববঙ্গের ভাষা-আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন এই মুজিবর সাহেব। জেলের মধ্যে চৌদ্দ দিন অনশন করে লীগ সরকারকে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করেছিলেন তিনি। লোকটি নির্ভীক, সদালাপী, দূরদর্শী এবং সমস্ত পৃথিবীর শান্তি-প্রিয় মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু।

৮ই অক্টোবর সকালের অধিবেশন শেষ হ'ল বারটায়। বিকালের অধিবেশন স্থগিত রাখা হ'য়েছে। সম্মেলনের কাজের সুবিধার জন্য এগারটি আলাদা আলাদা কমিশন তৈরি করা হয়েছে। আমি ছিলাম সাংস্কৃতিক কমিশনে। রাত ৯টায় কমিশনের বৈঠক বসবে। সুতরাং সেদিন বেশ কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের সুযোগ ঘটল। সেদিনকার সম্মেলনের সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিগণের শান্তির স্বপক্ষে এক যুক্ত ঘোষণা। আমাদের শ্রেষ্ঠ নেতা ডাঃ কিচলু ও পাকিস্তানের নেতা পীর মানকি শরীফ যখন আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন, ভারতের প্রত্যেক প্রতিনিধিদের যখন পাকিস্তানের

প্রতিনিধিরা বুকে জড়িয়ে ধরতে লাগলেন—সভাস্থ বিভিন্ন দেশের সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দ তখন ঘন ঘন করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন। তখনকার দৃশ্য বহু দর্শকের চোখে আনন্দাশ্রু এনেছিল।

* * * *

দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর, ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে চুপ চাপ একা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। মোটর গাড়ী চড়ে যেন হাঁপিয়ে গেছি। ছোট ভাই-বোনদের মত দোভাষীদের ব্যবস্থাধীনে আছি। আমরা রাস্তায় বেরুলে ওঁরা যেন আমাদের হারিয়ে যাবার ভয়েই অস্থির। তা না হলে পাঁচশ' ফিট যেতে হলেও একখানা গাড়ী এনে হাজির করবে কেন ?

যাই হোক, একা বেরিয়ে বাজারের দিকে গেলাম। বড় বড় দোকানগুলোর মধ্যে যেন লোকজন গিজ্ গিজ্ করছে। দোকানদারদের সঙ্গে মিছামিছি দর কষাকষি করা, খারাপ-ভাল নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করা—এসব কু-অভ্যাসগুলো তারা আজ বাতিল করে ফেলেছে। সমস্ত পিকিংএর বাজার বা পথের পাশে দোকানে, গভর্নমেণ্ট স্টোর্সে কিংবা ব্যক্তিগত মালিকের দোকানে—সর্বত্র দাম এক। আমাদের এখানকার মত মাল কিনে আপ্শোষ করতে হয় না।

এ প্রসঙ্গে হংকংএর কথা একটু না বলে পারছি না। এক একটা দোকান না যেন ডাকাতের আড্ডাখানা। পঁয়ষট্টি ডলার দাম হেঁকেছিল এমন একটি রিস্ট্ ওয়াচ্ কিনেছি একত্রিশ ডলারে। আরও কমে হতো কি না তাই বা কে জানে!

আগে চীন দেশেও প্রায় একই অবস্থা ছিল। বর্তমানে, কি ছোট, কি বড়, যে কোন দোকানদারই হোক, "আইয়ে, আইয়ে, সস্তা হো গিয়া" বলে চীৎকার করে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার বা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

সাজবার চেষ্টা করে না। এটা শুধু পিকিংয়েই নয়, ক্যাণ্টন, সাংহাই চীনের সর্বত্র।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, অতি আধুনিক কায়দায় সাজান-গোছান ছোট বড় দোকানগুলো নিয়ে বাজারটি অতি মনোরম শ্রী ধারণ করেছে। ছোট ছোট গলিতে নোংরা ত দূরের কথা, সিগারেটের একটি টুকরা পর্যন্ত দেখা যাবে না।

বাজারে লোক গিজ্ গিজ্ করলে কি হয়, বাঁ হাত দিয়ে বুক পকেট চেপে রাখতে হয় না পকেট সামলাবার জন্য। কলকাতার বাজারে, বাসে-ট্রামে বা রাস্তার ভীড়ে, ১৯৪৫ থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে এগারটি কলম পকেটমার বন্ধুদেরকে দিতে বাধ্য হয়েছি—যার এক একটির দাম ২॥০ টাকা থেকে ৬৫্ টাকা পর্যন্ত হবে।

সারা চীন দেশ থেকে আজ পকেটমার, চোর, ডাকাত, সিঁদ কাটা লোক সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে। আমার একথা শুনে হয়ত অনেকেই আশ্চর্য হবেন। চোর ডাকাতেরা গেল কোথায়? এর উত্তরে আমি বলব চোর ডাকাত কেন থাকবে? চোর চুরি করে অভাবে কিংবা স্বভাবে। বেকার সমস্যা সমাধান করে অভাব মেটান হয়েছে। আর স্বভাব পরিবর্তনও হয়েছে সত্যিকারের সর্বজনীন শিক্ষায়।

দোকানগুলোর শো কেসের দ্রব্য-সামগ্রী দেখতে দেখতে—একটি সিল্ক্ এবং কুটীর শিল্পের দোকানের সামনে এলাম। শো কেসের মধ্যে একটি এম্‌ব্রয়ডারী কাজ করা টেবল্‌ক্লথ খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছি—নিপুণ সূক্ষ্ম হাতের কারুকার্য। বৃদ্ধ দোকানদার বেরিয়ে এসে আমার বুকে শান্তি-কপোত আঁকা ডেলিগেট্ ব্যাজ দেখে আমাকে দোকানের মধ্যে গিয়ে বসবার জন্য বিশেষভাবে

অনুরোধ জানাতে লাগলেন। দোকানের মধ্যে গিয়ে বসলাম একটি সোফায়। বৃদ্ধ দোকানী ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে বা ইসারা ইঙ্গিতে বলতে লাগলেন যে তাঁর ছোট ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। তার চাইতেও বড় পরিচয় সে একজন কমিউনিস্ট পার্টির "প্রার্থী সভ্য", অর্থাৎ মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই সে এই সভ্য পদ লাভ করবে। সুতরাং তার সঙ্গে পরিচয় না করিয়ে দিয়ে আমাকে তিনি কিছুতেই ছাড়তে রাজী নন্। তার বড় ছেলেকে পাঠালেন। আশে পাশে নিশ্চয়ই কোথাও আছে, যেখান থেকেই হোক খুঁজে নিয়ে আসবার জন্য।

ছোট ছেলে তখন এই বাজারেরই মাংস বিক্রয়ের দোকানগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়ে বোঝাচ্ছিল--এই শান্তি-সম্মেলনের গুরুত্ব ও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের বক্তৃতার সার মর্ম।

একটু পরেই বড় ভাইএর সঙ্গে উনিশ কুড়ি বছরের এক তরুণ ঘরে প্রবেশ করল। কমিউনিস্ট পুত্রের গর্বে পিতার বক্ষ যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠল। পুত্রকে কি বলতেই সে এমন ভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরল যেন কিছুতেই আমাকে বক্ষালিঙ্গন থেকে মুক্তি দিতে নারাজ। বৃদ্ধ বাপ আশেপাশের দোকানীদের ডেকে আনতে লাগলেন—ভাবটা যেন, এই দেখ, আমাদের কি সৌভাগ্য, আমার দোকানে পদার্পণ করেছে এক বিদেশী শান্তি আন্দোলনের প্রতিনিধি!

তাঁদের আন্তরিকতায় আমি নিজেও এতক্ষণ অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। অবশেষে তাঁদের অনুরোধে গান ধরলাম—পঁচিশ বছর পূর্বে কাজী নজরুলের অনূদিত 'আন্তর্জাতিক' সঙ্গীত "জাগো অনশন বন্দী, জাগো সর্বহারা"।

ছেলেটি নিজের বুকের কাস্তে-হাতুড়ি-চিহ্নিত ব্যাজটি আমার বুকে এঁটে দিল, এবং অন্যান্য সবাই মিলে করতালি দিতে লাগলেন।

হোটেলে ফিরেই আমরা কয়েকজন আবার রওনা হলাম—পুরানো রাজপ্রাসাদের এক মহলে হাঙ্গেরীয় শিল্পকলার এক বিরাট প্রদর্শনী খোলা হয়েছে, তাই দেখতে।

আমরা যেতেই কয়েকজন হাঙ্গেরীয় কর্মচারী অভ্যর্থনা করলেন। সব ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। ভারী ভারী যন্ত্র—রেলওয়ে ইঞ্জিন, মোটর-কার, ট্র্যাক্টর থেকে শুরু করে নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী, রেডিও, সেলাই মেশিন, ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি পর্যন্ত কিভাবে তৈরি হচ্ছে তাদের দেশে, তার নমুনা বা মডেল্ রয়েছে প্রদর্শনীতে। নাৎসী কবল থেকে, চির-দাসত্ব থেকে, সোবিয়েৎ লাল-ফৌজ দিল হাঙ্গেরীর জনগণকে মুক্তি। দেশের মেহনতী মানুষের অতি প্রিয় নেতা রাকোসির নেতৃত্বে শুরু হল যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন কার্য। মাত্র সামান্য ক'বছরের মধ্যেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এসেছে এক যুগান্তর। শিল্পোৎপাদন যুদ্ধ-পূর্ব দিনের তুলনায় প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষা, বাসস্থান, কর্ম-সংস্থান, চিকিৎসা-ব্যবস্থা সব কিছুই আজ সাধারণ মানুষের করায়ত্ত। সমাজতন্ত্রী অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ফলে জনগণের জীবন-যাত্রার মান যুদ্ধ-পূর্ব সময় থেকে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বেড়ে গিয়েছে। এই প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে যথেষ্ট জ্ঞান লাভের সুযোগ পেলাম। চীনের অগ্রগতির সঙ্গে হাঙ্গেরীর তুলনা করা চলে না। চীন ছিল শিল্পের দিক থেকে পিছিয়ে পড়া দেশ, হাঙ্গেরী তা ছিল না। এই প্রদর্শনীটি হাঙ্গেরীর সাম্প্রতিক অগ্রগতির চিত্রটি আমার চোখের সামনে তুলে ধরল পরিষ্কার ক'রে।

হাঙ্গেরীয় কর্মীরা জানালেন তাঁরা আজ পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলিকে যন্ত্রপাতি দিয়ে বিনিময়-বাণিজ্য করবার জন্য উন্মুখ।

হাঙ্গেরীর কর্মচারী বন্ধুগণ আমাদের খুব সমাদর করে একটি ঘরে নিয়ে এলেন। দেখি ছোটখাট এক ভোজানুষ্ঠান। নিজেদের দেশের টিনের মাংস, স্যাণ্ডুইচ্, কফি, কেক্, চকলেট্ পানীয় সব কিছুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। খুব আপ্যায়ন করতে লাগলেন, কাজেই কিছু মুখে দিতে হল। ওঁরাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

অনুষ্ঠানের শেষে তাঁরা আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বিদায় দিলেন, আর দিলেন আসবার সময় সবাইকে এক একখানা বই উপহার।

* * *

৯ই অক্টোবর সম্মেলন শুরু হল সকাল ন'টায়। সেদিন দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অধিবেশন চল্ল। এগারটায় বিরাম ঘোষণা করা মাত্র কুমারী ওয়াং এসে জানালেন আমার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য দু'জন সংগীতবিদ্ পেছনের বিশ্রাম কক্ষে অপেক্ষা করছেন।

বাইরের মাঠের পশ্চিম দিকে আরও একটি প্রকাণ্ড বিশ্রাম-ঘর। সেখানেও বহু প্রতিনিধি এসে মিলতেন চায়ের টেবিলে।

ঘরে প্রবেশ করা মাত্র কুমারী ওয়াং পরিচয় করিয়ে দিলেন পিকিং ফিল্ম ষ্টুডিওর সঙ্গীত পরিচালক চু-চিয়েয়ার এবং গীতিকার ও সুরশিল্পী হো ফাঙ্য়ের সংগে। তাঁদের দুজনেরই বয়স বাইশ কি তেইশের মধ্যে।

পরবর্তী কালে এই শিল্পীদ্বয়ের সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলাম।

তোমার মহা মূল্যবান সময়ের খানিকটা নষ্ট করতে এলাম—বললেন কুমারী হো-ফাঙ্।

এখন তো বিশ্রামের সময়।—আমি উত্তর দিলাম।

—তা হলেও তুমি ক্লান্ত।

—মোটেই না।

—তোমার সুবিধে অনুযায়ী আমাদের অন্য একটা সময় দাও, যাতে বিশেষ ভাবে তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে পারি।

বিকালে কোন অধিবেশন না থাকায়, সেদিনই সাড়ে তিনটায় পিকিং হোটেলে আসতে অনুরোধ করলাম।

দেড়টায় সেদিনকার মত সম্মেলন শেষ হল। খাওয়াদাওয়ার পরে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

কখন যে সাড়ে তিনটা বেজে গেছে খেয়াল নেই। ঘুম ভাঙ্গালেন এসে অমিয় বাবু।

—"নীচের হলে আপনার জন্য দু'জন চীনা ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন।"

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি চারটে বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি উপরে আসবার জন্য খবর দিই।

ঘরে প্রবেশ করলেন চু-চিয়েয়ার এবং হো ফাঙ্। কুমারী সুইং-ইঞা-মিঁ সঙ্গে এলেন দোভাষীর কাজ করতে।

চু-চিয়েয়ার বললেন—ক'দিনই মনে করছি তোমার সঙ্গে দেখা করব, কিন্তু তোমার সম্মেলনের কাজে ব্যাঘাত ঘটতে পারে মনে করেই বিরক্ত করতে আসি নি।

আমি বললাম—তোমার দেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা শান্তি সম্মেলনে সাফল্য অর্জন করার মতই মূল্যবান, সুতরাং তোমাকে বিশেষ

ভাবে অনুরোধ করছি, সুযোগ সুবিধে পেলেই আমার সঙ্গে দেখা করে সে বিষয়ে সাহায্য করবে।

চু-চিয়েয়ার বললেন—তোমার যে কোন কাজে সাহায্য করতে পারলে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করব। হো ফাঙ্‌ বললেন—তোমাদের দেশের শিল্পীদের বর্তমান কার্যকলাপ সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ আমাদেরও কম নয়। জানতে চাইলেন—আমাদের দেশের শিল্পীরা সাধারণত কি ধরনের গান গাইতে পছন্দ করেন।

আমি বললাম—যদিও কিছু সংখ্যক রেকর্ড বা বেতার শিল্পী আধুনিক জগাখিচুড়ি সুরে রুচিহীন অর্থশূন্য সঙ্গীত গেয়ে থাকেন, তবু এ কথা বলা যেতে পারে যে, সুস্থ জাতীয় লোক-সঙ্গীত বা আমাদের ক্লাসিকাল সঙ্গীত শোনবার বা গাইবার লোকের সংখ্যা অতি আশ্চর্যজনক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমাদের দেশের শিল্পীরা শান্তি-আন্দোলন সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করেন জানতে চাইলে উত্তর দিলাম, অধিকাংশ শিল্পীই এই আন্দোলনকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন, যদিও আমাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা বা ত্রুটির জন্যই আমরা এখনও সমস্ত শিল্পীকে এই আন্দোলনের মধ্যে সার্থকভাবে জমায়েত করতে পারিনি। তথাপি একথা খুবই সত্য যে আমাদের দেশের যে কোন শিল্পীই আজ যুদ্ধকে ঘৃণা করেন এবং এই আন্দোলনের সাফল্য কামনা করেন।

বাক্যালাপের মধ্য দিয়ে ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হ'তে লাগলাম। আমাদের দেশের লোক সঙ্গীত শোনাবার জন্য বারবার অনুরোধ জানাতে গেয়ে শোনালাম আসমান সিং-এর জারী—

"কেয়ার খোল গো দুর্গামণি
তোমার পিতাজান আসছি আমি"

গান শোনা মাত্র সঙ্গে সঙ্গেই নিখুঁত ভাবে পাশ্চাত্য প্রথায় তাঁরা স্বরলিপি করতে লাগলেন। আশ্চর্য! কোন বাদ্যযন্ত্র ছাড়া মুখে মুখে স্বরলিপি করে যাচ্ছেন। অবশ্য পরে দেখেছি চীনের প্রত্যেক সঙ্গীতজ্ঞই পাশ্চাত্য স্বরলিপি-বিদ্যায় পারদর্শী।

এঁদের সঙ্গে বন্ধুত্বের ফলে আরও জানতে পারলাম, মুক্তির পূর্বে চীন দেশের সঙ্গীতও বিশেষ পিছিয়ে পড়েছিল। বেশির ভাগ পেশাদারী শিল্পীই এমন গান গাইতেন যা সাধারণ মানুষের মনে কোন সাড়া জাগাত না। শিল্পীদের সঙ্গে জনসাধারণের সঙ্গে কোন সত্যিকার যোগাযোগ ছিল না। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের এক বিরাট সংক্রমণ দেখা দিয়েছিল চীনের নিজস্ব সঙ্গীতের মধ্যে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গানের ভাষা ছিল নিতান্ত দুর্বল ও শালীনতা-বিরোধী। রেডিও ও রেকর্ড-জগতের অধিকাংশ শিল্পীই ছিলেন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তারা ক্লাসিকাল ও পল্লী সঙ্গীতকে দারুণ ভাবে হেয় জ্ঞান করতেন।

মুক্তির পর এই সব শিল্পী নতুন দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করলেন। ক্রমশ জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে থাকলেন ও তাদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে তাদের সঙ্গীতের পদ্ধতি পরিবর্তিত হতে লাগল। আজ চীনের অধিকাংশ শিল্পী তাদের পূর্বেকার অভ্যাসগুলিকে বাতিল করে দিয়ে জনসাধারণের অনুভূতি ও আবেগকে সঙ্গীতের মাধ্যমে রূপদান করছেন। এই দিক থেকে সুরকারদের চেয়েও বেশি সমস্যায় পড়তে হয়েছিল গীতিকারদের। তখনকার দিনে রেকর্ড, রেডিও বা শিল্পের মালিকদের চাহিদা অনুযায়ী তাদের গান রচনা করতে হ'ত। এই সব শিল্প সাধারণ মানুষের সঙ্গে ছিল সম্পর্কহীন। বিকৃত-রুচি, অবাস্তব,

অশ্লীল নৃত্যগীত পরিবেশন করাই তারা যুক্তিযুক্ত বলে ধরে নিত— মুনাফাশিকারের অসুস্থ লালসায়।

এই প্রসঙ্গে বলা চলে, আমাদের বর্তমান সময়ের সঙ্গে তাঁদের একটা হুবহু মিল লক্ষ্য করার মত। আমি নিজে ১৯৩৫ সন থেকে রেকর্ড ও রেডিও, বিশেষ করে রেকর্ড জগতের সঙ্গে এমন নিবিড়ভাবে যুক্ত যে এ-সম্বন্ধে আমার কিছু অভিজ্ঞতা স্বাভাবিকভাবেই হয়েছে। সুতরাং আমাদের বর্তমান সময় ও চীন দেশে মুক্তির পূর্বেকার সময়ের সঙ্গে এক অদ্ভুত মিল রয়েছে, একথা খুব জোর দিয়েই আমি বলতে পারি।

আমাদের অনেক শিল্পী-বন্ধুর মুখে শোনা যায় "আর্ট ফর আর্টস্ সেক" অর্থাৎ "শিল্প শুধু শিল্পের জন্যই।" একথা মোটেই সত্য নয়। শিল্প উদ্দেশ্য-বিহীন হলে জনসাধারণের সঙ্গে তার কোন সংযোগ থাকে না। তখনকার দিনের চীনা শিল্পীরা এই অদ্ভুত ধারণা পোষণ করতেন বলেই মুক্তির পর বেশ কিছুদিন বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে এগুতে হয়েছিল।

গায়কদের চেয়ে গীতিকারদের অসুবিধা হয়েছিল বেশি। সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটাবার মূলে যে সব গীতিকার ছিলেন তাদের গানগুলো গায়কেরা আয়ত্ত করে ফেল্‌তে লাগলেন—খুব তাড়াতাড়ি। যার জন্য আগেই বলেছি, গায়কদেব খুব বেশি অসুবিধায় পড়তে হয়নি যেমন হয়েছিল গীতিকারদের।

মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই চীন দেশের প্রতিটি মানুষের চেতনাতেই দৃষ্টিভঙ্গী ও রাজনৈতিক জ্ঞান এত দ্রুত পরিবর্তিত হ'তে লাগল, যার সঙ্গে তাল রেখে এগুতে গীতিকার ও শিল্পীদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। কিন্তু অসীম অধ্যবসায় ও অভিনিবেশ সহকারে জন-সাধারণের প্রতিটি আন্দোলন, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে

পরিচিত হয়ে তাদের জীবনকে সঙ্গীতের মাধ্যমে রূপায়িত করে, অধিকাংশ শিল্পীই আজ জনপ্রিয় শিল্পীতে পরিণত হয়েছেন।

বহুক্ষণ ধরে এঁদের সঙ্গে আলাপ করা গেল। বিদেশী বন্ধুদের আদর আপ্যায়নে মোটেই ত্রুটি করিনি, করার কথাও না। টেবিলের উপর বিভিন্ন রকম ফল-মূল সাজানই রয়েছে। সুইচ টিপতেই হাজির হলেন হোটেল পরিচালক। চা-কফি কেক্ স্যাণ্ডউইচ্ আসতে খুব সামান্য সময়েরই দরকার হল।

এ তো গেল অতি সামান্য খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার। এই ভাবে পিকিং সাংহাইতে যে কত শিল্পী, গীতিকার, নাট্যকারকে নেমন্তন্ন করে লাঞ্চ-ডিনার খাইয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। বিলগুলো আমাদের পরিশোধ করতে হয়নি এই যা রক্ষা। নিজের দেশ হ'লে কেরামতিটা বোঝা যেত! এই প্রসঙ্গে একদিন মনোজদা বলেছিলেন একটি চমৎকার কথা। খাওয়া দাওয়ার পরে আমরা যে সমস্ত বিল সই করে দিচ্ছি, দেশে ফেরবার সময় যদি সব বিল চুকিয়ে দেবার জন্য দাবি করে বসে তা'হলে আমাদের উপায় কি হবে!

যা হ'ক, শিল্পীরা সেদিনকার মত বিদায় গ্রহণ করলেন। দু' এক দিনের মধ্যেই আমার নিজের কণ্ঠের গান রেকর্ড করবার জন্য তৈরি হয়ে থাকতে বলে গেলেন তাঁরা।

পিকিং শান্তি সম্মেলনের সমাপ্তি-অধিবেশন

পিকিং, ১২ই অক্টোবর। রাত্রি ৯টায় শুরু হল এশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ১৬০ কোটি মানুষের প্রতিনিধিবৃন্দের বিরাট সম্মেলন এবং রাত্রি তিনটায় বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অধিবেশন শেষ হল। এগারদিনের দীর্ঘ অধিবেশন—এশিয়া,

অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ৪৬টি দেশের তরফ থেকে ৪২৯ জন প্রতিনিধি এসেছিলেন এ-সভায় যোগদান করতে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, শিল্পী, শিল্প-ও-সাহিত্য-রসিক, সমাজ-সেবী, পার্লামেণ্ট-সদস্য প্রভৃতি। তা ছাড়াও ছিলেন বিশেষভাবে আহূত গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স ও আলজেরিয়ার অতিথিবৃন্দ। এগার দিনের অধিবেশনে যে সব প্রতিনিধি, দর্শক বা অভ্যাগত বিবৃতি বা বক্তৃতা দিয়েছেন তাদের সংখ্যাও বড় কম নয়—সবশুদ্ধ ১০৯ জন হবে। সভা শুধু এঁদের বক্তৃতা বা বিবৃতিই শোনেনি, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করেছে এঁদের উত্থাপিত প্রতিটি সমস্যামূলক প্রশ্নের—গণতান্ত্রিক ভোটের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করেছে বিবিধ প্রস্তাব।

এগার দিনের অধিবেশনে গৃহীত হয় এগারটি প্রস্তাব। কোরিয়ার মুখ্য প্রতিনিধি হ্যান স্থল-যু উত্থাপন করেন কোরিয়া সম্বন্ধে প্রস্তাব। আমেরিকার লুই হুইটন পঞ্চশক্তি শান্তি-চুক্তি সম্পন্ন করার আন্দোলন শক্তিশালী করার প্রস্তাব আনেন।

কানাডার একজন প্রতিনিধি 'বিশ্ববাসীর প্রতি শান্তির আবেদন' সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ভারতীয় প্রতিনিধি ডাঃ আবদুল আলিম আনেন সাংস্কৃতিক ভাব-বিনিময়ের উপর প্রস্তাব। ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধি স্থরো-সো কর্তৃক সাংস্কৃতিক ভাব-বিনিময়ের উপর আরও প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। ভারতের প্রতিনিধি ডাঃ সৈফুদ্দিন কিচলু উত্থাপন করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আবেদনের প্রস্তাব। জাপ-প্রতিনিধি হাজির করেন জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নের উপর প্রস্তাব। পাকিস্তানের প্রতিনিধি শ্রীমতী তাহেরা মজহার মেয়েদের অধিকার ও শিশুকল্যাণের উপর প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

শান্তির জন্য জনগণের কংগ্রেস আহ্বানের প্রস্তাব এবং এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক শান্তি সংযোগ-রক্ষা কমিটি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে প্রস্তাবও উত্থাপন করা হয়।

প্রত্যেকেই অসীম আগ্রহের সঙ্গে প্রত্যেকটি ঘোষণা শুনতে লাগলেন, এবং একবাক্যে জানাতে লাগলেন প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে তাঁদের আন্তরিক সমর্থন। প্রত্যেকটি প্রস্তাব সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকেরা দীর্ঘ করতালি ও সোল্লাস অভিনন্দনে ভেঙে পড়তে লাগলেন।

তারপর আমাদের মুখ্য প্রতিনিধি ডাঃ কিচলু সমাপ্তি-অভিভাষণ দেবার সময় যে দৃশ্য ও পরিবেশ সৃষ্টি হ'ল তা শুধু অভূতপূর্বই নয়, অভাবনীয়ও বটে। চারিদিক থেকে সমর্থন ও মুহুর্মুহু আনন্দোল্লাসের আতিশয্যে মাঝে মাঝে তিনি বক্তৃতা বন্ধ করে অপেক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছিলেন।

সহসা হলের পেছন দিকের প্রশস্ত কক্ষের রুদ্ধ কবাটগুলো খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ফ্ল্যাশ লাইটের আলোগুলো সে দিকে ঘুরে গেল। দেখলাম অভূতপূর্ব দৃশ্য। ৩৩০ জন চীনা শিল্পী শস্তাকোভিচের আন্তর্জাতিক শান্তি-সঙ্গীতটি গাইতে লাগলেন। এইসব তরুণ শিল্পীরা গ্যালারির উপর তিনটি সারিতে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের ঠিক নীচে দু'পাশে ছিলেন অর্কেস্ট্রা ও ব্যাণ্ডবাদকদের দল।

সম্মিলিত কণ্ঠের বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাস ও সমবেত কণ্ঠের ঐক্যতান সঙ্গীত চল্‌তে থাকার মধ্যে গলায় লাল রুমাল-বাঁধা তরুণ অভিযাত্রী দল (ইয়ং পাইওনিয়র) ঝুড়ি ঝুড়ি ফুল নিয়ে লাফাতে লাফাতে হল ঘরে প্রবেশ করল।

ফুলের বৃষ্টিতে মঞ্চ ও সভাস্থল ভরে যায়। গম্ গম্ করে ওঠে

সভাকক্ষ সমবেত কণ্ঠের ধ্বনিতে—'হো পিং ওয়ান সোয়ে!' অর্থাৎ 'শান্তি দীর্ঘজীবী হোক্!' প্রতিনিধিরা যখন অনেকেই ছেলে মেয়েদের আলিঙ্গন করে কাঁধের উপর তুলে ধরতে লাগলেন; সে এক চিত্তাকর্ষক দৃশ্য।

আনুষ্ঠানিকভাবে সভা শেষ হ'লেও তার রেশ কিন্তু অনেকক্ষণ ধরেই চলতে থাকল। চলল জীবনের সেই অফুরন্ত বন্যা। চল্‌ল সমবেত কণ্ঠের শান্তি-সঙ্গীত। বেজে চলল দু'পাশের বাদ্যযন্ত্রগুলো। একশ' জন যন্ত্র-শিল্পীর ঐক্যতান সুর-ঝংকারে সৃষ্টি হয় সঙ্গীতের এক মহোৎসব।

আমি তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলাম অশ্রুতপূর্ব সঙ্গীত আর শান্তির জয়ধ্বনি। এই এগারদিন ধরে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বক্তারা শান্তির যে বাণী উচ্চারণ করেছেন তা যেন সুর হয়ে কানে বেজে উঠছে। এই অপূর্ব শান্তি-সঙ্গীত যেন অনন্ত কাল ধরেই ধ্বনিত হচ্ছে। আমি অভিভূত হ'য়ে গেলাম; সমস্ত মন দিয়ে কামনা করলাম এ সঙ্গীত যেন সারা পৃথিবীব মানুষকে আমারই মত অভিভূত করে, এ সঙ্গীত যেন শান্তির প্লাবনে ডুবিয়ে দেয় সারা দুনিয়াকে।

কখন যে আমার নিজের কণ্ঠ ওদের সুরের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছি, সে খেয়াল আমার নেই। ওদের গান থামবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি নিজে কখন যে গান ধরেছি "নও জোয়ান, নও জোয়ান,—বিশ্বে জেগেছে নও জোয়ান; কোটি প্রাণ, একই প্রাণ, একই স্বপ্নে মহীয়ান",--তাও খেয়াল করতে পারি নি। যন্ত্র-শিল্পীরা আমার সঙ্গে এসে সুর মিলিয়েছে, তারপর একে একে তিন শ' কণ্ঠ এসে মিলে যায় আমার কণ্ঠের সঙ্গে 'নও জোয়ান, নও জোয়ান—বিশ্বে জেগেছে নও জোয়ান।' বিহ্বল দর্শকমণ্ডলী তালে তাল দিয়ে করতালি দিচ্ছেন। ফ্ল্যাশ

লাইটগুলো আবার ঝলসে উঠল—এমন ঘটনা সকলেরই কল্পনাতীত। মুভিং ক্যামেরায় ছবি তুলে এ ঘটনাকে জীবন্ত ধরে রাখবার চেষ্টা করে চলেছেন আলোক-শিল্পীরা।

সঙ্গীতের মাধ্যমেই আমাদের প্রীতি-অভিনন্দন বিনিময় চলতে থাকে। সমবেত শিল্পীদের তরফ থেকে একজন মহিলা একটি ফুলের গুচ্ছ এনে আমার হাতে দিলেন।

আবার ফুল বৃষ্টি হ'তে লাগল। আমিও একটি বালকের ঝুড়ি থেকে মুঠো মুঠো ফুল নিয়ে শিল্পীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে লাগলাম। তারপর পরস্পরের করমর্দনে নিবিড় হ'লো পারস্পরিক সৌভ্রাত্র ও আন্তরিকতা।

জনসভা

১৩ই অক্টোবর ঘুম থেকে উঠলাম বেলা দশটায়। শান্তি সম্মেলন শেষ হ'য়ে গেছে। পরিপূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হ'য়েছে এই সম্মেলন। বিভিন্ন ভাষায় স্থানীয় দৈনিক কাগজগুলোতে বড় বড় শিরোনামা দিয়ে ছাপা হয়ে বেরিয়েছে শেষ অধিবেশনের বিস্তারিত খবর। সভা-শেষের কোরাস্ গান ও অর্কেস্ট্রার সঙ্গীত মাধুর্যে অভিভূত হ'য়ে আমি যে খেয়ালের বশে গান ধরে এক প্রকাণ্ড পাগলামো করে ফেলেছিলাম, কাগজগুলোতে দেখলাম সে কথাও খুব ফলাও করে ছেপেছে—অবশ্য বেশ প্রশংসাসূচক ভাষায়ই।

সম্মেলনের সুবিপুল সাফল্যের জন্যই সেদিন এক প্রকাশ্য জন-সভার ব্যবস্থা হয়েছে। পিকিংয়ের 'রাজ প্রাসাদের' মধ্যে পাথরে বাঁধান প্রকাণ্ড চত্বরে এই জনসমাবেশের আয়োজন।

পিকিং নগরীর দক্ষিণ ভাগের মাঝখানে এই রাজ প্রাসাদ। সাধারণ ভাবে বলা হয় 'নিষিদ্ধ শহর'। তিয়াত্তর হেক্টর জমি নিয়ে

এই বিরাট প্রাসাদ-নগরী, সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এবং তাকে ঘিরে রয়েছে একটি পরিখা। পিকিং-এর সাধারণ নাগরিকদের এলাকা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যই ১৪২০ সালের মধ্যে এই 'নিষিদ্ধ শহর' তৈরি করা হয়েছিল। মিঙ্‌ ও চিঙ্‌ এই দুই রাজ বংশের বিভিন্ন সম্রাট্‌গণ রাজত্ব চালাতেন এই 'নিষিদ্ধ শহর' থেকে। সম্রাটের পরিবারবর্গের লোকজনদের যাতে বাইরে না আসতে হয় তারজন্য দেয়াল-ঘেরা এই নিষিদ্ধ শহরের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য প্রাসাদ। ছাদ হলদে টালির, নানারঙের বিচিত্র তার দেওয়াল-গুলো। অজস্র প্রমোদ কানন, কৃত্রিম পাহাড়, ঝরণা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হ্রদ, পাথর-বাঁধান রাস্তা, রঙ্গমঞ্চ, ধর্মমন্দির, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের যাবতীয় ব্যবস্থা সবই বিদ্যমান।

'নিষিদ্ধ শহরে'র প্রবেশ পথগুলোতে রয়েছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফটক। ফটকের উপর তিন চার তলা করে এক একটি সুউচ্চ গম্বুজ। এই গম্বুজগুলো খুব পুরু কাঠ দিয়ে তৈরি। হলদে টালির ছাদ, নীচে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এক একটি হলঘর।

পুরাকালে রাজা রাজড়ারা যখন 'নিষিদ্ধ শহর' থেকে বাইরে বেরুতেন—গম্বুজের শীর্ষস্থিত অলিন্দ থেকে শাস্ত্রীরা ৮১ বার ঢাকের বাদ্য বাজিয়ে তা জানিয়ে দিত এবং তাঁদের ভিতরে প্রবেশ করার সময় ৪৯ বার ঢাক পিটিয়ে তারা রক্ষা করত রাজকীয় মর্যাদা।

অতীতকালের এই 'নিষিদ্ধ শহর' বা প্রাসাদগুলোর দ্বার আজ চীনের সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্যই রয়েছে উন্মুক্ত। প্রাসাদের লম্বা কামরাগুলো এখন যাদুঘরে পরিণত হয়েছে। আদি কালের চীনা মাটির বাসন, তামা ও ব্রোঞ্জ-মিশ্রিত বিভিন্ন ধাতুর বাসন, পাথরে খোদাই নানাপ্রকার বস্তু রয়েছে যাদুঘরে।

সম্রাটের আবাস, রাণীদের শয়নকক্ষ, বিলাস-প্রসাধন কক্ষ সবই আজ যাদুঘরে পরিণত। আমার মনে হয় চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ আর সর্ববৃহৎ যাদুঘরই হবে এই রাজপ্রাসাদ। দর্শনীয় জিনিসের প্রাচুর্য থাকায় যাদুঘর চারভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। সব জিনিসগুলো দেখতে বেশ কয়েক ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন হয়।

একদিকে রয়েছে সম্রাট-সম্রাজ্ঞীদের ব্যবহার্য মূল্যবান আসবাব-পত্র, বাসন-কোশন, পোষাক-পরিচ্ছদ, বিশ্রাম-কক্ষের বহু মূল্যবান্ দ্রব্যসম্ভার। আর একদিকে রয়েছে সম্রাটের বিচার সভা, সরকারী দলিল-পত্র, দপ্তর-খানার শীলমোহর ইত্যাদি। বিভিন্ন সময়ে সাম্রাজ্য-রক্ষার প্রয়োজনে যে সমস্ত বই বে-আইনী ক'রে রাখা হয়েছিল সেগুলো বহুযত্নে রক্ষিত হয়েছে।

অপর দিকে রয়েছে চীনের বহু প্রাচীনতম প্রাগৈতিহাসিক আবিষ্কার, মানবজাতির ক্রম-বিকাশের বহু নিদর্শন—প্রস্তরযুগের মানুষের ব্যবহৃত পাথরের অস্ত্রশস্ত্র, অগ্নি প্রজ্বালনের হাতিয়ার ইত্যাদি। এ ছাড়া সেকালের বই ছাপবার প্লেট, ইট, টালি ও ইস্পাত।

প্রাসাদের অন্দর বা বাইরের নিষিদ্ধ মহলগুলো, যেগুলো পরবর্তী কালে চিয়াং-এর কুওমিণ্টাং সৈন্যবাহিনীর উচ্চশ্রেণীর আমলা অধ্যক্ষদের প্রায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা মৌজ-স্ফূর্তির আড্ডা হিসাবে ব্যবহৃত হত, সেগুলো যে আজ চীন দেশের কৃষক শ্রমিক বুদ্ধিজীবী জনসাধারণের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হবে একথা ক'বছর আগে কে ভাবতে পারত?

দেড়টায় সভা শুরু হবে। পনের মিনিট আগে রওনা হলাম। ফটক পেরোতেই দেখি দু'পাশে ফুলের তোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে ইয়ং পাইওনিয়ারের দল 'হো পিং ওয়ান সোয়ে!' ('শান্তি দীর্ঘজীবী হোক!') বলে ধ্বনি দিচ্ছে।

প্রশস্ত পাথরে-বাঁধান চত্বরের ঠিক মাঝখানটা পথ হিসাবে খালি রেখে দু'পাশে জমায়েত হয়েছে পঞ্চাশ হাজার ছাত্র, মজুর, কারিগর, ঘরের মেয়েরা, পিকিংয়ের নানা পেশা ও সম্প্রদায়ের লোক। আমরা বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ যখন স্কোয়ারের মাঝখান দিয়ে এগুচ্ছিলাম, সমবেত জনতা উল্লাসে 'হো পিং ওয়ান সোয়ে' বলে চিৎকার করছিল। আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বের আন্তরিক আবহাওয়া বুক ভরে' নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে গ্রহণ করছিলাম। পথের দু'পাশের মানুষ হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন করমর্দনের জন্য—পেছনের লোকেরা সামনের সারিবদ্ধ জনতার মাথার উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। সকলেরই কি উৎসাহ, কি উদ্দীপনা! আমাদের হাত স্পর্শ করতে পারলে যেন তাঁরা ধন্য হ'য়ে যাবেন।

ওঁদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে চীৎকার ও হাত মিলিয়ে করমর্দন করতে করতে হাঁপিয়ে গেছি। এইবার সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম প্রতিনিধিদের জন্য নির্দিষ্ট আসনগুলির সামনে।

জনতার মধ্যে রয়েছে মুসলমান, বৌদ্ধ ও ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের লোক—নানা জাতির ও ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষেরা। বিরাট জনতার ঠিক মাঝখানটায় সাদা পোষাক সাদাটুপি পরা একদল ছাত্র ও শ্রমিক এমনভাবে সারি দিয়ে নিজেদের সাজিয়ে বসেছিল, উপর থেকে যা দেখলে চীনা ভাষায় ঠিক 'হো পিং' (অর্থাৎ 'শান্তি') এই দুটি অক্ষরের মত দেখায়।

বক্তৃতা মঞ্চের উপর থেকে সমস্ত স্কোয়ারটিকে যেন ফুল ও শুভ্র শান্তি-কপোতের সমুদ্র বলে মনে হচ্ছিল। প্রতিনিধিরা যখন নিজ নিজ আসনে গিয়ে উপবেশন করলেন তখন মুহুর্মুহু "শান্তি দীর্ঘজীবী হোক" ধ্বনি উঠতে লাগল।

চীনের শান্তি কমিটির পিকিং-শাখার সভাপতি অধ্যাপক চ্যাং মিহ্‌জো সভা উদ্বোধন করলেন। বিভিন্নদেশের প্রতিনিধির উল্লাস ও করতালিধ্বনির মধ্যে বক্তৃতা শেষ করতে লাগলেন।

পাকিস্তানের এক প্রতিনিধির কবিতা-আবৃত্তির পর এল আমার গান গাইবার পালা। নাম ঘোষণার পর মঞ্চে দাঁড়াতেই বিরাট করতালি ধ্বনি। আমি ধন্য হ'য়ে গেলাম; অসীম উৎসাহে ও ভাবাবেগে স্বুরু করলাম—

লহ ভারতের অভিনন্দন
হে বিজয়ী বীর, কমরেড মাও সে-তুঙ্ !
হোক চিরজীবী চীন-ভারতের
প্রীতি-বন্ধন।

* * *

মহান্ চীনের তুমি মুক্তিদাতা,
কোটি মানবের ভাগ্য-বিধাতা
ওগো শান্তির অগ্রদূত !
দাও শান্তি—দাও শক্তি,
থামুক আর্ত-পীড়িতের ক্রন্দন ;—
লহ অভিনন্দন !
ইত্যাদি

গান শেষ হতেই বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন চীনের শান্তি কমিটির সহ-সভাপতি কুয়ো মো-জো। ডাঃ কিচলুও নিজ আসন ছেড়ে উঠে আলিঙ্গন করলেন আমাকে। আমি সত্য সত্যই কৃতার্থ হলাম।
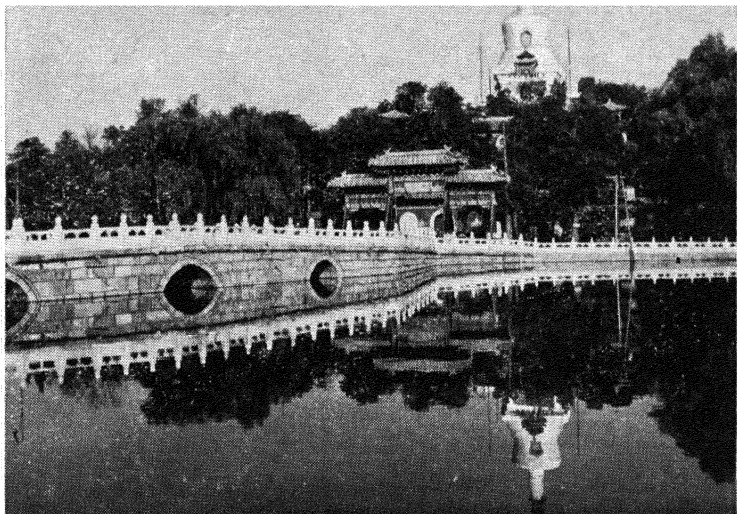
পে হাই পার্ক, পিকিং।

শান্তি সম্মেলনের মণ্ডপে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা ডাঃ সৈফুদ্দীন কিচলু পাকিস্তানের শান্তি-নেতা পীর মান্‌কি শরীফের সঙ্গে আলিঙ্গন ।বানময় করছেন।

সম্মেলন মণ্ডপের এক পাশে গান গাইছেন লেখক। সঙ্গে শ্রীশৈলেন পাল, সুসাহিত্যিক মনোজ বসু ও সুবোধ ব্যানার্জি, এম.এল.এ.
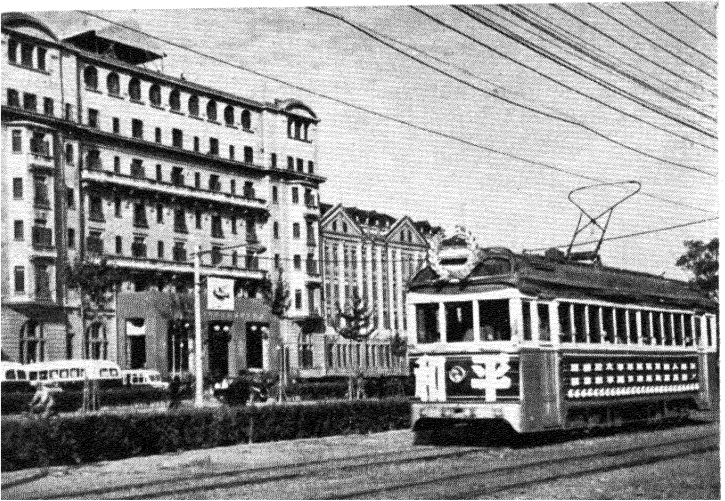
'শান্তি ট্রাম'—'হো পিং' অর্থাৎ শান্তির বাণী বহন করে চলেছে নয়া চীনের ট্রামগাড়ী। পাশে দেখা যাচ্ছে 'শান্তি হোটেল', যা নির্মাণ করতে মাত্র ৭৫ দিন সময় লেগেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় শান্তি সম্মেলনের প্রতিনিধি, দর্শক ও অতিথিবর্গের সম্মানার্থে এক ভোজানুষ্ঠান করলেন পিকিংয়ের মেয়র পেং চেন। ভোজ-সভায় উপস্থিত হবার পথেও অপরূপ সম্বর্ধনার অপূর্ব অভিজ্ঞতা। শত সহস্র বালক-বালিকা পথের দু'পাশ জুড়ে দাঁড়িয়ে তেমনিভাবে হর্ষধ্বনি করছে। ভোজ-সভা শুরু হয় পিকিং নগরের ডেপুটি মেয়র উ-হানের ভাষণ দিয়ে। তিনি বললেন—এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগর এলাকার শান্তি সম্মেলন বিপুল সাফল্য লাভ করেছে। এই জয় এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর এলাকার ১৬০ কোটি মানুষের। এই মহান জয় সারা পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষের জয়। আমি পিকিং-এর অধিবাসীদের তরফ থেকে এবং পিকিং নগরের লোকায়ত্ত সরকারের তরফ থেকে সমবেত মাননীয় অতিথিদের অভিনন্দন জানাই। তাঁদের এই মহৎ কার্যের জন্য—এই শান্তি সম্মেলন সাফল্য লাভ করার জন্য, আমরা সকলে একত্র হ'য়ে তাদের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

সারা হল জুড়ে গেলাসে ঠোকাঠুকির ঠুন্‌ঠান্‌ বেজে উঠ্‌ল। পূর্বেই বলেছি চীনদেশে কোন ভোজানুষ্ঠান মানে পৃথিবীর অধিকাংশ প্রিয় খাদ্যবস্তুগুলো আপনার টেবিলে এসে একে একে স্তূপীকৃত হওয়া। খাসী, হাঁস, মুরগীর বিভিন্ন প্রক্রিয়ার রান্না মাংস। আস্ত এক প্রকাণ্ড ভেটকী মাছ পাবেন একটি বিরাট প্লেটে। চিংড়ীমাছ চীনের মানুষদের অতি প্রিয় খাদ্য, তার পাবেন দু'তিন রকম রান্না। তারপর ডিম ও অন্য তরিতরকারি শাকপাতা মিলে আরও কয়েক ডজন ব্যঞ্জন।

পানীয়ও কত রকমের! বিয়ার, পোর্ট, হুইস্কি বা ব্র্যাণ্ডি টেবিলের উপর সাজানই থাকবে। জলের বদলে সোডা, লিমনেড, অরেঞ্জ-স্কোয়াশ ইত্যাদি। তারপরে ফল, কলা আপেল আঙ্গুর কমলা বাতাবী লেবু···কত চাই!

একে একে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি উঠে স্বাস্থ্য কামনা ক'রে পানীয় গ্রহণের প্রস্তাব করেন। প্রতিযোগিতায় হার মেনে অনেক অভ্যস্ত বীরপুঙ্গবও শেষ পর্যন্ত বিশেষ ধরনের পানীয় ছেড়ে গেলাসে লিমনেড ঢেলে চুমুক দিতে বাধ্য হন।

খাবার টেবিলে বিভিন্ন ভাষায় থেকে থেকে "শান্তি দীর্ঘজীবী হোক" বলে আওয়াজ উঠছে। কলম্বিয়া, চিলির ডেলিগেটবৃন্দ গেলাসে গেলাসে ঠুন ঠুন বাজনা বাজিয়ে তালে তাল দিয়ে শান্তির গান আরম্ভ করেন। তারপর প্রায় সব দেশের প্রতিনিধিরাই যে যার ভাষায় গান শুরু করলেন। টেবিল বা গেলাস বাজিয়ে নৃত্য হ'ল। সবাই নাচছে গাইছে—আমার মনে আছে টেবিলের উপর কতকগুলো মোমবাতি একত্র জ্বালিয়ে রাখবার একটি পাত্র মাথায় নিয়ে আমিও নৃত্য করেছিলাম।

খাওয়া শেষ করে বাইরের চত্বরে আবার নৃত্য গীত শুরু হ'ল। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি একত্র হাতে হাত মিলিয়ে বিরাট মালার মত হ'য়ে চক্রাকারে নৃত্য করেছে। কী অপূর্ব সৌভ্রাত্রমূলক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা আমার সাধ্যায়ত্ত নয়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

তারপর সেদিন রাত্র ৯টায় সমস্ত প্রতিনিধি ও অতিথির জন্য এক বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভোজানুষ্ঠানে নৃত্যগীত করে হাঁপিয়ে পড়েছিলাম। সেজন্যই সময় মত হাজির হতে একটু বিলম্ব ঘটল।

হলে প্রবেশ করে দেখলাম, এই মাত্র অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। তখন সমবেত সঙ্গীত হচ্ছিল: কুয়ো মো-জো রচিত ও লিয়াং হান

কোয়াং-এর সুর দেওয়া গান "শান্তির স্বপক্ষে ব্যক্তিদের প্রতি অভিনন্দন।"

এই সমবেত সঙ্গীতটি যে-সব শান্তি প্রতিনিধিরা হাজার হাজার মাইল দূর থেকে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের শান্তি ও স্বাধীনতা রক্ষার স্বার্থে শান্তি সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করবার জন্য পিকিংএ একত্র হয়েছেন, তাঁদেরই উদ্দেশে উৎসর্গ করা। এই সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই আমরা পিকিং এবং সমস্ত চীনবাসীর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন নতুন ক'রে জানলাম। এই সঙ্গীতটি জগতের সমস্ত শান্তিকামী লোকদের শান্তিরক্ষা করবার জন্য যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্যই আহ্বান জানাচ্ছে।

এরপর হয় আর একটি সঙ্গীত, আবদুল কায়েক রচিত "তো মাউ জে তু"।

এটা সভাপতি মাও সে-তুঙ্ এর প্রতি অভিনন্দনসূচক একটি সঙ্গীত। সঙ্গীতটি উপহার দেওয়া হয়েছে চীনের উঘার সম্প্রদায়ের লোকদের তরফ থেকে। সমস্ত চীনবাসীদের প্রতি মাও সে তুং-এর যে গভীর ভালোবাসা তা'ই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই গানখানিতে।

এরপর শুরু হল—চীনের আবালবৃদ্ধবনিতার অতি প্রিয় সঙ্গীত চাউ সে রচিত স্থ সি-সিয়েনের সুর সংযোজিত গানটি—

"সারা দুনিয়ার সব মানুষের একটি মাত্র মন।"

বিশ্বযুব শান্তি উৎসবের সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা-অনুষ্ঠানে এই গানটি দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করে। বিশ্ব শান্তি সংরক্ষণে চীনের জনগণের সুদৃঢ় বিশ্বাস এবং সেজন্য তাঁদের সংগ্রাম যে বিশ্বমানবের কল্যাণের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত এই বক্তব্যটি এখানে সার্থকভাবে

ভাষা পেয়েছে। এই সঙ্গীতের ভাবধারা ও গীতিভঙ্গিমা চীনের জাতীয় বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ।

তারপর গাইলেন বিখ্যাত শিল্পী ওয়াং কুয়াং একখানি একক সঙ্গীত—"তোল রুদ্ররোল, হে পীতাভ নদ!"

এই গানটি "দি ইয়েলো রিভার" নামক বিখ্যাত কবিতার অষ্টম ও শেষ পঙ্ক্তি। জাপ আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনা জনগণের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রামের কাহিনী এই গানটিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

এর পরে হল "ফসল ফলাবার গান"। উত্তর-পূর্ব চীনের একটি সহজ সুন্দর লোক-সঙ্গীত।

মার্কিন আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কোরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে নতুন চীনের কৃষক সমাজ অধিক ফসল ফলাবার জন্য কি রকম দ্বিগুণ উদ্দীপনা ও উৎসাহ নিয়ে কাজ করেছে এই গানটি তারই পরিচায়ক।

শুরু হল চীনদেশের একটি অতি উচ্চাঙ্গের ক্লাসিকাল নৃত্য—"না-চা"।

চীনের প্রাচীন উপাখ্যানে না-চা হচ্ছে একজন সাহসী যুবক। পৌরাণিক আখ্যান অনুযায়ী সমুদ্রের ড্র্যাগন-সম্রাট প্রত্যেক বৎসরই সমুদ্রের মধ্যে ভীষণ ঝটিকার সৃষ্টি করত। এই ভীষণ ঝড়কে প্রতিহত করার জন্য নির্ভীক না-চা একদিন সমুদ্রের তলদেশের স্ফটিক প্রাসাদে ঢুকে পড়ল। সেই প্রাসাদের মালিক ড্র্যাগন-সম্রাটের তৃতীয় কুমার, সেনাপতি ও সৈন্যের সঙ্গে তার যুদ্ধ হয়, এবং সেই যুদ্ধে এরা সকলেই না-চা'র কাছে পরাজিত হয়। সমুদ্রের তলদেশে সেই স্ফটিক প্রাসাদের মধ্যে না-চা'র যুদ্ধ এবং সমগ্র কাহিনীটি

হাবভাব, নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা হয়। নৃত্য-নাট্যটি ছোট হলেও খুবই উচ্চ শ্রেণীর ও আনন্দদায়ক।

এরপর হল একটি একক কণ্ঠ সঙ্গীত—"লাং হুয়া-হুয়া" অর্থাৎ "নীল ফুল"। এটি উত্তর শেনসি প্রদেশের একটি লোক সঙ্গীত। গেয়েছেন লিউ-ইয়েন-পিন্।

লাং-হুয়া-হুয়া হল একটি সুন্দরী তরুণীর নাম। একদিকে এই তরুণীর হৃদয়ের গোপন প্রেম আর অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় বিবাহ—এই সংঘাত-বিক্ষুব্ধ মনোভাবই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই গানে।

তিনি আরও একটি গান করেন—"ফুলের কথায় ফুলের জবাব"। এটি শেনসির একটি লোক-গীতি। শেনসি প্রদেশে যে মি-হু নাটকের প্রচলন আছে এই লোক-গীতিটি তার অন্তর্ভুক্ত। চীনদেশের চাষীদের মধ্যে বিশেষ এক ধরনের গান প্রচলিত আছে। এই গানগুলিতে একটি ফুলের কথার প্রতিবাদে আর একটি ফুল তার জবাব দিয়ে থাকে। এই লোক-গীতিটি তাদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এই লোক-গীতিটির মধ্যে চীনের কৃষক সমাজের অতি উচ্চস্তরের শিল্প-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

তারপর শুরু হয়—'সিল্ক নৃত্য'। নানা রঙ্‌বেরঙের সিল্ক নিয়ে নৃত্য করা চীনের অধিবাসীদের একটা পুরানো জাতীয় ঐতিহ্য। এই নৃত্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় তাদের জীবনের সুখশান্তি ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। মানুষ উড়ে যাচ্ছে, মেঘ ও রামধনুর রূপ পরিবর্তন হচ্ছে—সিল্ক নৃত্যের মধ্য দিয়ে এসব দেখান হয়। চীনের অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনের যে সংগ্রাম, প্রগতির পথে তাদের যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা, তাকে প্রকাশ করবার জন্য শিল্পীরা লম্বা লম্বা রঙ্‌বেরঙের সিল্কের কাপড় দিয়ে বিভিন্ন রকম কলা-কৌশল দেখিয়ে থাকেন।

এরপর দশ মিনিটের জন্য বিরতি ঘোষণা হল। অতিথিবৃন্দ প্রায় সকলেই এসে বিরাম-কক্ষে হাজির হলেন। অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু নিয়ে সকলের মুখেই প্রশংসা আর প্রশংসা। সত্য কথা বলতে কি, অনুষ্ঠানের এই একটি ঘণ্টা আমি নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিলাম।

তারপর আবার শুরু হল পঞ্চাশজন ইয়ং পাইওনীয়র ছেলেমেয়ের সমবেত সঙ্গীত সাহ্-ও-এর রচনা "আমরা গান করি আনন্দে।"

নতুন চীনের ভাবীকালের অগ্রণী যুবকেরা তাদের মাতৃভূমিকে, তাদের নেতাদের ও তাদের দলকে ('ইয়ং পাইওনীয়র') আন্তরিকভাবে ভালবাসে। এই গানের মাধ্যমে তারা তাদের প্রিয় নেতা ও সংগঠনের কাছে আন্তরিকভাবে এই অঙ্গীকার ঘোষণা করে যে তারা নতুন চীনের গঠনকার্যে ভবিষ্যতে তাদের সমস্ত শৌর্য ও বীর্যের পরিচয় দেবে।

পরবর্তী বিষয় কুয়াং হুয়া রচিত গীত "শান্তি পারাবত", একটি সমবেত সঙ্গীত। শ্রম ও শান্তির জন্য চীনের কিশোরদের উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষা গানে মুখর হয়ে উঠেছে।

এরপর আরম্ভ হল "সিংহ নৃত্য"। দক্ষিণ চীনে যে কোন জাতীয় উৎসব উপলক্ষ্যে এই জনপ্রিয় নৃত্যটি অনুষ্ঠিত হয়। একটি বিরাট সিংহ দু'টি সিংহ শাবকের সঙ্গে একটি সূচিকর্ম সমন্বিত বল নিয়ে খেলা করছে তারই নিখুঁত রূপ এই নৃত্যের মধ্য দিয়ে প্রদর্শন করা হয়।

অনুষ্ঠান দেখে অভিভূত হন নি এমন দর্শকের সংখ্যা খুবই কম। পরবর্তী বিশেষ অনুষ্ঠানটির জন্য সকলেই প্রতীক্ষা করে আছেন গভীর আগ্রহে। দেখলাম প্রায় সকলেই উৎকণ্ঠ হয়ে আছেন

চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ অপেরা অভিনেতা মি লান-ফাঙ্‌র অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য অর্জন করবেন বলে।

শুরু হ'ল—"মদ্যপানে কুইফির সান্ত্বনা"। চীনের অতি উচ্চাঙ্গ নৃত্য ও গীত সমন্বিত একটি পৌরাণিক নাটক। প্রায় শতাধিক বৎসর কিংবা আরও বেশিদিন ধরে এই নাটকটি চীনের বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অত্যধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে এসেছে। সামন্ততান্ত্রিক যুগে চীনের রাজপ্রাসাদে মেয়েদের বন্দীদশার রূপ প্রকাশ পেয়েছে। সম্রাট তাং মিং-হুয়াংএর রাণী ইয়াং কুই-ফি হলেন এই নাটকের প্রধানানায়িকা। পুষ্পোদ্যানে সম্রাটের সঙ্গে রাণীর কথাবার্তা হল পান-ভোজন ও আমোদ-প্রমোদে জন্য তাঁরা একটি রাত্রি উদ্‌যাপন করবেন। কিন্তু পরে জানা গেল যে ঐ নির্দিষ্ট সময়ে সম্রাট পশ্চিম প্রাসাদে উপপত্নী মে'র কাছে রয়েছেন। এ কথা জানতে পেরে রাণী ইয়াং কুই-ফি অত্যন্ত মর্মাহতা হলেন। সম্রাটের এরূপ ব্যবহারে রাণী ইয়াং কুই-ফি মদ্যপান ছাড়া অন্য কোন সান্ত্বনার পথ খুঁজে না পেয়ে, মদ্যপানই করতে শুরু করলেন। অবশেষে মাতাল হ'য়ে পড়ায় তাঁর খানিকটা সাহস বেড়ে গেল এবং এক খোজাকে আদেশ করলেন সম্রাটকে ডেকে নিয়ে আসবার জন্য। কিন্তু সম্রাটকে এই অবস্থায় বিরক্ত করলে চটে যাবেন এই ভয়ে সেই খোজা আদেশ মান্য করতে পারল না। বাধ্য হয়ে ভগ্ন-হৃদয়ে তাঁকে নিজ প্রাসাদে ফিরে আসতে হল।

রাণী ইয়াং কুই-ফি তার দলবল নিয়ে অন্দর মহল থেকে পুষ্পোদ্যানের দিকে চলেছে সম্রাটের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে—এইখান থেকে নাটিকাটির শুরু।

অঙ্গ-ভঙ্গিমার দ্বারাই প্রকাশ করা হচ্ছে—চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে সোনালী মাছের খেলা, আকাশে বুনো হাঁসের দল উড়ে চলেছে

এবং রাণী ও তার সঙ্গিনীরা পাত্র থেকে সুরা-পান করছেন—এ সবই দেখান হচ্ছে একটি কঠিন অথচ সাবলীল নৃত্য-ভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে।

রাণী ইয়াং কুই-ফির ভূমিকায় অভিনয় করলেন বিখ্যাত অভিনেতা মি লান্-ফাঙ্। এই শিল্পীর আন্তরিকতা ও মধুর ব্যবহারের পরিচয় আগেই পেয়েছিলাম, এবার পেলাম তাঁর অত্যাশ্চর্য অভিনয়-প্রতিভার পরিচয়, বিশেষ করে নারী চরিত্র অভিনয় করতে গিয়ে। চীনদেশে বহু ক্ষেত্রেই পুরুষেরা নারী চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কিন্তু মি লান্-ফাঙ্-এর দক্ষতা না দেখলে বিশ্বাস করা অসম্ভব।

তারপর দেখান হল আর একটি অপূর্ব নৃত্য-নাট্য—"চীন জনগণের মহান্ ঐক্য।"

চীনের প্রজাতন্ত্র একটি বিরাট পরিবার বিশেষ। সে পরিবারের মধ্যে চীনের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর লোকেরা মৈত্রী ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ। সামন্ততান্ত্রিক যুগে একই দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বৈষম্য বা তাদের মধ্যে যে পারস্পরিক বৈরিভাব বিদ্যমান ছিল তার আজ অবসান ঘটেছে। সভাপতি মাও সে-তুংএর নেতৃত্বাধীনে কেন্দ্রীয় গণ-সরকার এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি চীনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণকে পারস্পরিক মঙ্গল-সাধনের উদ্যমের মধ্য দিয়ে সুখ ও শান্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। এই বিষয়বস্তুটিই নৃত্যনাট্যের মধ্য দিয়ে দেখান হয়েছে এবং বিশেষভাবে রূপ পেয়েছে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠির ঐক্যের বিরাট জয়।

প্রথমে "রক্তুতারকা" নৃত্য শুরু করল সে দেশের সংখ্যা-গুরু সম্প্রদায়। তারপরে পর পর হতে লাগল তিব্বত দেশীয় নৃত্য, ইয়াওএর লোকনৃত্য, মঙ্গোলিয়ার নৃত্য এবং উঘার সম্প্রদায়ের 'বসন্ত' নৃত্য।

প্রত্যেকটি নৃত্যের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে বিভিন্ন জাতির লোক-সংস্কৃতি।······পট পরিবর্তন হল············দেখা গেল চীনের রাজধানী পিকিং-এর 'তিয়েন্ আন-মেন' স্কোয়ার অর্থাৎ শান্তির স্বর্গদ্বার, অপূর্ব রক্তিম আলোক মালায় উদ্ভাসিত।······তারপর বিভিন্ন জাতির বাদ্যযন্ত্রের সুর-সমন্বয়ে অভূতপূর্ব ঐক্যতান সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সমাপনী নৃত্য সুরু হল।

সমস্ত দেশের দর্শকদের সমবেত হর্ষোল্লাস ও পারস্পরিক সৌভ্রাত্র-মূলক হৃদয়-বিনিময়ের মধ্যে অনুষ্ঠানের যবনিকা নেমে এলো।

এই ব্যালে নৃত্যটি দেখে আমার বার বার মনে হয়েছে যে, এই ধরনের নৃত্য-নাট্য তৈরি করে যদি আমাদের দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দেখানো যেত, তা' হলে কোন ধুরন্ধরের পক্ষেই আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উস্কিয়ে তোলা সম্ভব হত না কোনদিন।

১৪ই অক্টোবর প্রাতরাশ সেরে আমরা প্রায় সকল প্রতিনিধিই একসঙ্গে গেলাম জীবাণু-যুদ্ধের সাক্ষ্যসমূহের প্রদর্শনী দেখতে। চীনা শান্তি কমিটি এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন।

মার্কিন সরকার জাপানী ও নাৎসীদের সাহায্যে যে এই বেআইনী জীবাণু-বোমা তৈরি করে চলছে, তার বহু নির্ভরযোগ্য দলিল রয়েছে এই প্রদর্শনীতে। উত্তর কোরিয়া এবং উত্তর-পুর্ব চীনের অধিবাসীদের উপর এই ধরনের অসংখ্য বোমা বর্ষণের বহু তথ্য-প্রমাণ রয়েছে। মার্কিন সরকারের এই অমানুষিক পাপকার্য সম্বন্ধে মার্কিন যুদ্ধবন্দীদের নিজেদের জবানবন্দীর কয়েকখানা কণ্ঠ-রেকর্ডও রয়েছে।

কোন সভ্য মানুষের পক্ষে একথা চিন্তা করাও কঠিন যে কোন ব্যক্তি বা কোন সরকার মশা-মাছির মাধ্যমে সুপরিকল্পিতভাবে প্লেগ, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মারাত্মক রোগের জীবাণু-ভর্তি বোমা সাধারণ নিরীহ

অধিবাসীদের উপর বেপরোয়া ভাবে বর্ষণ করতে পারে। আশ্চর্য হলেও এ ঘটনাগুলো যে কঠোর সত্য তা অবিশ্বাস করার কোন যুক্তিই পেলাম না।

ইস্পাতের তৈরি খোলের মধ্যে এই সব বীজাণু ভর্তি করে নিক্ষেপ করা হয়েছে ; সেই সমস্ত খোলের নমুনা এই প্রদর্শনীতে ছিল। কাঁচের বোতল বা শো-কেসের মধ্যে বহু জীবাণু-সংস্পৃষ্ট পোকা রয়েছে, সেগুলো কোরিয়ায় নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এই জীবাণুগুলো যাতে দেখতে পাওয়া যায় তার জন্য অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবস্থাও রয়েছে।

সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা যে তদন্ত কমিশন গঠিত হয়, তার রিপোর্টগুলি দেখলে যে-কোন সৎ ব্যক্তিই যে আমাদের সঙ্গে একমত হবেন একথা খুব জোর দিয়েই বলা চলে।

আমাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত, বিভিন্ন মতাবলম্বী লোক, এমনকি পার্লামেণ্টের কংগ্রেস-সদস্য ভূপালের ভূতপুর্ব প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত চতুর নারায়ণ মালবিয়া পর্যন্ত ছিলেন। বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী ত্রিলোক সিং, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক এন. আর. পাঠক, গান্ধীজীর প্রিয় শিষ্য মহারাজ রবিশঙ্কর ব্যাস প্রভৃতি সকলেই প্রদর্শনীর মন্তব্যের বইয়ে মার্কিন সরকারের এই পৈশাচিক কীর্তির বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়েছেন।

পিকিং-এর একটি স্কুলে

সেইদিনই বিকালের দিকে গেলাম স্থানীয় একটি স্কুল—"৮ নং 'মিডল স্কুল'—পরিদর্শন করতে। আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্য গেটেই দাঁড়িয়েছিলেন কয়েকজন শিক্ষক ও একদল ছাত্র। গেট্ থেকে

স্কুলের ভিতর পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে সব ছাত্ররা "শান্তি দীর্ঘজীবী হোক" বলে চীৎকার করতে লাগল। দু'পাশের ছাত্ররা হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে করমর্দন করার জন্য। সে এক অপূর্ব দৃশ্য!

স্কুলের বিশ্রামকক্ষে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। প্রধান শিক্ষক মহাশয় স্কুলের জন্ম থেকে অদ্যাবধি আনুপূর্বিক ইতিবৃত্ত বর্ণনা করলেন। স্কুলটি স্থাপিত হয়েছিল স্থানীয় কয়েকজন বিত্তবান্ প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিদের দ্বারা। ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব কায়েম করবার লড়াইয়ে এই নর-পুঙ্গবেরা স্কুলটির অবস্থা কাহিল করে এনেছিল। অবশ্য তখনকার দিনে, চিয়াং আমলে, শুধু দু'একটি স্কুলেই যে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছিল তা নয়, স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমেত সারা চীন দেশের সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্রই চরম দুর্নীতি, অব্যবস্থা ও স্বজনপ্রীতির পঙ্ককুণ্ডে পরিণত হয়েছিল।

পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেও ঠিক একই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম। আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে যে-রকম বহু কেলেঙ্কারী ও অপকীর্তির কথা শোনা যায়—যেমন কর্তৃপক্ষের স্বজন ও সুহৃদ্দের রচিত অতি বাজে বইও পাঠ্য তালিকায় স্থান দেওয়া, কিংবা ছাত্রবিশেষকে অস্বাভাবিকভাবে নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া, বা উচ্চপদগুলো যোগ্যতা না থাকলেও আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে বিতরণ করা ইত্যাদি—চীনের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে ঠিক একই অবস্থা বিদ্যমান ছিল, অবশ্য বিপ্লবের আগে।

সেখানেও প্রতি বছর বিরাট সংখ্যক ছাত্রকে ফেল করিয়ে কর্তৃপক্ষ নিজেরাই চেঁচামেচি শুরু করে দিত—গেল গেল, ছাত্ররা গোল্লায় গেল, কেবল রাজনীতি করে, পড়াশুনা মোটেই করে না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রাক্-বিপ্লব যুগে এই ছিল চীনের অবস্থা। কিন্তু বর্তমানে তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। উপরন্তু সারা চীন দেশের শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে—সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে। পরে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেবার ইচ্ছা রইল। কেবলমাত্র নিম্নোদ্ধৃত একটি বর্ণনার মধ্যে দিয়েই বোঝা যাবে শিক্ষা-বিস্তারে নয়াচীনের সরকারের কী প্রচণ্ড আগ্রহ! গত চার বছরে চীনের ছাত্রসংখ্যা কি বিপুল হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তা' নীচে দেওয়া হল:

	প্রাইমারী স্কুল ছাত্র সংখ্যা	মিডল স্কুল ছাত্র সংখ্যা	বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংখ্যা
১৯৪৯	২৪,৩৯১,০৩৩	১,২৭১,৩৪২	১৩০,০৫৮
১৯৫২	৪৯,০৩৪,০৮১	৩,০৭৮,৮২৬	২১৯,৭৫০

এ তো গেল ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির হিসাব। বিদ্যালয় বৃদ্ধির সংখ্যাও তেমনি আশ্চর্যজনক। প্রসঙ্গান্তরে সে কথা বলা যাবে। আপাতত আমাদের দেখা সেই মিডল স্কুলেই ফেরা যাক্।

স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ২৭০০ হবে। ২৭টি ক্লাসে তা বিভক্ত। সে দেশের শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের এখান থেকে স্বতন্ত্র, প্রথম পাঁচ বছর প্রাইমারী, পরে তিন বছর মিডল স্কুল, আরও তিন বছর সিনিয়র মিডল স্কুল, এবং তার পরে আরও ছ'বছর পড়ে গ্র্যাজুয়েট হতে হয়।

সেই স্কুলের শিক্ষক ও কর্মচারী মিলিয়ে মোট ৯৫ জন। প্রকাণ্ড এক লাইব্রেরী রয়েছে। একে একে ক্লাসগুলিতে গিয়ে দেখতে লাগলাম। আমরা ক্লাসরুমে ঢুকতেই ছেলেরা সব দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে আমাদের সম্বর্ধনা জানাতে লাগল। প্রতি ক্লাসেই দেখতে পেলাম মানচিত্র ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সাহায্যে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির ব্যবস্থা।

শিক্ষকগণ ছোট একটি টেবিলের উপর বই রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়াচ্ছেন, টেবিলের কাছে কোন চেয়ারই নেই।

মনে পড়ে যায়, ছোটবেলা আমাদের স্কুলের ইতিহাস ও ভূগোলের মাস্টার ভুবনেশ্বর বাবুর কথা। জীর্ণ ম্যাপটি টাঙ্গিয়েছেন ব্ল্যাক বোর্ডের উপর, পাতলা কাগজের তালি এঁটে দিয়েও ম্যাপটি ব্ল্যাক বোর্ডের কালো রঙ্ সম্পূর্ণ ঢাকতে পারেনি। বোম্বাই কিংবা পাঞ্জাবের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়ছে কাল বোর্ডটি।···মনে পড়ে যায় বৃদ্ধ পণ্ডিত মশাইয়ের কথা। একদিন হেডপণ্ডিত মশাই সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়াতে পড়াতে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘণ্টা পড়ার শব্দে ঘুম ভাঙতেই তিনি শশব্যস্তে উঠে পড়লেন। তাঁর ভাব দেখে কয়েকটা ছেলে হো হো ক'রে হেসে উঠলো। সে হাসির হররা মিলিয়ে যাবার আগেই ঢুকে পড়লেন ইতিহাসের শিক্ষক। ব্যাপারটা শুনে তিনি যা বলেছিলেন তা শুনে আমার মত অনেকেরই চোখে জল এসে পড়েছিল। তিনি বলেছিলেন, দেখ, হঠাৎ আমাদের তন্দ্রা এলে তোমরা হাসির খোরাক পাও, কিন্তু জান না কেন এমন অসময়ে তন্দ্রা ভেঙ্গে পড়ে দু'চোখে। সংসারের খরচ মেটাতে টিউশনি করতে হয় আমাদের সকলকেই। এই ধর আমার কথা, রাত্রে দুটো টিউশনি করি। ১১টায় পড়িয়ে দু'মাইল হেঁটে বাড়ি ফিরে খেয়ে দেয়ে ঘুমুতে ঘুমুতে হয় সাড়ে বারোটা কি একটা। আবার ঘুম থেকে উঠতে হয় সেই সাত সকালে, দেড় মাইল দূরে গিয়ে টিউশনি করার জন্য। স্কুলে যে মাইনে পাই তাতে সাত দিনেরও বেশি চলে না।—আবেগের মুখে কথাগুলো ব'লে ফেলে যেন খুব লজ্জিত হয়ে পড়লেন।······ যাঁদের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মানুষ করার দায়িত্ব, তাঁরা যদি থাকেন এমন দুরবস্থার মধ্যে তবে আমরা কি করে আশা করতে

পারি সত্যিকারের শিক্ষা! কে না জানে আমাদের দেশের শিক্ষকদের দুরবস্থার কথা! তবুও যে তাঁরা নিজেদের বুকের রক্তে শিক্ষার প্রদীপটুকু জ্বালিয়ে রাখছেন, সেজন্য তাঁরা নমস্য।

যাই হোক, সেখানেও কিন্তু এমনই দুরবস্থার মধ্যে দিয়ে শিক্ষকদের দিন কাটত, সেকথা প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের মুখেই শুনলাম। মাঝে মাঝে আবার শিক্ষকেরা ছাঁটাইও হতেন, যার জন্য বিভিন্নস্থানে, বিশেষ করে, সাংহাইতে শিক্ষকদের এক বিরাট ঐতিহাসিক ধর্মঘট হয়েছিল। কিন্তু নতুন চীনে শিক্ষকদের আর্থিক দুরবস্থা সম্পূর্ণ রূপে ঘুচিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে চীন সরকার সে দেশের কৃষক-শ্রমিকদের আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের অবস্থারও বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। প্রধান শিক্ষক মহাশয় জানালেন, দেশের শিক্ষাপদ্ধতি অল্প সময়ের মধ্যে কি করে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় শিক্ষকেরা আজ সেই কথাই ভাবছেন। শিক্ষকরা দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ করে থাকেন। তিন ঘণ্টা ছাত্রদের পড়িয়ে, বাকি পাঁচ ঘণ্টা নিজেরা অধ্যয়ন করে আয়ত্ত করে চলেছেন নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার রীতিনীতি, যাতে সেই ব্যবস্থাকে আরো উৎকর্ষের মধ্যে নিয়ে যাওয়া যায়।

চীন মুক্ত হবার কিছুদিনের মধ্যেই নতুন চীন সরকার এই স্কুলের কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি, স্কুলগৃহ, খেলাধূলার মাঠ প্রভৃতির উন্নতি-সাধনের জন্যই দিয়েছেন প্রায় বিশ হাজার টাকা। আগে যেখানে প্রতি বছর শত শত ছাত্র ফেল হত, আজ সেখানে খুব অল্প সংখ্যক ছাত্রই অকৃতকার্য হয়ে থাকে। ১৯৫৪ সন থেকে কোন ছাত্রেরই আর অকৃতকার্য হবার সম্ভাবনা থাকবে না—তার সম্পূর্ণ ব্যবস্থাই গ'ড়ে তোলা হয়েছে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এই যে, বর্তমানে যত ছাত্র এখানে রয়েছে তার অধিকাংশই শ্রমিক বা কৃষক শ্রেণীভুক্ত, যাদের পক্ষে আগে স্কুলের চৌকাঠ মাড়াবার সুযোগও ছিল না।

স্কুলের বার্ষিক বিবরণী থেকে দেখা যায়, শতকরা প্রায় চুয়ান্ন জন ছাত্রই আজ অতিশয় উচ্চ স্তরের। বাদবাকী সবাইকেও মোটামুটিভাবে ভাল ছাত্রদের মধ্যেই গণ্য করা যেতে পারে।

চীন মুক্ত হবার পর যে-নতুন শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে, তার ব্যবস্থাই এমন যে একান্ত অমনোযোগী ছাত্রও ক্রমে ক্রমে উৎসাহী হ'য়ে ওঠে।

নতুন শিক্ষাপদ্ধতিতে ছাত্রদের বেত্রাঘাত ও অন্যান্য শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ের সঙ্গে রয়েছে একটি ছাত্রাবাস। সাধারণত ছাত্ররা প্রায় সবাই এই হোস্টেলে বাস করে। অবশ্য হোস্টেলে বাস করা ছাত্রদের মধ্যে বাধ্যতামূলক নয়। ছাত্ররা নিজেদের বাড়ী থেকেও স্কুলে এসে লেখাপড়া শিখতে পারে।

স্কুলের বেতন নাম-মাত্র, অবশ্য যাদের বেতন দেবার সামর্থ্য নেই তাদের জন্য রয়েছে সম্পূর্ণ অবৈতনিক ব্যবস্থা।

হোস্টেল চার্জ সম্বন্ধেও একই ব্যবস্থা। অধিকাংশ ছাত্রই এসব দায় থেকে মুক্ত। যাদের ক্ষমতা আছে তাদের থাকা-খাওয়া, খেলা-ধূলার যাবতীয় খরচা বাবদ ধরা আছে ৭৫ হাজার ইয়ান অর্থাৎ আমাদের টাকায় ১৬৲ টাকার মত।

বিভিন্ন প্রকারের খেলাধূলা ব্যায়ামের বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। কয়েকজন ছেলে তখন নাচ ও গানের মাধ্যমে একপ্রকার ব্যায়াম করছিল। আমি তাদের দিকে এগিয়ে যাওয়ামাত্র ছেলের দল

এসে আমায় ঘিরে ধরল—গান গাইবার জন্য। আমি সানন্দে তাদের অনুরোধ রক্ষা করলাম। গান শেষ হবার অব্যবহিত পরেই একটি বার তের বছরের ছেলে ছুটে এসে তার নিজের হাতে পেন্সিলে আঁকা একটি শান্তি কপোতের ছবি আমায় উপহার দিল।

ছবিটি সযত্নে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে এসেছি, ছবিটির পাশে লেখা রয়েছে ছাত্রটির নিজের নাম—ইয়াং চিয়াং-চুং।

চীনের একটি গ্রাম—কাউবে-তিয়েন

১৬ই অক্টোবর সকালে রওনা হলাম পিকিংএর কিছুদূরে গ্রামাঞ্চল পরিদর্শন করতে। গাঁয়ের মধ্য দিয়ে চলেছি মোটরে। আঁকা বাঁকা অথচ খুব পরিচ্ছন্ন গেঁয়ো রাস্তা পেরিয়ে হাজির হলাম 'কাউবে-তিয়েন' নামক একটি গ্রামে। সেখানে পৌছানো মাত্র স্থানীয় 'কৃষক সমিতি'র সভাপতি কমরেড চো-ও, মহিলা সমিতির সভানেত্রী কমরেড চৌ-উ এবং গ্রামের মোড়ল গোছের একজন প্রবীণ ব্যক্তি ও একদল বালক বালিকা আমাদের অভ্যর্থনা করলেন।

এই গ্রামে বাস করে ৬৫৩টি পরিবার, মোট লোক-সংখ্যা হবে ৩০১২ জন। আবাদী জমির পরিমাণ হচ্ছে ৫৭৫৬ মাউ। মুক্তির পূর্বে মাত্র ২২ জন জমিদার বা জোতদারের অধিকারেই ছিল ২০৮৮ মাউ। আর বাদবাকি জমি ছিল গ্রামের ৬০০ ঘর অধিবাসীর হাতে।

বর্তমানে ভূমি সংস্কারের পর সমস্ত জমি চাষীদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকের (শিশুবৃদ্ধ নির্বিশেষে) মাথা পিছু দু'মাউ করে জমি ভাগে পড়েছে।

অনেকে হয়ত মনে করতে পারেন দু'মাউ জমিতে কিভাবে তারা সচ্ছলতার মধ্যে থাকছে? কিভাবে থাকছে বলতে গেলে প্রাক্‌বিপ্লব যুগের দু' একটা কথা এখানে বলা দরকার। তখনকার দিনে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল যাদের হাতে, তাদের সঙ্গে গ্রামের জমিদার বা জোতদারদের সঙ্গে ছিল এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। সুতরাং জমিদার শ্রেণী নিজেদের স্বার্থে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের দাবিকে সব সময়ই ধামাচাপা দিয়ে রাখত। চিয়াং সরকার বহু পূর্ব থেকেই ধীরে ধীরে দেউলিয়া হয়ে আসছিল, কাজে কাজেই এ দাবি মেটানোর চেয়ে জমিদারদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করত।

জমিদারেরা কোনদিনই জমির প্রতি যত্ন নিত না। সার, বীজ, জলের অভাবে জমির উর্বরা শক্তি ক্রমেই লোপ পেয়ে যেতে লাগল। তার ফলে চাষীদের অবস্থা এতই শোচনীয় হয়ে উঠেছিল যে ঘোড়া কিম্বা বলদের দানাপানি জোগাড় করা তাদের পক্ষে দুষ্কর হয়ে দাঁড়াল। পরের জমি চাষ করে যা কিছু পাওনা হ'ত জমিদারদের বকেয়া খাজনা ঋণ দিতেই নিঃশেষ হয়ে যেত।

আমাদের ভারতবর্ষের মতই এই মহাচীনে, অসংখ্য নদী উপনদী এবং অনিয়মিত বৃষ্টির উপর কৃষি ব্যবস্থা নির্ভর করত। কিন্তু বর্তমানে চীন দেশে মাত্র তিন বছরে সেচ ব্যবস্থার যে উন্নতি হয়েছে তা সারা জগতের বিস্ময়। সোবিয়েৎ ইউনিয়নে অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে বিভিন্ন পরিকল্পনা অনুযায়ী, নদী ও জলস্রোত-নিয়ন্ত্রণ, জল সংরক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদির ফলে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ছাড়াও জল বিদ্যুৎ উৎপাদন করে শিল্পের কাজে লাগান হচ্ছে। ষ্টিমার লঞ্চ ও মোটর বোট, পথের প্রসার ও উন্নতি সাধন করে যাতায়াত

এবং আমদানী-রপ্তানীর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। শুধু তাই নয়, মাত্র তিন বছরে প্রায় ৯ কোটি ১০ লক্ষ বিঘা জমিকে অজন্মা থেকে মুক্ত করা হয়েছে।

কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বেকারদেরও কাজ জুটেছে। গত তিন বছরে দু' কোটি লোক কেবল এ কাজের জন্যই নতুন ভাবে নিযুক্ত হয়েছে এবং তারা এত পরিমাণ মাটি কেটেছে যা নাকি দশটা পানামা এবং তেইশটা সুয়েজ খালের সমান হবে!

হুয়া ই, ইয়াংসী ও পীত নদীর তাণ্ডব দমন করা হয়েছে। পূর্ব-চীনে 'য়্যি' ও 'সু' এ দু'টি নদীর সঙ্গে সাগরের সঙ্গম সাধন করা হয়েছে, তা'ছাড়াও বহু শাখা ও উপনদীর সংস্কার সুসম্পন্ন হয়েছে, যার ফলে গত শতাধিক বছরেও যে-পথে বাষ্পীয় জলযান চলেনি, আজ সে-নদীর মধ্য দিয়ে স্টীমার লঞ্চ চলেছে নতুন নিশান আকাশে উড়িয়ে।

নিজ নিজ জমির মালিক হওয়ায়, সরকার থেকে সার ও বীজ পাওয়ায়, জল সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হওয়ায় চাষীরা শতগুণ উৎসাহে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য শ্রমের আনন্দে মেতে উঠেছে। আগে যেখানে এক মাউ জমিতে আমাদের ওজন অনুযায়ী ৬ মণ খাদ্য উৎপাদন হ'ত, আজ সেখানে ১৪।১৬ মণ পর্যন্ত উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। বর্তমান উৎপাদনের হিসেবে চীন দেশের পৌনে এক বিঘা জমি আমাদের দেশের তিন বিঘা জমির সমান বললে অত্যুক্তি হবে না।

চীন দেশের বহু স্থানেই আজ আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় যন্ত্রপাতির সাহায্যে যৌথভাবে চাষ হয়ে থাকে। যেখানে এখনও যৌথ প্রথা চালু হয়নি, সেখানে সরকার থেকে প্রয়োজন-অনুযায়ী

সাহায্য বা কৃষি ঋণের ব্যবস্থা আছে—যার জন্য কেবলমাত্র এই গ্রামেই ১৯৪২ সন থেকে ১৯৫২ সনে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে পৌনে তিন গুণ। সেই কারণেই এখানকার কৃষকরা আজ যে সচ্ছল হয়েছে নিজের চোখেই তা পরখ করবার সুযোগ পেলাম।

আমরা সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রথম গেলাম সেখানকার স্কুল বাড়ীতে। একটি আটচালার মত ঘর। সামনে একটি বিস্তৃত উঠান। মনে হয় কোন গ্রাম্য বিত্তবান লোকের বৈঠকখানা। ভিতরে আর একটি উঠান। বৈঠকখানার মত ঘরটি ছাড়া তিন দিকেই রয়েছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘর। তার মধ্যে ছেলেমেয়েদের ক্লাস নেওয়া হচ্ছে।

চীনের মুক্তি-লাভের আগে এটি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। ছাত্র সংখ্যাও ছিল নিতান্ত নগণ্য। বর্তমানে প্রাথমিকের সঙ্গে মাধ্যমিক মিলিয়ে এগারটি ক্লাস খোলা হয়েছে। ছাত্র সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৪৯ জন। স্কুলের শতকরা ৯২ ভাগ ছাত্র হচ্ছে কৃষক শ্রেণীর পরিবারভুক্ত, যাদের অভিভাবকেরা কোনদিন কল্পনায়ও আনতে পারেনি যে তারা তাদের সন্তান-সন্ততিদের লেখাপড়া শেখাতে পারবে।

গ্রামের মাতব্বর লোকেরা এসে হাজির হয়েছেন। পরিচয় বিনিময়ের পালা শেষ হল। পরে দেখলাম অবোধ্য ভাষায় সবাই যেন এক খুব গুরুত্বপুর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনায় মত্ত। শুনলাম আমাদের দ্বিপ্রাহরিক আহারের সুবন্দোবস্ত করার জন্য ওঁরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

বৈঠকখানার মত ঘরটির মধ্যে লম্বা টেবিলের দু'পাশে চেয়ার পেতে দেওয়া হয়েছে। টেবিলের উপর নানা রকম ফল, চীনা বাদাম ইত্যাদি রয়েছে। গ্লাশে গ্লাশে ঢেলে দেওয়া হয়েছে সবুজ চা।

আমরা এবার ছোট ছোট দলে আলাদা আলাদা বেরুলাম, গ্রামের সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করব বলে।

গ্রামের সাংস্কৃতিক জীবনধারা যে কী বিপুল ভাবে অগ্রগতি লাভ করেছে তার প্রমাণ পেলাম যখন সেখানকার 'সংস্কৃতি-ভবন' দেখতে গেলাম। মুক্তির পরে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্কৃতি-ভবনের তিনটি শাখা আছে। 'সংস্কৃতি-ভবনে'র লাইব্রেরীর পুস্তক-সংখ্যা হবে চার হাজার এবং দৈনিক গড়ে ৪০ জন পড়ুয়া রীতিমত ভাবে এখানে পড়াশুনা করে। নিরক্ষর লোকদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার এক বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে ৭০ বৎসরের একজন বৃদ্ধ পর্যন্ত এসে যোগদান করেছেন। মোটামুটি ভাবে তিন মাসের মধ্যে অক্ষর-পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় এই শিক্ষা-কেন্দ্র থেকে। তিনটি শাখা-কেন্দ্র মিলিয়ে সব শুদ্ধ পড়ুয়া হবে গড়ে দু'শ।

আর রয়েছে একটি নাট্য সঙ্ঘ। তাঁরা 'শুক্লকেশী তরুণীর' মত একটি কঠিন অপেরাও কুড়িবার অতি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করতে সক্ষম হয়েছেন।

চারটি সঙ্গীত কলা-সংস্থাও রয়েছে। সপ্তাহে একদিন করে গ্রাম্য লোকদের জন্য তাঁরা নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান করে থাকেন। অবশ্য উন্নততর জীবনযাত্রার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথের নিশানাই দেওয়া হয়ে থাকে এই সব নৃত্য গীত আনন্দ পরিবেশনের মধ্য দিয়ে।

আর রয়েছে একটি শিক্ষা-সংস্থা। ম্যাজিক লণ্ঠনের বক্তৃতা বা আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে ব্যাপকভাবে নিরক্ষরতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন এই সংস্থার কর্মীবৃন্দ।

'সংস্কৃতি ভবন' থেকে চলচ্চিত্র দেখাবার ব্যবস্থাও আছে। গ্রামের অধিবাসীদের দেখান হয় শহরের সেরা সেরা চলচ্চিত্রগুলি।

এই 'সংস্কৃতি ভবনের' আর একটি মহৎ কাজ হচ্ছে শান্তি সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের আগ্রহকে উত্তরোত্তর উদ্বুদ্ধ করা। গীত, বক্তৃতা, অপেরা, চলচ্চিত্র সবই ব্যবহার করা হচ্ছে এই উদ্দেশ্যে।

এই সাংস্কৃতিক কলা-কেন্দ্রটির কলেবর আরও বৃদ্ধি করা হচ্ছে দেখলাম। একদল ছুতোর মিস্ত্রী নিবিষ্ট মনে কাজ করে চলেছেন। প্রত্যেকটি বিভাগই যে আরও বিস্তার লাভ করবে সে কথা ওঁদের কাছে শুনলাম এবং কাজও চলছে দেখলাম।

মহলের পর মহল নিয়ে তৈরি একটি প্রকাণ্ড বাড়ীতে এই 'সংস্কৃতি-ভবন'। সব দেখে শুনে বাইরে এলাম। একটি মোটর চলতে পারে এমন একটি মাটির রাস্তা। রাস্তার ওপাশে একটি মাঠে বড় বড় ছেলেরা বাস্কেট বল খেলছে। খেলাধূলার যাবতীয় সাজসরঞ্জাম সবই সংস্কৃতি ভবন থেকে সরবরাহ করা হয়। চিয়াং-এর আমলে এ ধরনের আধুনিক খেলাধূলা চাষীদের ছেলেমেয়েরা জানতই না।

গ্রামের সাধারণ লোকেরা, বিশেষ করে চাষী গৃহিণীরা, তাঁদের স্ব স্ব গৃহাভ্যন্তর দেখবার জন্য অনুরোধ জানালে আমরা সানন্দে এই সুযোগ গ্রহণ করলাম। প্রতি গৃহ এমন কি অন্দরমহলের রান্নাঘরগুলো পর্যন্ত দেখে আমরা স্থির নিশ্চিত হলাম যে সত্যিই এঁরা আজ সচ্ছলতার মধ্যেই জীবন যাপন করছেন। নতুন নতুন আসবাবপত্র রয়েছে প্রায় প্রতি ঘরেই। সব বাড়ীই পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি।

ঐ গ্রামের জনৈক বৃদ্ধা মা কথাবার্তা-জিজ্ঞাসাবাদের সময় খুব গর্ব করে জানালেন, তাঁর ছেলে এখন কোরিয়ার রণাঙ্গনে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপৃত রয়েছে। গণ-স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর

সদস্য হয়ে পুত্র গেছে কোরিয়াতে—তার একখানা ফটো টাঙ্গান রয়েছে কাঠের দেয়ালের গায়, তা দেখাতেও ভুল করলেন না।

একজন ভূ-স্বামিনীর বাড়ী গেলাম। মহিলার নাম শ্রীমতী চৌ ইয়াং-সে। পূর্বে তিনি ১৬২ মাউ জমির অধিকারিণী ছিলেন। স্থানীয় 'কৃষক সমিতি' তার জন্য সাত মাউ জমি রেখে, বাদবাকি সব জমি বাজেয়াপ্ত করে অন্যান্য কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন। তিনি জানালেন কমিউনিস্ট পার্টি বা স্থানীয় কৃষক সমিতির এই বিলি ব্যবস্থার জন্য তিনি মোটেই ক্ষতিগ্রস্ত বা অসুখী হয়েছেন বলে মনে করেন না। ওঁরা তাঁর একমাত্র পুত্রকে নতুন ভাবে সুশিক্ষিত করে পিকিংএর এক কারখানায় চাকুরীর বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। তা ছাড়া তাঁর জমিতে বর্তমানে যে শস্য উৎপাদন হচ্ছে তাও তাঁর পক্ষে খুবই প্রচুর।

তারপর সেখান থেকে গেলাম স্থানীয় দাতব্য হাসপাতাল দেখতে। আগে চীন দেশে দু' একটি গ্রাম্য হাসপাতাল যে না ছিল এমন নয়। তা ছিল আমাদের গ্রামের ডাক্তারখানাটির মতই—ভাঙ্গা, কাচ-হীন আলমারীতে বোঝাই থাকত লাল নীল রঙের জল-ভর্তি বোতল। যার যে কোন রোগই হোক না কেন, ওষুধ মিলত কুইনাইন মিকশ্চার অথবা ক্যাস্টর অয়েল। 'কম্পাউণ্ডার' ছিলেন একজন— প্রাইভেট প্রাকটিস করতেন তিনি হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্র অনুযায়ী!

আমার মনে আছে একবার তাহের আলী নামে এক রুগী এল কম্পাউণ্ডার মশাইর কাছে (ডাক্তারবাবুর ভিজিট এক টাকা দেবার সামর্থ্য না থাকায় কম্পাউণ্ডারই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট)।
পাটচাষী তাহের আলী কাঁপতে কাঁপতে বলল, "কম্পাউণ্ডার বাবু, আমার ম্যালেরিয়া হইছে।" কম্পাউণ্ডার মশাই হোমিও শাস্ত্রের

অভিধান-তুল্য বইখানি হাতে নিলেন। কপালে ঠুকে সূচী দেখতে শুরু করলেন—ম্যালেরিয়া, ম্যালেরিয়া…এই এই ম্যালেরিয়া, ৩৭৭ পৃষ্ঠা, কাঁপিয়ে জ্বর হয় মাথা ধরে হাত পা বেদনা করে…ক্যালফস্ থার্টি।

তাহের আলী বলে—"বাবু, আপনি ত যে আসে তারেই ফস্ ফস্ দিচ্ছেন। এদিকে আমার যে সব ফস্ ফস্ কইরা শ্যাষ হইয়া গেল।"

কম্পাউণ্ডার মশাই ধমক দেন।—ভিজিট ও ওষুধ বাবদ দাবি করেন আট আনা।

হায়, আমার গ্রাম্য পাটচাষী তাহের আলী! তোমার কথা আজ কেন মনে পড়ে হাজার হাজার মাইল দূরের পরদেশী এক গ্রাম্য হাসপাতাল দেখতে এসে………।

১৯৪৪ সালে এই হাসপাতালের জন্ম—মাত্র দু'খানি ঘর নিয়ে। শত শত রোগী আসত। সব রকম ওষুধ না থাকায়, আসা না-আসা প্রায় সমানই হ'ত।

বর্তমানে এখানে ডাক্তার রয়েছেন তিনজন, তিনজন রয়েছেন তাঁদের সহকারী। চারজন রয়েছেন শিক্ষিতা নার্স।

হাসপাতালে বেড রয়েছে ২০টি। পূর্বে এখানে বেডের বালাই ছিল না। যে কোন রোগীই আসুক না কেন যা হ'ক একটা ওষুধ দিয়ে 'পত্রপাঠ' বিদায় দেওয়া হত।

বর্তমানে দেখলাম আধুনিক যন্ত্রপাতির কোন অভাব নেই। হাসপাতালের নিজস্ব একটি মোটর রয়েছে। রোগীদের আনা-নেওয়া, বিশেষ করে, শিশু বা সন্তান-সম্ভবা নারীদের জন্য মোটরটির ব্যবহার খুবই উল্লেখযোগ্য। গ্রামের প্রত্যেকটি লোকই এই হাসপাতালের ডাক্তারদের পরামর্শ বা ওষুধপথ্য ব্যবহারের সমান সুযোগ পেয়ে থাকেন।

একজন ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি মুক্তির আগেও এখানে চিকিৎসক হিসাবে ছিলেন। তাঁর মুখে শুনলাম মাত্র ক'বছর আগেও এ গ্রামে প্রতি বছরই বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন রকম সংক্রামক রোগ ব্যাপকভাবে দেখা দিত। ক্রোশের পর ক্রোশ খুঁজলেও একজন ডাক্তারও মিলত না। গ্রাম্য লোকদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিল যারা বড় রকম কোন অসুখ করলে দাওয়াই-এর পরিবর্তে শুধু ভগবানের কাছে মানত করেই খালাস হত। আমাদের দেশেও কলেরা-বসন্ত হ'লে একদল লোক শীতলা পুজো দিয়েই নিজেদের কার্য সমাধা করে থাকে। তারপরও যদি বিনা চিকিৎসায় রোগী মারা যায়, নিয়তির বিধান বলে নিজেদের সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া আর কিই বা করার আছে!

বর্তমানে সেখানকার গ্রামবাসীরা জমিদারদের খাজনা আদায়ের জুলুম থেকে যেমন অব্যাহতি লাভ করেছে, তেমনি সংক্রামক ব্যাধির হাত থেকেও রেহাই পেয়েছে। কোন পুকুর, ডোবা, নালা বা রাস্তার পাশে কোথাও নেই সামান্য নোংরা জঞ্জাল, নেই কচুরি-পানা বা ঐ জাতীয় কোন অস্বাস্থ্যকর লতা-গুল্ম-গাছ-গাছালি। মুক্ত হবার পর সারা চীনের কৃষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির ডাকে বিভিন্ন প্রদেশের কৃষক সমিতি শুরু করে এক বিরাট আন্দোলন—"অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম"। এই আন্দোলন ব্যাপকভাবে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তাই সমস্ত আবালবৃদ্ধবনিতার সমবেত ঐকান্তিক চেষ্টায় সারা চীন দেশের সহস্র বছরের আবর্জনা মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে সমূলে ধ্বংস করা সম্ভব হ'য়েছে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়ে। গ্রামের মধ্যেই 'সংস্কৃতি

ভবন' দেখে যখন রাস্তায় বেরিয়েছি, আমাদের মধ্যে একজন একটি কাগজের টুকরো দলা পাকিয়ে রাস্তায় ফেলেছিলেন। আমাদের ঠিক পিছনেই আসছিলেন একজন প্রৌঢ়া মহিলা। তিনি এটা লক্ষ্য করে কাগজের টুকরোটি নিজ হাতে তুলে নিয়ে একটু দূরে আবর্জনা ফেলার স্থানটিতে ফেলে দিলেন। কোন প্রকার সংক্রামক রোগ বা বীজাণু না ছড়াতে পারে তার জন্য রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রতিষেধক ব্যবস্থা। যার ফলে কোন সংক্রামক অসুখ হওয়া বর্তমানে একেবারেই অসম্ভব।

আমার এক বন্ধু কলকাতার কোন এক হাসপাতালের ডাক্তার। তিনি তো শুনে বিশ্বাস করতেই চাইলেন না যে, গত তিন বছরের মধ্যে সারা চীন দেশে একটি লোকও কলেরা কিম্বা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়নি। একথা বুঝতে হলে আগে জানতে হবে সেখানকার সরকারকে। সে সরকার সারা দেশের প্রতিটি মানুষের আস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত। সরকার যখন জনসাধারণের স্বার্থে কোন আবেদন ঘোষণা করে, সে আবেদনকে কার্যকরী করবার জন্য সারা দেশময় হুলুস্থুলু পড়ে যায়। কেনই বা হবে না! সে দেশের সরকারের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত নেতারা কখনো শিশুরাষ্ট্রের দোহাই পাড়েন না, কিম্বা 'বৃটিশরা দেশটা ঝাঁঝরা ঝাঁঝরা করে গেছে কাজেই আরও সময় দাও' ইত্যাদি আবোল তাবোল বিবৃতি দিয়ে বেড়ান না।

চীন সরকার ঘোষণা করলেন—'আমরা সারা দেশ থেকে সংক্রামক ব্যাধি নির্মূল করব বলে বদ্ধ-পরিকর। আমাদের পরিকল্পনা কার্যকরী করবার জন্য এখন থেকেই সকলে উদ্যোগী হোন।' তারপর সরকারের নেতৃত্বে শুরু হল সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ আন্দোলন।

আন্দোলন সফল করার দায়িত্বে অংশগ্রহণ করলেন কবি ও সাহিত্যেকেরা লেখনীর মাধ্যমে, শিল্পীরা নৃত্য গীত অপেরা ও চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে। অংশগ্রহণ করলেন সমস্ত শ্রেণীর নরনারী, আর বিভিন্ন সংগঠন, যার ফলে ১৯৫০ সালে বসন্তের টীকা নেয় ২১ কোটি ৬ লক্ষ লোক এবং ১৯৫২ সালে ৩০ কোটি লোকেরও কিছু বেশী। ১৯৫০ সালেই এই রোগ শতকরা ৯৬ ভাগ হ্রাস পায় এবং তার পর বৎসর থেকে একটি লোকও আর এই রোগে আক্রান্ত হয়নি। কলেরা-টাইফয়েড রোগও ঠিক একই পদ্ধতিতে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে।

হাসপাতাল দেখে গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হ'াটতে এগুচ্ছি, হঠাৎ লক্ষ্য করলাম বাঁ দিকের একটি বাড়ীর দিকে, অর্ধেক বন্ধ করা কাঠের গেটের ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি পড়ল ভিতরের উঠোনের দিকে। একদল লোক গোল হয়ে ঘিরে বসে কি যেন করছে। কৌতূহল মেটাবার প্রবল বাসনা হল। কাঠের গেটের একদিক খুলে ভিতরে গেলাম। ও হরি! এযে পাঠশালা—স্লেট, পেন্সিল হাতে সব পড়ুয়ারা। কিন্তু এ কেমন ধারা পাঠশালারে মশাই! পড়ুয়ারা যে দেখছি সব রামখোকা অর্থাৎ বয়স্ক যুবক—দু'একজন প্রৌঢ় ব্যক্তিও রয়েছেন তাদের মধ্যে। ব্যাপারটা বুঝলাম পরে। মুক্তি ফৌজের লোকজন এঁরা—ফৌজের নিরক্ষর লোকজন। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই; অধ্যয়ন করে চলেছেন নিবিষ্ট মনে।

ঘুরে ফিরে হাজির হলাম আগের সেই স্কুলে। এতক্ষণে আমাদের জন্য রান্নাবান্না শেষ করে গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিরা অপেক্ষা করছেন এক সঙ্গে ভোজ করবেন বলে। টেবিলগুলো ঘিরে সবাই বসলাম

এক সঙ্গে। এই অল্প সময়ের মধ্যে মাছ, ডিম, মাংসের কত রকম রান্নাই না করছেন আমাদের জন্য!

খাওয়া দাওয়া গল্প বিশ্রাম করতে করতে বেলা পড়ে এলো। স্কুলের সম্মুখ প্রাঙ্গণে একদল ছেলেমেয়ে সমস্তক্ষণ বসেছিল।

কিছুক্ষণ পরে ওরা গানবাজনা শুরু করল। আমরা ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছি। হাত ধরে টানাটানি করাতে আমাদের সুবোধ বানার্জী (এম, এল, এ), শৈলেন পাল, শ্রীমতী মেহ্‌তা এবং শ্রীমতী পেরিন প্রভৃতি অনেকেই ওদের সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য হলেন।

ওদের ছেড়ে আসবার সময় মনটা খারাপই লাগছিল। বালক বালিকা যুবক যুবতী বৃদ্ধ বৃদ্ধা উপস্থিত সকলের সঙ্গে করমর্দন আর কোলাকুলি সেরে রাস্তায় বেরোলাম। দেখছি গ্রামের প্রায় সব অধিবাসী বহুদূর অবধি রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে "হো পিং ওয়ান্ সোয়ে" বলে চীৎকার করে বিদায় অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

আমরা মোটরে গিয়ে উঠলাম। গাড়ী খুব আস্তে আস্তে চলছে। দু'পাশের ছেলেমেয়েরা করতালি দিয়ে চলছে। হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে করমর্দন করার জন্য। আমরাও জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি। চলার মধ্যেও যদি আমাদের কারও হাতখানা তাদের সঙ্গে ছোঁয়া লেগে যায়; এক জনের হাতের উপরেই রয়েছে আর এক জনের হাত। আমাদের হাতের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে প্রত্যেকের হাত না লাগলে কি হয়, ছোঁয়া তো রয়েছে!

এমনি ভাবে গ্রামের শেষ সীমানা অবধি রাস্তার দু'পাশে রয়েছে ছেলেমেয়ের সারি। মাথার উপর হাত নাচিয়ে জানাচ্ছে বিদায় সম্বর্ধনা। ওদের ছেড়ে আসতে সত্যই কতখানি মর্মবেদনা অনুভব করেছি, তা এখন বোঝাই কি করে!

আমাদের বিচিত্রানুষ্ঠান

১৭ই অক্টোবর। আমার পক্ষে আর একটি স্মরণীয় দিন। বিভিন্ন দেশ থেকে যে সব প্রতিনিধি, দর্শক বা অতিথি উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সঙ্গীত বা নৃত্য-শিল্পী যাঁরা ছিলেন তাঁদের নিয়ে এবং চীন দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পীকে নিয়ে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। এই অনুষ্ঠান পরিচালনার ভার পড়ল চিলির বিশিষ্ট এক প্রতিনিধি অধ্যাপক মার্টিন এবং আমার উপর।

নিজেদের দেশে ছোট খাট দু'একটা অনুষ্ঠান চালিয়েছি। পার্ক-সার্কাস ময়দান, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বা মহম্মদ আলী পার্কের মত দু'একটি স্থানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনার মধ্যে অনেকবারই অংশ গ্রহণ করেছি, এ আর এমন কি বিচিত্র! কিন্তু হাজার হাজার মাইল দূরে ৪৬টি দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতির অপরূপ বিচিত্রানুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে অংশ পেয়ে সেদিন কি খুশিই না হয়েছিলাম!

আমি এবং অধ্যাপক মার্টিন মহা ব্যস্ত। আমাদের সাহায্য করবার জন্য রয়েছেন চীনের বিখ্যাত নাট্যকার সাও-ইয়েই। তিনি অবশ্য আমাদের চেয়েও ব্যস্ত ছিলেন, কারণ প্রকৃতপক্ষে তিনিই প্রায় সব কাজ করেছেন। ঘন ঘন টেলিফোন আসছে। আমাদের হোটেলে যে সব শিল্পী বা অভিনেতা রয়েছেন তাঁরা এসে আমার কাছে প্রোগ্রামের ফিরিস্তি দিতে লাগলেন। আবার ঠিক তেমনি, 'শান্তি হোটেলে' যাঁরা রয়েছেন তাঁরা মার্টিনের কাছে গিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

অবশ্য কি ভাবে এই অনুষ্ঠান চলবে, কাকে কতক্ষণ প্রোগ্রাম দেওয়া যেতে পারে, তা নিয়ে আমরা তিনজন কয়েকদিন আগে থেকেই

আলোচনা শুরু করেছিলাম। ভারত, পাকিস্তান, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, বার্মা, সিংহল, ভিয়েৎনাম, কোরিয়া, জাপান, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের প্রোগ্রাম তৈরি করলাম আমি এবং অধ্যাপক মার্টিন করলেন চিলি, কলম্বিয়া, মেক্সিকো, কোস্টারিকা, ক্যানাডা, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের। চীনের নাট্যকার সাও-ইয়েই'র উপর দেওয়া হয়েছে চীনের ভার। চীনা নাট্যকার ঠাট্টা শুরু করলেন, দেখি তোমাদের মধ্যে প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপক হিসাবে কে জেতে।

আমি নাট্যকারকে জানালাম—"এই অনুষ্ঠানের জন্য তোমাদের কতকগুলো বেশি বেশি প্রোগ্রাম হাতে তৈরি রাখো। আমাদেরটা যখনই দেখব জমাতে পারছি না তখনই তোমাদের প্রোগ্রামগুলো নিয়ে যেন মান বাঁচাতে পারি।"

আমার দিক থেকে সব রকমের প্রস্তুতি ঠিকঠাক ; কিন্তু মুশকিল—পাকিস্তান থেকে তিরিশজন যে এসেছেন, গাইয়ে নেই তাঁদের মধ্যে একজনও। কি করা যায়! পুর্ববঙ্গের নেতা মুজিবর রহমান ঠাট্টা করে বললেন—আরে তুমি তো ভাই আমাদের পাকিস্তানেরই লোক, তুমিই না হয় গেয়ে দাও। যাই হোক শেষ পর্যন্ত ঠিক হ'ল ভারত পাকিস্তান মিলে এক সঙ্গে কোরাস বা সমবেত সঙ্গীতের প্রোগ্রাম করা হবে।

যথা সময়ে হাজির হলাম স্টেজে। চীনা নাট্যকার আগেই এসে প্রায় সব ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। একটু পরে মার্টিন এলেন। হাসি ঠাট্টা করছি কাজের ফাঁকে ফাঁকে। নাট্যকার উস্কে দেন কে জেতে কে হারে। যেন আমাদের মধ্যে গীত-বাদ্যের এক প্রতিযোগিতা হচ্ছে।

যাই হোক্ যথা সময়ে প্রোগ্রাম শুরু হল। আমাদের পরিচালিত অনুষ্ঠান কেমন হয়েছে, কাদের প্রোগ্রাম ভাল হয়েছে এবং মার্টিন এবং আমার মধ্যে কি জিত লেন একথা আমি নিজে কিছু বলতে চাই-না।

পরের দিন ইংরেজী কাগজ "সাংহাই নিউজ" এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কি লিখেছে তার হুবহু নকল নীচে উদ্ধৃত করলাম। আমি একজন অনুষ্ঠান পরিচালক হয়ে আবার নিজেই গান করেছি বলে হয়ত আমার সম্বন্ধে একটু বাড়াবাড়ি করেছে। নিজের কথা নিজে লিখতে কার না লজ্জা হয়। তবু লিখছি এই গৌরবে যে, আমার উপর যে সব দেশের প্রোগ্রামের ভার ছিল তাদের নামই কাগজে বেশি ছাপা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা না বলে থাকতে পারছি না, সেটি হ'ল—অনুষ্ঠানটি এতই হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল যে কিছুক্ষণ প্রোগ্রাম চলার পর পিকিং ফিল্ম স্টুডিওর একজন ডাইরেক্টর এসে জানালেন, তাঁরা এই অনুষ্ঠানটি আগাগোড়া তুলে রাখতে চান। সুতরাং, আমরা আবার যাতে গোড়া থেকে শুরু করি তার জন্য অনুরোধ জানালেন। পিকিং-এর বিখ্যাত দৈনিক 'সাংহাই নিউজ'-এ সেদিনকার অনুষ্ঠানের খবর বেরিয়েছিল নিম্নরূপ :—

"১৭ই অক্টোবর। বিভিন্ন দেশ থেকে শান্তি সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য যে সব প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা নৃত্য-শিল্পী, অভিনেতা, গায়ক ও বাদ্যযন্ত্র-শিল্পী, তাঁরা চীনের অতিথিদের ও অন্যান্য প্রতিনিধিদের একটি সান্ধ্য অনুষ্ঠানে আপ্যায়িত করেন। প্রায় সমস্ত সঙ্গীত ও নৃত্যের বিষয়বস্তুই খুব সমৃদ্ধ ও উৎসাহোদ্দীপক হয়।

"এই সান্ধ্য অনুষ্ঠানের তালিকায় ছিল জাপানী লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য, পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী ক্ষিতীশ বসুর "ভূমিহীন কৃষকের গান," ভারতের প্রসিদ্ধ নৃত্য-শিল্পী রোহিণী ভাটের "অভিনন্দন" ও "শান্তি কপোত" নামক দুইটি নৃত্য এবং শ্যামদেশ ও অন্যান্য দেশের বিভিন্ন বিষয়। অনুষ্ঠানটিতে বিভিন্ন দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় এবং তা প্রত্যেক দর্শকেরই উচ্চ প্রশংসা অর্জন করে। এর মধ্যে

একটি বিষয় বিশেষ করে শান্তি, ঐক্য ও মৈত্রীর প্রতি অর্ঘ হিসেবে রচিত হয়েছিল। বর্মার প্রতিনিধি-মণ্ডলীর সভ্য ও প্রসিদ্ধ রচয়িতা 'মাউং মিয়েন'-এর রচিত "শান্তির গান" সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয়েছিল। ভিয়েৎনাম, মালয় ও কোরিয়ার লোকেরা যে বীরত্বপুর্ণ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন তারই সম্মানার্থে এই গানটি গাওয়া হয়। সিংহলের শ্রীমতী এন, বৈকুণ্ঠভাসান চীনের মহান্ নেতা চেয়ারম্যান মাও সে-তুং-এর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী জানিয়ে স্বরচিত একটি গান করেন। চীনের শান্তি আন্দোলন ও মাও সে-তুংঙের মহিমার প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করে সিংহলের প্রতিনিধিরা সমবেত কণ্ঠে 'ভিরিন্দু' গেয়ে শোনান।

"ভারত ও চীনের নরনারীর সুগভীর মৈত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে একক সঙ্গীত গেয়ে শোনান ক্ষিতীশ বসু। ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা সমবেত কণ্ঠে যে গান গেয়ে শোনান তার বিষয়বস্তু হচ্ছে, 'আমরা যুদ্ধের অবসান ঘটাতে ও শান্তি চির-প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর। চীনের জনসাধারণ আমাদের এই দীক্ষাই দিয়েছে, এই বাণীই আমরা ঘরে ঘরে বহন করে নিয়ে যাব।'

"কি ভাবে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে চীনে প্রবর্তিত হয়েছিল, তারই পরিচায়ক 'স্যুইতিয়েং তুং' নামক একটি বিখ্যাত পুরাতন চীনা নাটক চীনের প্রসিদ্ধ অভিনেতাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হবার পর এই অনুষ্ঠানের শেষ হয়।

"বর্মা, কানাডা, সিংহল, চিলি, চীন, কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, মেক্সিকো, পাকিস্তান, পেরু, ফিলিপাইন, শ্যামদেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা সকলেই এই আনন্দপুর্ণ সান্ধ্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন।"

*　　　*　　　*

পরের দিন শিল্পী চু-চিয়েয়ার ও কুমারী হো ফাঙ্‌ এসে হাজির। জানালেন "পিকিং ফিল্ম স্টুডিও" থেকে রেকর্ডিংএর সাজ সরঞ্জাম নিয়ে এসেছেন আমার গানের রেকর্ড করার জন্য। দেখলাম একটি পোর্টেবল (বহনযোগ্য) টেপ রেকর্ডিং মেশিন নিয়ে রেকর্ডিং ইঞ্জিনিয়ার ও একজন সহকর্মী ওঁদের সঙ্গেই এসেছেন। হোটেলের মধ্যেই একটি প্রকাণ্ড কামরাতে বসে রেকর্ডিং হবে। ১৯৩৬ সাল থেকে বিভিন্ন 'লেবেলে' স্বনামে বেনামে কত ডজন ডজন রেকর্ড করে আসছি, ওতে আর আমার এমন কি আগ্রহ থাকতে পারে? তবে এক্ষেত্রে আগ্রহ হবার একটি বিশেষ কারণ আছে, সেটি হ'ল—নিজের ইচ্ছামত গান রেকর্ড করার স্বাধীনতা। এই তো মাত্র দু'বছর পূর্বে একটি বিদেশী রেকর্ড কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ, রেকর্ড করা হ'য়ে যাবার পর আমার একটি গানে দু'একটি লাইন আপত্তিজনক থাকায় বাজারে প্রকাশ করা বন্ধ করে দিলেন। লাইন দু'টি হচ্ছে—

"ট্রুম্যানের কেন মাথাব্যথা এশিয়ার জন্য আজ—
যায় লিকুইডিসানে সিংম্যানরী চিয়াং কাইশেক-রাজ"।

আমি যদি আমার কোম্পানীতে একটি কমিক গান রেকর্ড করতে চাই যার দুটো লাইন হচ্ছে নিম্নলিখিত রূপ—

"এই দেশটি যাদের হাতে তাদের চালায় পাগোলে
(তাই) লক্ষ টাকার বাগান খায় ভাই পাঁচ টাকার ছাগোলে।"

—তবে অসম্ভব নয় কি এ'গান রেকর্ড করা?

কিন্তু চীনদেশে বহুদিনকার এই বাসনা মেটাবার অভূতপুর্ব সুযোগ মিলল। যা খুশি গাই না কেন, বাধা দেবার কেউ নেই। তবে একটা অনুরোধ, যেন লোক-সঙ্গীত বা ক্ল্যাসিক্যাল সুর হয়।

কিন্তু লোক-সঙ্গীত যে গাইব, ধুয়া ধরবার লোক জোটাই কোথা

থেকে। ‘কেন অসুবিধা কি? আমাদের না হয় একটু কষ্ট করে শিখিয়ে নাও না’—জানায় চীনের নবীন সুরশিল্পী।

কষ্ট করতে হল না। ওরা ওদের ভাষায় লিখে নিল গানের ধুয়া ও তার সুর—

"হেইওরে—হেইও, হেইওরে হেইও
সামাল সামাল সামাল ওরে
সামলে তরী বাইও।"

দোহার হিসাবে আরও যোগ দিলেন গ্রাজুয়েট মহিলা সুং ইঞ মি এবং আমাদের শ্রমিক নেতা শৈলেন পাল।

ওখানে থাকতে রেকর্ড আরও কিছু কিছু করেছিলাম বটে, বিস্তৃত ভাবে সে সব লেখা নিষ্প্রয়োজন।

গল্প হ'লেও সত্যি

আমাদের ঘটনাবহুল মুহূর্তগুলো যেন রঙ্গমঞ্চের পট-পরিবর্তনের মতই অতি দ্রুত পরিবর্তিত হতে লাগল। সবাই চাইছেন যেন যত বেশি সম্ভব সব কিছু দেখে শুনে যাওয়া যায়। একটি মুহূর্ত আমাদের ফুরসৎ নেই। ‘শান্তি হোটেলের’ প্রকাণ্ড হলে বক্তৃতা দিচ্ছেন স্থানীয় একজন সরকারী কৃষি বিশেষজ্ঞ। আঙুর কিংবা আপেল তুলে তুলে মুখে দিচ্ছি আর শুনছি—সে দেশের ভূমি-সংস্কারের পর্ব কি ভাবে প্রায় সম্পন্ন হয়ে আসছে। ১৯৪৯ সালের পূর্বে যে সমস্ত স্থান মুক্ত হয় সেখানকার জমি আগেই সংস্কার করা হয়েছিল। মোটকথা বর্তমানে চীনের ৪২ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের অধ্যুষিত ভূমি আজ নতুন ব্যবস্থার আওতায়। অর্থাৎ, মহাচীনের শতকরা ৯০ জন কৃষক আজ সম্পূর্ণ মুক্ত, যার ফলে ১৯৪৯ সালের তুলনায় ১৯৫২ সালে

খাদ্য, তামাক, চিনি, রেশম এবং তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ২৪৬ ভাগ।

শতকরা ৪০টি কৃষক পরিবারই আজ যৌথ চাষী-সংগঠনের মধ্যে। সবশুদ্ধ চার হাজার যৌথ কৃষিখামার রয়েছে, যার মধ্যে ৫২টি সরকারের নিজস্ব। দেশ বিদেশের প্রতিনিধিগণের সঙ্গে আমিও তন্ময় হ'য়ে শুনছি।·········শুনতে শুনতে কোন্ অজান্তে চীনের নিভৃত পল্লীতে বিস্তৃত শস্য-ক্ষেত্রের মাঝখানে গিয়ে পড়েছি তা' নিজেই জানিনা।···বাতাসে নুয়ে নুয়ে পড়ছে শ্যামল-বরণী শস্যকন্যারাঃ যেন অভিবাদন জানাচ্ছে। বাতাস ব'য়ে চলেছে শান্তির বাণী-গুঞ্জনে মুখরিত হয়েঃ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

প্রবেশ করলাম গ্রামের ভিতর। বৃদ্ধা চাষী রমণী অভিনন্দন জানিয়ে বলে, 'এস এস বিদেশী বাছারা, আমাদের ঘরের মধ্যে। এস, সব তন্ন তন্ন করে দেখে যাও।—এই আসবাব পত্র দেখছ, যদিও খুবই সামান্য এগুলো, মাত্র কয়েকদিন আগের কেনা। ও, কি বলছ? ঘরে কি ছোট ছেলে-পুলে আছে? ছোট ছেলে-পুলে ঘরে কেউ নেই। ও এবার বুঝেছি, স্লেট, পেন্সিল, বই খাতা মেঝেতে ছড়ান রয়েছে বলে জিজ্ঞাসা করছিলে? ······তা ওগুলো আমার নিজের জন্যই। সত্যি বিশ্বাস কর, আমি ছিলাম একেবারেই নিরক্ষর। তাহ'লে কেন এই ৬২ বৎসর বয়সে স্লেট পেন্সিল কিনলাম? ······আশ্চর্য হবারই কথা। আমি কি ছাই তিন বছর আগেও ভেবেছি, এই তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, এখন নতুন করে লেখাপড়া শিখতে সাধ জাগবে! তাহ'লে শোন। তোমরা বিদেশী হ'লেও তোমাদের কাছে বলতে লজ্জা কি! তোমরা কি আমার কম আপনার জন!

'যাক্ শোনঃ সতের বছর বয়সে বিয়ে হয় আমার। স্বামী

নিরীহ চাষী। খুব সামান্য লিখতে পড়তে জানত। আমার এক ননদ ছিল। বড় ভাল মেয়ে। তার স্বামী তাকে মারধর করত। শাশুড়ী খুব খারাপ ব্যবহার করত। বরফ-জমা শীতে গায়ে জল ঢেলে দিত। আমার স্বামী এ খবর পেয়ে পাশের গ্রামে গিয়ে জমিদারের কাছারীতে নালিশ জানাল। নায়েব ডাকিয়ে নিয়ে এল আমার ননদ ও তার স্বামীকে। বেদম মারধর করে তাড়িয়ে দিল ননদের স্বামীকে। কিন্তু ননদকে কিছুতেই ছাড়তে রাজি হোল না। আমার স্বামী বার বার গিয়েও ননদকে যখন পেল না তখন শহরে নালিশ জানাতে গেল। এর মধ্যে কাছারীর লোকজন আমাদের ঘরের যাবতীয় জিনিস লুটপাট করল। বাদবাকী ভেঙ্গে চুরে তছনছ করে দিয়ে গেল।

'তারপর আবার কিছুদিন যায়। ননদকে তো পাওয়া গেলই না, উপরন্তু একে একে মিথ্যা দেনার মামলা করে কিছু কিছু জমি জমা নিলাম করে নিল। এমন করে দেড় বছর গেল। একদিন পূর্ণিমা রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে হঠাৎ ননদ এসে হাজির ৬ মাসের অন্তঃসত্বা অবস্থায়। গ্রামের লোকের নিন্দার ভয়ে সেই রাত ভোর হবার পুর্বেই ননদকে নিয়ে আমার স্বামী চলে গেল তিয়েন-সিন শহরে। স্বামী সেখানে একটি কাজ যোগাড় করে নিল। মাঝে মাঝে দু'একখানা চিঠি লিখত। পড়তে পারি না। কাকেও দেখাতে সাহস হয় না যদি তাতে আমার ননদের কথা কিছু লেখা থাকে! মনে মনে ভাবতাম 'তুমি কেমন আছ? আমি তোমায় ভালবাসি' এ পৃথিবীতে কি এমন কেউ নেই যে আমায় মাত্র এই দু'টো কথা লিখতে বা পড়তে শিখিয়ে দেয়? তারপর আরও চল্লিশ বছর কেটে গেল, ঠিক এমনি অক্ষর-পরিচয়হীন অবস্থায়। ······দেশ মুক্ত হ'ল।

রাতারাতি সব কিছু বদলাতে লাগল। প্রচুর খাবার ব্যবস্থা শুধু ধনীদেরই আর রইল না। যে মাংস বছরে একদিনও জুটত না তা এখন প্রতিদিন খেতেও কোন বাধা থাকত না, যদি না আমার দাঁতগুলো পড়ে যেত!

'যাক্, তারপরে কি করে লেখা-পড়ার দিকে ঝোঁক এল তাই বলি। দেশের চারিদিকে তো হুলুস্থুলু পড়ে গেল : চীন দেশের মানুষরা এক বিরাট সংগ্রাম শুরু করেছে। কি না!···নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। আমি কিন্তু তাতে কানও দেই নি! মজা হ'ল শেষে একদিন ফুটফুটে ছেলের একটি দল এল আমার কাছে। জিজ্ঞাসা করল, 'মা তুমি কি মাও সে-তুংকে ভালবাস না?'

'আমি একটু বিরক্ত হ'য়ে উত্তর দিলাম—একি প্রশ্ন হে ছোক্‌রা? আমার জীবনের ষাটটি বছর কেটেছে ছেঁড়া-নেকড়া-কাঁথা-চট্ গায় জড়িয়ে, আর আজ যার জন্য এই প্রথম গরম কোট গায় দিচ্ছি তাকে আমি ভালবাসব না, কি বলছ! সুন্দর ছেলেটি বলল 'মা তুমি যদি মাও সে-তুংকে ভালবাস, তুমি যদি চীন দেশকে ভালবাস, তাহলে তার ভাষাকেও তোমাকে ভালবাসতে হবে। তুমি নিরক্ষর থাকলে কি করে জানতে পারবে আমাদের প্রিয় নেতা মাও কখন কি বলেন?' আমি তার কথা শুনে মুগ্ধ হলাম, বললাম—সত্যি বলেছ বাছা। নিতান্ত প্রয়োজন আমার অক্ষর পরিচয়ের। যে কদিন বাঁচি মাও এর কথা আমার শুনতেই হবে।'······

···হঠাৎ চমক ভাঙ্গে। বসে আছি আমি সেই শান্তি হোটেলেই। ভূমি সংস্কারের বক্তৃতা শেষ হতেই চেয়ার ছেড়ে সব প্রতিনিধি উঠতে মেঝেতে চেয়ারের পায়ার ঘসার শব্দেই আমার চমক ভাঙ্গল।

পিকিং অপেরা

সেদিন রাত আটটায় "চীনা নাটক এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান" কর্তৃক নৃত্যগীত বহুল ক্ল্যাসিক্যাল অপেরা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হ'ল।

এদিনের প্রোগ্রাম শুধু মাত্র বিভিন্ন দেশের অতিথিদের জন্যই করা হয়েছিল। গান বাজনা অপেরা হ'লে আমার তাতে আর কামাই থাকত না, আরম্ভ হবার আগে একেবারে প্রথম সারিতে গিয়ে হাঁকিয়ে বসা চাই। পাশে বসতেন যে দোভাষী তার তো প্রায় প্রাণান্ত ঘটত। এক একটা ডায়ালগ্ শেষ করতে না করতেই জিজ্ঞাসা করি—কি, কি বল্লে ও?

কিন্তু আশ্চর্য, দোভাষী ছেলে কিংবা মেয়ে যেই হ'ক একটুও বিরক্ত ভাব প্রকাশ করত না। হয়ত অনেক সময় বলতাম, তোমাদের খুব বিরক্ত করছি কি বল? ওরা হেসে হেসে উত্তর দেয়, না, না, আমরা একটুও বিরক্ত মনে করছি না। তোমরা কষ্ট করে এতদূরে এসেছ, সব যদি না দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারি, সেটা হবে আমাদের দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার প্রচণ্ড অপরাধ।

নাটক শুরু হল। প্রথমে হুং নিয়াং নামক একটি আধঘণ্টার অপেরা—সি সিয়েন চি নামক পুরাতন ও উচ্চশ্রেণীর একটি নাটকের অংশ। হুং নিয়াং হ'ল মন্ত্রী সই-এর বাড়ীর একটি অতি সুনিপুণা ও সাহসী পরিচারিকা। সুই ইঙ্গ-ইং এবং তার প্রিয়তমা চেং চিং-জি পরস্পরের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা-বার্তা বলবার বা অনুরাগ প্রকাশ করবার সুযোগ পেত না। হুং নিয়াং ছিল সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় বিবাহের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। এই প্রেমিক-যুগলের পত্র বাহিকারূপে সে কাজ করতে লাগল এবং এমন কি রাত্রে তাদের উভয়ের

মিলন হতে পারে এমন একটি গোপন সুরক্ষিত স্থানও বার করল। নিয়াং-এর এই আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই সুই এবং চেং উভয়েই সুন্দর ও সুখী দাম্পত্য জীবন অর্জন করল।

এরপর দেখান হল "লিং চিং ফাং" নামক চৈনিক লোক-গাথার উপর ভিত্তি করে রচিত আর একটি অপেরা। এটি তরবারি-নৃত্য সম্বলিত গীত-বহুল অতি উচ্চাঙ্গের একটি নাটক। এই নাটকটি চীন দেশে অত্যন্ত জনপ্রিয়। কয়েক হাজার বছর আগে মানুষ ও জন্তুর মধ্যে জীবন-যুদ্ধে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটত এই নাটকে তারই প্রত্যক্ষ রূপ ফুটে উঠেছে। একটি সামুদ্রিক পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে এই নাটকের রূপ প্রকাশ পায় এবং এর গানগুলোর মধ্য দিয়ে প্রধানা নারী চরিত্রের সত্যিকারের আবেগ ও ভাব পূর্ণরূপে মূর্ত হয়ে উঠে।

লিং চিং ফাং একজন মধ্য-যুগীয় চৈনিক বালিকা। সে সমুদ্রের ধারে তার ছোট ভাই ও মায়ের সঙ্গে বাস করত। জীবিকা উপার্জনের জন্য লিং চিং ফাংকে গভীর সমুদ্রে মুক্তা ও শুক্তি সংগ্রহ করতে যেতে হত। এর ফলে তাকে জীবন বিপন্ন করে অনেক সময় বহু হিংস্র জলচর প্রাণীদের সঙ্গে লড়াই করতে হত। লিং চিং ফাং তার তরবারি দ্বারা একটি জল দানবীকে (Giant mussel Spirit) হত্যা করল। এই জলদানবীকে চীনের কিংবদন্তী অনুযায়ী একটি সুন্দরী ডাইনি বলে ধরা হয়। এই অপেরাটিতে চীনের বহু পুরাতন ক্লাসিক্যাল নৃত্যের সমাবেশ করা হ'য়েছে এবং বিভিন্ন প্রকার লড়াইয়ের কলা কৌশলের মধ্য দিয়ে চীনের মানুষের অসীম বীরত্ব এই অপেরাটিতে দেখান হয়।

বিরামের পর আবার শুরু হল "সান চা-কু" নামক আর একখানি উচ্চাঙ্গের অপেরা। সান চা-কু'র বাংলা অর্থ হ'ল "তিন

রাস্তার সঙ্গম"। চিয়াও মেন নামক একজন সেনাপতি ইয়াং ই-সিন নামক এক সেনাধ্যক্ষের অধীনে কাজ করতেন। এক বিশ্বাস-ঘাতকের ষড়যন্ত্রে তাকে 'সামেন' দ্বীপে নির্বাসনে যেতে হল। নির্বাসনে নিয়ে যাবার ভার যে দেহরক্ষীর উপর পড়েছিল সেই রক্ষীকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেনাপতি চিয়াও মেনকে পথে হত্যা করতে। নির্বাসনের পথে তারা হাজির হ'ল এক সরাইখানায়। সরাইখানার মালিক ভূতপূর্ব সেনাপতিকে চিনতে পারল এবং পথে তাকে হত্যা করবার অভিসন্ধি বুঝতে পেরে তাকে রক্ষা করবার সিদ্ধান্ত করল। এদিকে চিয়াও মেন যে-সৈনাধ্যক্ষের অধীনে কাজ করত সেও ঐ একই সরাইখানায় অবস্থান করছিল। কিন্তু হোটেলের মালিক তাকে ষড়যন্ত্রকারীদের গুপ্তচর বা প্রতিনিধি বলে সন্দেহ করল এবং সেই রাত্রে তার গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্য তার ঘরে ঢোকার ফলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল। হোটেল মালিকের স্ত্রী এবং চিয়াও মেন হট্টগোলের শব্দ শুনে সেই ঘরে প্রবেশ করে এবং অন্ধকারে কাকেও চিন্‌তে না পেরে সবার সঙ্গে সবার যুদ্ধ বেধে যায়। পরে সবাই সবার কাছে পরিচয় দিলে এই ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটে।

এই নাটিকাটির বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে সুনিপুণ তরবারি খেলা ও মল্ল যুদ্ধ।

তারপর অপর একটি অপেরা দেখান হল "বানরের হাতে দেবতাদের বিপর্যয়।' এ অপেরাটি অতি মনোমুগ্ধকর ও আনন্দদায়ক। এটি চীন দেশের একটি লৌকিক কাহিনী অবলম্বনে বচিত। প্রাচীন চীনের শ্রমজীবীরা জায়গীর-প্রথাকে তীব্রভাবে প্রতিরোধ করবার জন্য চীনের জনসাধারণের সমস্ত নির্ভীক শক্তিকে কি ভাবে জাগিয়ে তুলতে পেরেছিল, এ কাহিনীটি তারই একটি নিখুঁত ছবি।

সাং উ-কুং একটি অবাধ্য ও দুরন্ত বানর। কিন্তু দুরন্ত হলেও সে এমন বীর যাকে প্রীতির চোখে না দেখে পারা যায় না। সমস্ত রকম যুদ্ধবিদ্যায়ই সে পারদর্শী। এমন কি স্বর্গরাজ্যের অধিপতিদের সঙ্গেও যুদ্ধে সে সমান শক্তিমান। স্বর্গরাজ্যের অধিপতিরা এই দুর্ধর্ষ সাং উ-কুংকে নিজেদের আয়ত্তাধীনে আনতে চায়। তার ছিল ফলের বাগান রক্ষণাবেক্ষণ করবার ভার। যদিও স্বর্গের দেবতারা তাকে মনে মনে ঘৃণা করত তথাপি স্বর্গের একটি অতি উচ্চ উপাধি "চি-শিয়েন-দা-স্থন" দিয়ে তাকে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করল। স্বর্গের অধিপতিদের এই কৌশল বুঝতে পেরে সাং উ-কুং সমস্ত স্বর্গরাজ্যকে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে ফেলবে বলে মনস্থ করল। এই সঙ্কল্প নিয়ে স্বর্গরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রীর জন্মদিনের ভোজ উৎসবে সাং সে-রাজ্যের সমস্ত পীচ ফলগুলো খেয়ে সাবাড় করল। শুধু তাই নয়, স্বর্গরাজ্যে একটি ঔষধ ছিল, যা খেলে চিরদিন যৌবন ধরে রাখা যায়, তা নিয়েও সে সরে পড়ল। এবং "ফুল ও ফল পাহাড়ে" তার নিজস্ব গুহায় ফিরে এলো। এ দিকে স্বর্গরাজ্যে তো মহা হুলুস্থুলু। সাং উ-কুংকে ধরবার বহু রকম চেষ্টা হল। বানর ও দেবতাদের মধ্যে ভীষণ লড়াই হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বর্গবাসীরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করল।

এই নাটকে চীনের বহু প্রাচীন কালের প্রচলিত লাঠি ও বর্শা খেলার বিভিন্ন রকম জটিল মারপ্যাঁচ ও অদ্ভুত মল্লযুদ্ধ খুবই উপভোগ্য।

* * *

১৯শে অক্টোবর। সকাল থেকে একখানা মোটর নিয়ে সারা পিকিং শহর যেন চর্কীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছি। ব্যক্তিগতভাবে যে সমস্ত

শিল্পীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়, তাঁদের বাড়ীতে হঠাৎ ঢুঁ মেরে পারিবারিক জীবনযাপন সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করব এই ছিল উদ্দেশ্য। সাংহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গ্র্যাজুয়েট তরুণী ছিলেন আমার দোভাষী হিসাবে। মহিলাটি যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি উৎসাহী। আমার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে ঠিকানা অনুযায়ী শিল্পীদের বাসস্থান খুঁজে খুঁজে বার করতে লাগলেন। শিল্পীরা তো অবাক, "আপনি!"...সমাদর করে ঘরে নিয়ে যান। সব থেকে যিনি বিস্ময় প্রকাশ করলেন, তিনি হলেন "শুক্লকেশী তরুণী" নামক অপেরার জমিদারের ভূমিকায় অভিনয়কারী তরুণ শিল্পী কমরেড ইউ-ফু। এঁর সঙ্গে ভাল করে আলাপ হয় পিকিং হোটেলের নাচের আসরে। বিভিন্ন দেশের অতিথিবৃন্দ, স্থানীয় স্কুল কলেজের শিক্ষাবিদ্ ও কিছু সংখ্যক ছাত্রী এবং খ্যাতনামা কয়েকজন শিল্পী নিমন্ত্রিত হ'য়েছিলেন, এই নৃত্যে যোগদান করতে।

পিকিং হোটেলের মধ্যে অতি প্রকাণ্ড দু'টি হল পাশাপাশি রয়েছে। দু'টো হলের মাঝখানের পার্টিশনকে খানিকটা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দু'পাশে দুটি বাদ্যযন্ত্রী দল। একটি ব্রাসব্যাণ্ড আর একটি সর-ষ্ট্রীং বা তারের যন্ত্র। ব্রাসব্যাণ্ডটি যখন জাঁকজমক সহকারে ইণ্টারন্যাশনাল সুর বাজায় তখন তারের যন্ত্রীরা বিশ্রাম নেন। ব্রাসব্যাণ্ড শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে পিয়ানো সহযোগে তারের যন্ত্রীদল জলদ তালের লোকগীতির সুর।

আমি দুটো হলের মাঝখানের জায়গাটিতে একটি টেবিলের সামনে গিয়ে বসলাম। সেই মুহূর্তে তরুণ শিল্পী কমরেড ইউ-ফু আমার কাছে এসে, একটু দূরেই অন্যান্য শিল্পীরা যে টেবিলে বসেছিলেন সেখানে তাঁদের সঙ্গে যোগদান করতে অনুরোধ করলেন। আমি সানন্দে

তাঁদের টেবিলে গিয়ে উপবেশন করলাম। অন্যান্য কয়েকজন শিল্পীদের মধ্যে "শুক্লকেশী তরুণী"র নায়িকা কুমারী কো লং-ইংও ছিলেন। এঁদের মধুর আলাপ ব্যবহারে কত আনন্দই না পেয়েছিলাম! আমার সঙ্গের দোভাষী তরুণীটি ততক্ষণ আমাদের বাংলার প্রতিনিধি অধ্যাপক জে, কে, ব্যানার্জির সঙ্গে নৃত্য করছিলেন।

ওঁদের কারো ভাষা ভাল করে বুঝতে পারছি না। কুমারী কো লং-ইং ছুরি দিয়ে আপেলের খোসা ছাড়িয়ে আগে আমার প্লেটে কয়েক টুকরো দিয়ে তারপর নিজে মুখে দিচ্ছেন। কি মিষ্টি চাহনি, কি মিষ্টি তাঁর হাসি! আন্তরিকতায় অসীম শ্রদ্ধা জন্মায়। ওঁরা যেন আমার কতদিনের চেনা! আমরা যে দু'দেশের মানুষ সে কথা কখন ভুলে গেছি! এবার ওঁদের সঙ্গে নাচে যোগদান করতে বলায়, আমি পড়লাম মহা ফ্যাসাদে। বলনাচে আমি অভ্যস্ত নই, কিন্তু শোনে কে ?

"এস শিখিয়ে নেব"।

ধরেছে যখন রেহাই পাব না জানি, তবু বলি, শরীর ভাল নয়। একবার কপালে হাত দেয়। হাতের নাড়ী চেপে ধরে হেসে বলে, "তুমি এড়িয়ে যেতে চাও বলে শরীর খারাপ বলছ"!

জীবনে প্রথম বল নৃত্য শুরু করলাম—চীনের প্রখ্যাতনামা শিল্পী কুমারী কো লং-ইং-এর হাতে হাত ধরে। তারপর একে একে সকলের সঙ্গেই নাচলাম অবশ্য।

এইবার আসা যাক জমিদারের ভূমিকায় অভিনয়কারী শিল্পী কমরেড ইউ-ফু'র বাড়ীতে। কমরেড কতকগুলো ফল ও সবুজ রংএর চা এনে টেবিলে রেখে বল্লেন, "আমার বাড়ীতে আসবেন, আগে

জানালেন না কেন আপনি? আমি না হয় দুপুরের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা এখানেই করতাম।"

উত্তরে আমি জানালাম—"সাড়ে দশটায় "নাট্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানে"র সভাপতি, সুবিখ্যাত শিল্পী মি লান্‌-ফাঙের নিমন্ত্রণ আগেই গ্রহণ করেছি। সুতরাং ঐ সময়টার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করব বলেই আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম।"

তারপর আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করলুম।

নাট্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান

যথা সময় হাজির হলাম মি লান্‌-ফাঙের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে। আমার মোটর সেখানকার গেটে থামতেই দেখলাম মি লান্‌-ফাং এবং আরও অনেক স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রী দাঁড়িয়ে আছেন আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য। রাস্তার দু'পাশেও বহু লোক দাঁড়িয়ে।

আমাকে নিয়ে গেলেন—ক্লাসিক্যাল নাটক পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিজস্ব ভবনে। সেখানে গিয়ে দেখলাম আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশের আরও কয়েকজন শিল্পী আমার আগেই এসে পৌঁছেছেন। তাঁরাও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

স্কুলের যিনি সভাপতি তিনি আমাদের উদ্দেশ্য করে বল্লেন: "বিভিন্ন দেশের শিল্পী ও শান্তির প্রতিনিধিবৃন্দ! আপনারা আমাদের এই স্কুল পরিদর্শনে এসেছেন বলে আজ আমরা খুবই আনন্দিত। আমরা জানি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের এক বিরাটসংখ্যক শিল্পী আজ তাঁদের জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করা, উন্নততর করা এবং শান্তি

আন্দোলন জয়যুক্ত করার কার্যে ব্যাপৃত। আমরা সমস্ত শিল্পীদের, বিশেষ করে যাঁরা শান্তিকামী, তাঁদের দীর্ঘজীবন কামনা করি।”

তারপর তাঁদের এই স্কুল সম্বন্ধে যা যা বল্লেন তার মোটামুটি বিবরণ নিম্নে দিলাম :

এই স্কুলের ছাত্রসংখ্যা হবে দু’শো। তারমধ্যে শতকরা ৩৩ জন মেয়ে। শিক্ষকের সংখ্যা পঞ্চাশ জন এবং তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই হচ্ছেন প্রখ্যাতনামা অপেরা শিল্পী। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কোন বেতন দিতে হয় না। উপরন্তু প্রয়োজন বিশেষে—কেউ কেউ কিছু হাত-খরচাও পেয়ে থাকেন। স্কুল থেকে উচ্চাঙ্গের অভিনয়-পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ, শান্তিকামী সমাজ জীবন গঠন এবং নতুন গঠনতন্ত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান দান করা হয়।

তারপর স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীরা নমুনা হিসাবে কয়েকটি প্রদর্শনী দেখালেন। এই প্রদর্শনীর মধ্য দিয়া দেখান হ’ল কি পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীগণ শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

ক্লাসিক্যাল অপেরায় অভিব্যক্তি ও ক্রিয়াশীলতার মাধ্যমেই সাধারণত গল্প পরিবেশন করা হয়। এঁদের শিল্পকলা বর্তমানে খুবই উন্নতস্তরে গিয়ে পৌছেছে। মনে করুন, আমাদের দেশে যদি কোন পেশাদারী নাট্যসম্প্রদায় দৃশ্যপট প্রভৃতি বাদ দিয়ে শুধু হাবভাব ইশারা-ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে কোন নাটক মঞ্চস্থ করেন, নাটকটির সাফল্যলাভ করা অসম্ভব নয় কি? কিন্তু সেখানে বর্তমানে এই ধরনের উচ্চাঙ্গের অপেরা সাধারণ লোকেরা আগ্রহ সহকারে দেখে থাকেন। সম্ভব হয়েছে কেন?…সে দেশের সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটাবার কার্যে যে সমস্ত সংগঠন বহু পূর্ব থেকে সংগ্রাম করে আসছিলেন তাঁদের প্রচেষ্টা যাতে সার্থকরূপ ধারণ করে, তারজন্য সেখানকার সরকার

সর্বপ্রকারে সাহায্য করেছেন ব'লেই তা সম্ভব হয়েছে। সরকারের সাহায্যেই সম্ভব হয়েছে কুসংস্কার-মুক্ত সাবলীল সংস্কৃতির স্বচ্ছন্দ বিকাশ।

শ্রেষ্ঠ অপেরা শিল্পী মি লান্-ফাং ও অন্যান্য আরও কয়েকজন উচ্চদরের শিল্পী, যাঁরা এই স্কুল পরিচালনা কমিটির মধ্যে রয়েছেন, তাঁরা আমাদের জন্য এক ভোজ সভার আয়োজন করেছিলেন।

যখন যা দেখি, যে যা বলে, সঙ্গে সঙ্গেই নোটবুকে টুকে নেওয়া যেন একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। ভোজ সভায় বসেও স্বস্তি নেই—কলমটি বের করেছি। বলছিলেন বৃদ্ধ অপেরা-শিল্পী কমরেড চিয়াং: "আমাদের দেশের পুরানো নাম-করা শিল্পীরা বর্তমানে উন্নততর শিল্পের কথাই ভাবছেন। আগে শিল্পীরা কি করে শুধু টাকা রোজগার হবে তাই ভাবতেন। মুষ্টিমেয় দু'চারজন শিল্পী গাড়ি বাড়িও করেছিলেন বটে যদিও তা সম্ভব হয়েছিল নিম্নগামী অর্থাৎ অশ্লীল নৃত্য গীতাভিনয় পরিবেশন করে। কিন্তু মুক্তির পর তাঁদের চিন্তাধারা সম্পূর্ণরূপে পালটে গেছে।"

তারপর বললেন তাঁদের এই স্কুলের কথা: "সরকারের তরফ থেকে অকাতরে অর্থ সাহায্য না পেলে এমন সর্বাঙ্গসুন্দর শিক্ষা-নিকেতনটি পরিচালনা করা কথনই সম্ভব হ'ত না।"

* * *

সেদিন রাত্রে কোরিয়ার একখানি সুন্দর চলচ্চিত্র দেখবার সুযোগ পেলাম। বইখানি দেখে কোরিয়াবাসীদের যুদ্ধ-পুর্ব জীবনধারা এবং রাষ্ট্রসংঘের নিশানের আড়ালে সংঘটিত বীভৎস যুদ্ধের দ্বারা বিধ্বস্ত বর্তমান জীবনধারা তুলনামূলক ভাবে দেখা সহজ হল। কোরিয়ার ফিল্ম স্টুডিওর তোলা ছবি। ছবিখানির নাম "তরুণ গেরিলা"।

'তরুণ গেরিলা' চিত্রটি কোনও এক চলচ্চিত্র উৎসবে "ফাইট-ফর-

ফ্রিডম" অর্থাৎ "স্বাধীনতার-জন্য-যুদ্ধ" এই পুরস্কার লাভ করে। শত্রুদের পশ্চাদ্‌ভাগে থেকে কোরিয়ান যুবকরা কেমন বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করছে, এই চিত্রে তাই দেখান হয়েছে। কোরিয়ার মানুষ যে মার্কিন আক্রমণকে প্রতিহত করে শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করবেই, তরুণ গেরিলাদের বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ তারই পূর্ণ পরিচায়ক। ছবি খানির গল্পাংশ নিচে উদ্ধৃত করলাম:

১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসের শেষ দিকে মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদীদের এক বিরাট সামরিক বাহিনী উন্মত্তের মত উত্তর কোরিয়ার এলাকায় আক্রমণ চালায়। কোরিয়ার গণফৌজ এই সময় খুব কৌশলে পশ্চাদপসরণ করতে থাকে। শত্রুরা যখন অ্যানচন গ্রামের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, সেখানকার অধিবাসী ও সৈন্যেরা পূর্বকল্পিত কর্মপন্থা অনুযায়ী 'নো ডং-ড্যাং' সংগঠন দ্বারা পরিচালিত হয়ে সেই স্থান ত্যাগ করতে আরম্ভ করে। পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে তিনজন আদর্শ তরুণ পাইওনিয়ার—চো চ্যাং-লিয়ং, কিম্ সিং-হুন্ এবং সং হাউ মিন্। এদের গ্রাম, স্কুল ইত্যাদি এদের কাছে এত প্রিয় যে প্রতিবেশিদের দেশত্যাগ করে চলে যেতে দেখে তিনজনের মনেই ক্রোধাগ্নি জ্বলে উঠল। তারা তিনজনই নিকটবর্তী শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে বলে সঙ্কল্প করল। এই উদ্দেশ্যে ওরা 'আণ্ডার গ্রাউণ্ডে' থেকে, অর্থাৎ গুপ্তভাবে কাজ চালিয়ে যাবার জন্য শত্রুদের পেছনে র'য়ে গেল।

শ্রমিক শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা মাতৃভূমি ও দেশবাসীকে ভালবাসে গভীরভাবে। তাদের এই ন্যায়-যুদ্ধের সঙ্কল্পকে কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় শাখার সম্পাদক সমর্থন জানিয়ে পাক কি-হান্ নামক একজন স্কুল মাস্টারকে এদের পরিচালনার জন্য নির্দেশ দিলেন।

এদিকে মার্কিন সৈন্যেরা অ্যানচন্-এ প্রবেশ করতে না করতেই, লুট তরাজ, ঘরবাড়ি পোড়ান এবং পাশবিক অত্যাচার আরম্ভ করে দিল। স্থানীয় অধিবাসীদের পদানত ও নিষ্ক্রিয় করে রাখবার জন্য মার্কিন কম্যাণ্ডিং অফিসার পার্টি সভ্যদের ও অন্যান্য বে-সামরিক নাগরিকদের একধার থেকে আটক করবার হুকুম জারি করল।

কিন্তু অ্যানচন্-এর লোকেরা কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার করবে না। ইয়ং পাইওনিয়ারদের সক্রিয় প্রচার কার্যের ফলে লোকের মনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে আরও অধিকতর ঘৃণার ভাব জন্মাল। এবং তাদের মনে এই বিশ্বাসই সুদৃঢ় হল যে গণফৌজ নিশ্চয়ই ফিরে আসবে এবং তাদের শেষ পর্যন্ত জয়লাভ হবেই হবে।

তরুণ পাইওনিয়ার লি কুই-নাম চোখের সামনে মা এবং ভাই উভয়কেই শত্রুর হাতে নিহত হ'তে দেখল। এবং তার মা মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে আক্রমণকারীদের উপেক্ষা করে যা বলে গিয়েছিলেন, তা মনে করে রাখল: "পৃথিবীতে মানুষ খুন করেই সব সমস্যার সমাধান করা যায় না। তোমরা মনে করছ আমাদের হত্যা করলেই তোমাদের কাজ মিটে যাবে। কিন্তু তা নয়। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক আমাদের পেছনে আছে, আর তারাই তোমাদের এই হত্যাকাণ্ডের উচিত মূল্য দেবে। জয় আমাদেরই!" পাহাড়ের উপর বসে সে অদূরে স্কুলের মাঠ এবং পরিত্যক্ত ঘর বাড়ি, লোকজনহীন শহরের দিকে তাকিয়ে তার অতীত জীবনের সুখের কথা ভাবতে লাগল। মে দিবসের দিন কিভাবে তরুণ পাইওনিয়ারদের সঙ্গে মিশে প্যারেড করেছিল সেকথাও তার কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল তার দেশের নেতা মার্শাল কিম ইর-সেন এর কথা। মার্কিন সৈন্যদের বীভৎস ও অমানুষিক অত্যাচারের কথা ভেবে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সে প্রতিশোধ

নেবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোল। তরুণ পাইওনিয়ারদের গুপ্ত কার্যকলাপের সঙ্গে সে যুক্ত হল এবং পাঁচজনকে নিয়ে একটি গেরিলা বাহিনী তৈরি করল। ১৪ বৎসরের বালক চো চ্যাং-লিয়ং তার কমাণ্ডার নির্বাচিত হল।

একটি পাহাড়ের ধারে বিমান আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য তারা একটি আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করল। এই ইয়ং পাইওনিয়ার গেরিলা বাহিনী সমস্ত ব্যাপারকে গোপন রাখবার জন্য পরস্পর শপথ গ্রহণ করে এবং তারপর তারা শৃঙ্খলা, ভবিষ্যৎ কার্যকলাপ ও যুদ্ধ সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করে।

তাদের প্রধান কাজ হল শত্রুপক্ষের প্রতি গোপন ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা, খবরাখবর সংগ্রহ করা, শত্রুপক্ষের যানবাহন ও কাজের যোগা-যোগ নষ্ট করে দেওয়া এবং তাদের প্রবঞ্চনার মুখোশ খুলে ধরবার জন্য প্রচার স্বরূপ রাস্তাঘাটে পোস্টার এঁটে দেওয়া।

পার্টির পরিচালনাধীনে এবং ক্রমান্বয় উপদেশে এই তরুণ গেরিলা বাহিনী ওদের গোপন কার্যপদ্ধতি আরো বাড়িয়ে দিল। ওরা রাস্তা পরিষ্কার করবার জন্য একটি দল গঠন করল—যাতে প্রত্যেকদিন রাস্তা পরিষ্কার ও ঝাড়ু দেবার সময় ওরা শত্রুপক্ষের সামরিক সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে ; যাতে তারা গেরিলা বাহিনীর ব্যবহারের জন্য সামরিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য, বন্দুক, গোলা বারুদ ইত্যাদি চুরি করে নিয়ে আসতে পারে এবং শত্রুপক্ষের যোগাযোগ নষ্ট করবার জন্য টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তার কেটে দিতে পারে। এই সময়ে মুন-ইন-স্যুয়েন-যা'কে মার্কিন সৈন্যবাহিনীর হেডকোয়ার্টারের টেলিফোন এক্সচেঞ্জের অপারেটর হিসাবে গোপনে নিযুক্ত করেন পরিচালক পাক কি-হান।

শত্রু শিবিরের বাইরে ও ভেতরে তরুণ গেরিলা বাহিনীর সঙ্ঘবদ্ধ

সাংহাইয়ের বিখ্যাত জেড পাথরের বুদ্ধ মন্দির। সঙ্গে বুদ্ধ মন্দিরেরই জনৈক পুরোহিত।
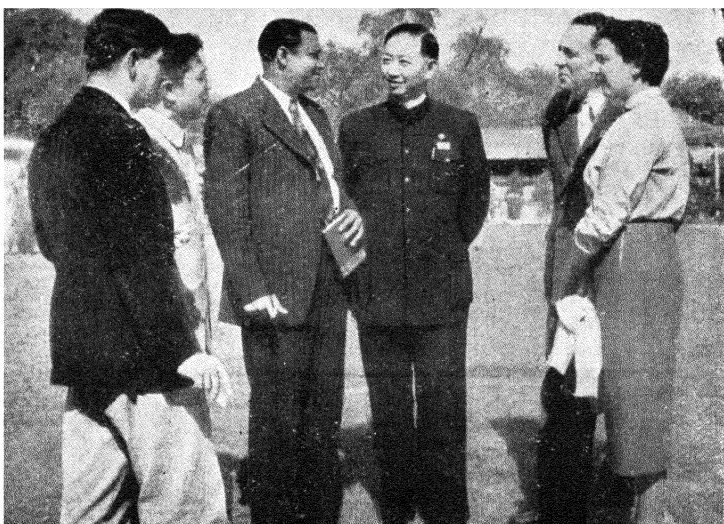
চীনের বিখ্যাত অপেরা শিল্পী মি লান্‌-ফাঙের সঙ্গে লেখক আল পে রত,
অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে নাট্যকার সাও-ইয়েইও রয়েছেন।
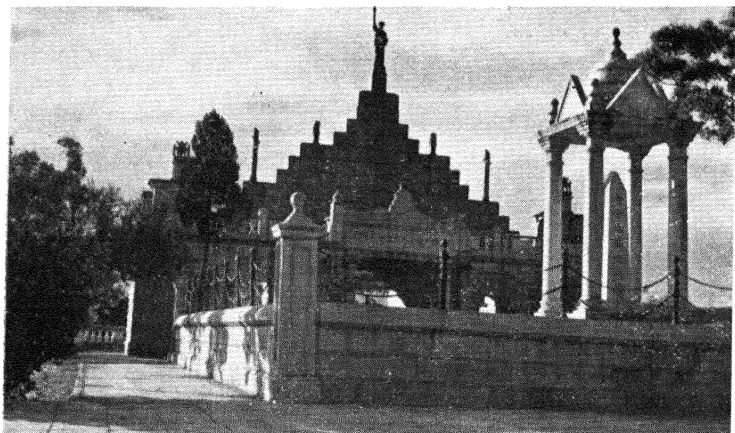
'হোয়াং হাকং গাং'—ক্যাণ্টনের এই বিখ্যাত শহীদ-তীর্থে ৭০ জন দেশভক্তকে হত্যা ক'রে কবর দেওয়া হয়েছিল। ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯১১ সালের ৯ই মার্চ, যখন ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে ১৭২ জন বিপ্লবী যুবক প্রাদেশিক শাসনকর্তার বিরুদ্ধ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

ভারতীয় প্রতিনিধিদের বিদায় দিতে এসে নয়াচীনের সীমান্তবর্তী সাঁকোর উপর দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন চীনের বন্ধুরা।

কার্যকলাপ শত্রুপক্ষের মধ্যে যে ভীতি ও উদ্বেগের সৃষ্টি করেছিল তার ফলে কান তে-সিং (দক্ষিণ কোরিয়ার একজন সেনাপতি) ক্ষ্যাপা কুকুরের মত মরীয়া হয়ে আরও খুন খারাবি করতে লাগল, এবং বহু নিরপরাধ লোকজনকে গ্রেপ্তার করল। এই কাজের ফলে কান তে-সিং লোকের চোখে ঘৃণার পাত্র হয়ে দাঁড়াল। সেই রাত্রেই তরুণ গেরিলা বাহিনীর লোকেরা এই বিশ্বাসঘাতকের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিল, এবং বহু নরনারীকে বন্দীদশা থেকে উদ্ধার করল। একদিন সেন-হুয়েন শত্রুপক্ষের পুলিস স্টেশনে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র চুরি করতে গিয়ে ওদের হাতে ধরা পড়ল। পার্টির সমস্ত খবরাখবর জানবার জন্যে মার্কিন সৈন্যেরা সেন-হুয়েনের উপর ভীষণ অত্যাচার করেও তার কাছ থেকে একটা কথাও বার করতে পারল না।

এই বীর যুবকের মুখ থেকে গোপন কার্যকলাপের কোন খবর না জানতে পেরে শত্রুরা পরে তাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে গুলি করে হত্যা করে। কিন্তু বালক সেন-হুয়েনের এই শহীদের মৃত্যুবরণ তরুণ গেরিলা বাহিনীর মনে যুদ্ধে জয়লাভ করবার জন্য আরও অনুপ্রেরণা এনে দিল।

চ্যাং লিয়ং গেরিলা বাহিনীর কাছে যুদ্ধজয়ের বার্তা নিয়ে এল। কোরীয় গণফৌজ চীনের গণস্বেচ্ছাসেবকদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে শত্রুপক্ষের ছয় ডিভিসন সৈন্য ধ্বংস ক'রে চন্‌চন্ নদীর দক্ষিণাংশ পুনর্দখল করে। গণফৌজের সঙ্গে যোগ দিয়ে অ্যানচন্‌কে মুক্ত করবার জন্য গেরিলা বাহিনীকে উপদেশ দেওয়া হল।

মার্কিন বাহিনীর টেলিফোনের তার কেটে দেওয়া হল। সমস্ত সংযোগ ব্যবস্থার যোগসূত্র ধ্বংস করা হল। মার্কিন বাহিনী যখন

পশ্চাদপসরণের আদেশ পেল তখন তারা গণফৌজ ও গেরিলা বাহিনীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। মার্কিন সৈন্যদলকে বিধ্বংস করে তারা অ্যানচন্‌কে মুক্ত করল। অ্যানচনের লোকেরা গণফৌজ ও গেরিলা বাহিনীকে সোল্লাসে অভিনন্দন জানালো।

চ্যাং লিয়ং, হাও মিন, বিয়ং চিন্‌, ফই নাম, ইন সান এই পাঁচজন তরুণ পাইওনিয়ার বিজয়গর্বে তাদের নতুন কমিশনারের অফিসে এসে প্রবেশ করল। অফিস সম্পাদক তাদের বীরত্বপূর্ণ স্বদেশ প্রেমের জন্য অভিনন্দন জানালেন।

পার্টির নেতৃত্বাধীনে তারা সেনাপতি কিম ইর-সেন-এর নির্দেশ অনুযায়ী এখনও শত্রুপক্ষের সঙ্গে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে জয়লাভ শেষ পর্যন্ত জনগণেরই; ইতিহাস তাদের এই বিশ্বাসেরই স্বপক্ষে।

* * *

ডিক্টেটরী শাসন?

আমার চীন গমনের আগে আমাদের দেশের দু' একটি পত্রিকায় দেখেছি, সারা চীনে নাকি ডিক্টেটরী শাসন বা কোতোয়ালি ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। কলকাতার এক চীনা জুতার দোকানের মালিকের পুত্র আমার বন্ধু। আমি চীন যাব শুনে সে আমাকে না যাবার জন্য বিশেষভাবে পীড়াপীড়ি করেছিল। সে জানিল যে, সারা চীনদেশে নাকি ধনী ও জমিদারদের গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। আমি অবশ্য তার উত্তরে জানিয়ে ছিলাম—আমি তো আর ধনী বা জমিদার নই যে আমাকে হত্যা করবে? সুতরাং, আমার যাওয়ার কি বাধা থাকতে পারে।

চীনদেশে গিয়ে এ ব্যাপারের অর্থাৎ ডিক্টেটরী শাসনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের বহু প্রকার চেষ্টাই করে দেখেছি। কিন্তু আশ্চর্য, আমাদের দেশের পুলিস কর্মচারী অফিসার বা তাদের কার্যকলাপের সঙ্গে তাঁদের দেশের কর্মপদ্ধতি মিলিয়ে দেখে আমি সত্যই নিরাশ হয়েছি!

শ্যাম বাজারের মোড় থেকে যদি কোন লোক ট্রামে বা বাসে করে টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো পর্যন্ত যান তবে পথে তিনি যতগুলো পুলিস সার্জেণ্ট বা অফিসার দেখতে পাবেন সারা পিকিং শহর ঘুরলেও ততগুলো পুলিসের সাক্ষাৎ মেলা অসাধ্য হবে।

চীন দেশে পুলিসকে বর্তমানে বলা হয় শান্তিপ্রহরী। তাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে শান্তি বা শৃঙ্খলা রক্ষা করা, এ ছাড়া তারা আজ অন্য কোন বিপরীত চিন্তাকেই মনে স্থান দেয় না। স্থানীয় ফাঁড়িগুলিতে সর্বদাই সর্বরকমের আলোচনা বৈঠকের সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। এমন কি তারা, পল্লীর উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে, প্রয়োজন হলে সাধারণ গৃহিণীদের সঙ্গেও গিয়ে আলাপ আলোচনা করে থাকেন।

পিকিং মুক্ত হবার অব্যবহিত পরেই পুরানো ঝুনো আমলা কর্মচারীদের দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এক বিরাট আন্দোলন শুরু হয়। এই ঐতিহাসিক আন্দোলন "সান ফান" আন্দোলন নামে পরিচিত। বহু পুলিস কর্মচারী এই আন্দোলনে যোগদান করেন এবং তাঁদের উপরস্থ দুর্নীতিপরায়ণ অসৎ অফিসারদের কার্যকলাপ হাতে নাতে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করেন। প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন অসৎ আমলা কর্মচারীদের মধ্যে যাঁদের সৎ ও জনগণের সেবক হবার সম্ভাবনা দেখা গেছে, তাদেরকে নতুন সরকারের নীতি ও কর্তব্য

সম্বন্ধে শিক্ষিত করে বিভিন্ন বিভাগে বদলি করে দেওয়া হল। আর যারা জ্ঞান-পাপী, সুবিধা পেলেই যারা চিয়াং কাইশেকী আমলারূপ ধারণ করার ইচ্ছে মনে মনে পোষণ করে, তাদেরকে সরকার মোটেই ক্ষমা করেননি। সেই জন্যই সেখানকার পুলিস আজ সত্যিকারের দেশভক্ত ও শান্তি সৈনিক। চিয়াংএর আমলে উপরস্থ অফিসারদের খুশি রাখলেই সরকার খুশি হত, কিন্তু বর্তমানে জনসাধারণকে যে কর্মচারী যত খুশি রাখতে পারবে তার উপরই তার সরকারী পদোন্নতি নির্ভর করে।

আমাদের দেশের সাধারণ লোকের কাছে পুলিসেরা তো ভীতির বস্তু। আম-জাম ফেরিওয়ালা, কুলি-কামিনদের কাছে পুলিসেরা যেন সাক্ষাৎ যমদূত। কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বেকার, দুর্গত ও বাস্তুহারা যুবকেরা পেটের দায়ে গামছা গেঞ্জি ছিট্-কাপড় ইত্যাদি ফেরি করে। দূর থেকে পুলিসের একখানা গাড়ি দেখলে তারা "হল্লা আসছে, হল্লা আসছে" বলে আশে পাশের অলিগলির মধ্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালায় ; পুলিস এসে পড়ে-থাকা জিনিসগুলির "দায়িত্ব গ্রহণ" করে। আর ক্যাণ্টনে দেখেছি ইন্দোচীন মালয় থেকে বাস্তুহারা হয়ে যারা নিজের দেশে ফিরে এসেছে তাদের প্রাথমিক রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়েছে সে দেশের শান্তিপ্রহরী। এমন কি তাদের হাট-বাজার, গৃহসংলগ্ন পথঘাট পর্যন্ত সেই শান্তিপ্রহরীরাই পরিষ্কার করে দিচ্ছে।

আমাদের দেশের একদল বিশ্বনিন্দুক আছেন যাঁরা কলকাতা করপোরেশনকে বলে থাকেন 'চোরপোরেশন'। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে, কলকাতার প্রকাশ্য রাস্তায় নাকি ভেজাল খাদ্য বিক্রি হয়। বহু অলিগলি রাস্তা নাকি রয়েছে এমন অস্বাস্থ্যকর নোংরা আবর্জনায় ভর্তি, যেটা নাগরিকদের প্রতি চূড়ান্ত অবহেলারই পরিচয় দেয়। এই

সব নিন্দুকেরা আরও বলে থাকেন, বহু প্রকাণ্ড ধনী সজ্জন ব্যক্তিরা গরীব নাগরিকদের তুলনায় অনেক কম ট্যাক্স দেবার প্রচুর সুযোগ পেয়ে থাকেন, ইত্যাদি আরও নাকি বহু রকম দুর্নীতি!

চিয়াংএর আমলে চীনের মানুষেরা পিকিং বা অন্য বড় বড় শহরের করপোরেশনগুলোকে 'চোরপোরেশন'-এর অনুরূপ কোন নাম দিয়েছিল কিনা জানিনা। তবে সেখানেও অতি মারাত্মকভাবে যে এই দুর্নীতির ব্যাধি বাসা বেঁধেছিল, তাতে কোন ভুল নেই। এবং সেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে বহু নাগরিককে প্রাণ দিতে হয়েছিল—বেয়নেটের খোঁচায়।

মুক্তির পর দুর্নীতি, উৎকোচ গ্রহণ, অপরিচ্ছন্নতা এবং নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে 'সান-ফান' এবং 'ইউ-ফান' আন্দোলনের সাফল্যলাভের পর পিকিংএ সাধারণ নির্বাচন হয়। প্রত্যেকটি অলিগলির যে কোন সাবালক নরনারী এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। প্রত্যেক রাস্তায় রাস্তায় সভা সমিতি ক'রে, দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা ক'রে, তারা উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্বাচিত করেন। প্রতিনিধিরা নিজ আসনে প্রতিষ্ঠিত হবার পর "যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ" হবার কোনও সুযোগ পান না। তারা নাগরিকদের সর্বরকম স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ, সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে সর্বদাই তারা সংশ্লিষ্ট, সদা সর্বদা তাদের সুবিধা অসুবিধার বিষয়ে তাঁদের চিন্তা করতে হয়। হাতে এমন ক্ষমতা রয়েছে যে, প্রয়োজন হলে নিজ এলাকার লোকেরা গণ-স্বাক্ষর দিয়ে তাদের প্রতিনিধিদের আসনচ্যুত করতে পারে।

সরকারী দায়িত্বপূর্ণ নেতারা পুলিস বা মিলিটারী পাহারায় চলাফেরা করা বা নিজ আবাসের চতুর্দিকে অনুরূপ পাহারার

বন্দোবস্তের কোন প্রয়োজন মনে করেন না। তারা পথে দোকানে খেলার মাঠে সিনেমা হলে জন ।ণের সঙ্গেই মিশে রয়েছেন।

একদিন অপেরা দেখতে গিয়ে অপেরা গৃহের মধ্যে পিকিংএর নগরপালের ঠিক পাশেই আমি বসেছি। অবশ্য তখনও আমি তাঁকে চিনি না। চেয়ারে ঠেস্ দিয়ে দুখানি হাতলই অধিকার করে মহা আরামে অপেরা দেখছি। এক অসতর্ক মুহূর্তে আমার বাঁ হাতের ডানার উপর তাঁর হাতখানি লাগতেই তিনি যেন অপরাধীর ন্যায় বিব্রত হয়ে পড়লেন। কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার জানিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন আর কি! অথচ আমি কিন্তু নিজে লজ্জিত হয়ে লক্ষ্য করলাম তাঁর চেয়ারের হাতলখানিতে বরং আমার হাতই রয়েছে। পরে জানলাম তিনিই নাকি সেখানকার পৌরাধিপতি।

আরও একদিন অপেরা দেখতে গিয়ে একটি ব্যাপার ঘটেছিল। দৃশ্যপট পরিবর্তনের সময় সকল দর্শক গিয়ে হাজির হলেন বিশ্রাম কক্ষে, সাধারণত সিগারেট খাওয়া আমার অভ্যাস নেই, কিন্তু চীনে গিয়ে মাঝে মাঝে দু'একটা খেয়েছি। বিশ্রাম কক্ষে এসে সিগারেট মুখে দিয়ে দিয়াশলাইর জন্য টেবিলে হাত বাড়াবার পূর্বেই আমার ঠিক পাশের চীনা ভদ্রলোকটি সিগারেট লাইটারে আগুন ধরিয়ে আমার মুখের সামনে ধরলেন। সিগারেট ধরিয়ে তাকে ধন্যবাদ জানালাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও মুচকি হেসে মাথা নাড়লেন। পরে অবশ্য শুনলাম একজন দোভাষীর মুখে, তিনি নাকি সেখানকার একজন মন্ত্রী!

সে দেশে ডিক্টেটরী শাসন চালু হয়েছে ব'লে যাঁরা প্রচার করে থাকেন, তাঁরা ওয়াশিংটন থেকে খবরটি আমদানি করেছেন কিনা জানি না, তবে খবরটি যে আজগুবি তা বিশ্বাস করতে আমরা বাধ্য হয়েছি।

রিক্সা থেকে প্লেনে

২০শে অক্টোবর সকালে বেরিয়েছি বাজারের দিকে। মোটর ছেড়ে পায়ে হেঁটে চলছি। টুকিটাকি দু'একটি জিনিস কিনলাম। ফিরে আসবার সময় সখ জাগল—ওদের রিক্সায় চড়ি একবার।

সারা চীন দেশ থেকে আজকাল হাতে-টানা রিক্সা চালান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বর্তমানে চালু রয়েছে সাইকেল রিক্সা, তাও আবার একজনের বেশি বসবার ব্যবস্থা নেই। আমাদের দেশের রিক্সার মত বাক্স পেঁটরা বোঝাই করবার জায়গাও নেই, বা আর একজন কোলে কাঁখে বা পায়ের কাছে বসবার ব্যবস্থাও আজকাল বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

যাই হ'ক কাজেব কথায় আসছি। ভাল করে দেখলাম চীনা রিক্সাওয়ালাকে। তুলো-ভর্তি নীলরঙের মোটা ফুল প্যাণ্ট পরা, কোট গায়; পায়ে পুরু মোজা, রবারের সোল দেওয়া পুরু কেড্‌সের জুতা; একখানা বই হ্যাণ্ডেলের উপর রেখে নিবিষ্ট মনে পড়ে চলেছে।

বর্তমানে সারা চীনদেশের নিরক্ষর মানুষদের লেখাপড়া শেখাবার অভিযানকে আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হওয়াই স্বাভাবিক। এই অভিযানের ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে পড়াশোনার প্রতি গভীর ও ব্যাপক আগ্রহ জেগেছে, তা আমি দেখেছি—দেখে অভিভূত হয়েছি। ক্যাণ্টনে দেখেছি, পার্ল নদীর উপর জেলে-রমণী অবসর সময় কাটাচ্ছে বই নিয়ে। সাংহাই ডকের এক জাহাজের মধ্যে খালাসীদের দেখেছি ঢুলে ঢুলে বই পড়তে। পিকিং হোটেলে এক পরিচারিকাকে দেখেছি অতিথিদের বিদায় করে টুলের উপর বই

নিয়ে বসতে। এমনি বহু দৃশ্যই চোখে পড়েছে, যা দেখে লেখাপড়া শেখবার জন্য ও-দেশের নিরক্ষর মানুষদের কি গভীর আগ্রহ তা অনুমান করা কঠিন নয়।

রিক্সাওয়ালার কাছে যেতেই সে বই বন্ধ করে দিল। আমি যখন বললাম "পিকিং হোটেল—পিকিং হোটেল", রিক্সাওয়ালা অমনি অঙ্গুলি-সঙ্কেতে জানাল দু'হাজার ইয়ান অর্থাৎ আমাদের হিসাবে সাড়ে ছয় আনার মত ভাড়া। রিক্সাওয়ালাদের মোটামুটি একটা রেট বাঁধাই আছে। তার চেয়ে কেউ কখনও বেশি বা কম চাইবে না। সেখানকার আরোহীরা ভাড়া সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করারও প্রয়োজন মনে করেন না। আমি বিদেশী বলেই হয়ত সে রেট্ জানিয়েছিল।

রিক্সায় উঠলাম। পিকিং হোটেল খুব নিকটেই ছিল। হোটেলের কম্পাউণ্ডে এসে নামলাম। পাঁচ হাজার ইয়ানের একখানি নোট হাতে দিলাম (চার হাজার সাড়ে সাত শ৩ ইয়ানে আমাদের এক টাকা)। রিক্সাওয়ালাকে ভাঙানি ফেরৎ দেবার সুযোগ না দিয়ে আমি হন্ হন্ করে হোটেলের ভিতরে প্রবেশ করলাম—অর্থাৎ আমি ওকে সবটাই দিতে চাইলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে আমাদের একজন সেক্রেটারী শ্রীমতী মেহ্‌তা আমাদের কামরায় এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের মধ্যে কেউ আজ রিক্সা চড়েছি কিনা। আমি ভাবছি বেফাঁস কিছু করে এলাম নাকি? ভয়ে ভয়ে বললাম, আমিই আজ রিক্সা চড়েছিলাম। শ্রীমতী মেহ্‌তা তিন হাজার ইয়ানের নোট হাতে দিয়ে বল্লেন, তুমি বেশি ভাড়া দিয়ে ফেলেছ, তাই ফেরতটা দিতে এলাম। আশ্চর্য হয়ে আর একবার প্রত্যক্ষ করলাম সে দেশের সাধারণ মানুষের

সততা। মনে মনে অভিনন্দন জানাতে বাধ্য হলাম রিক্‌সাওয়ালাকে : হে চীনদেশের মেহনতী মানুষ, তোমরা দীর্ঘজীবী হও! দীর্ঘজীবী হোক তোমাদের নতুন শিক্ষা পদ্ধতি!

প্রতি মুহূর্তে আরও কত আশ্চর্য ঘটনাই না ঘটে যাচ্ছে। কত আর লিখি! সবকিছু লিখলে আমাদের মহাভারতের মত এক বিরাট গ্রন্থ হয়ে যাবে। কাজে কাজেই সংক্ষেপ না করলে উপায় কি!

২১শে অক্টোবর আমাদের পিকিং পরিত্যাগের দিন। এশিয়ার মহাতীর্থস্থান পিকিং। দীর্ঘ আটাশদিন এখানে থেকে যেন সব কিছুর উপরেই একটা মায়া জন্মে গেছে। সকাল ৯টার মধ্যে বিমানঘাঁটিতে পৌঁছতে হবে।

৮টার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া শেষ হল। পরিবেশন করছিলেন যে তরুণী, অন্যদিনের তুলনায় আজ যেন আরও বেশি যত্ন সহকারে খাদ্যবস্তুগুলো এনে দিচ্ছিলেন। খেতে খেতে আমার যেন মনে হচ্ছিল ছোটবেলার কৃষ্ণযাত্রার 'নিমাই সন্ন্যাস' পালার নিমাইর গান : "জন্মের মত খেয়ে যাই মা তোমার হাতের পরমান্ন।"

এই তরুণীটিকে সময় সময় দেখেছি, ওর টেবিলে হয়তো অতিথি কেউ নেই, পনেরো মিনিট হয়ত ফুরসৎ হল, কোণের ছোট একটি টুলে বসে নিবিষ্ট মনে বই পড়ে সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করে নিলেন। আবার হয়তো কোনও সময়ে দেখেছি তাঁকে নৃত্য করতে। আমি প্রথম দিন দেখে তো আশ্চর্যই হয়ে গিয়েছিলাম বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে ওকে নাচতে দেখে। আমরা কি কখনো ভাবতে পারি যে, আমাদের বাড়ীর মোক্ষদা ঝি অবসর সময় আমাদের হাত ধরে বাজনার তালে তালে নাচছে? কিন্তু

সেখানে এটি সম্ভব শুধু এইজন্য যে, বর্তমানে সেখানকার মানুষ পরিচারিকাকে আর ঝিয়ের মতই মনে না করে, সাহায্যকারিণী হিসাবেই গণ্য করে থাকে। ধনতন্ত্রী দেশ আর নয়া গণতান্ত্রিক দেশের পার্থক্যটাই হল এই।

হোটেলের লোকজনদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলাম করমর্দন বা আলিঙ্গন করে। সে দেশে আর বকৃশিশ দেবার রীতি নেই, আন্তরিক ভাব বিনিময়ই যথেষ্ট।.........গাড়ীতে উঠেছি। বারবার তাকাচ্ছি হোটেলের দিকে। হোটেলের সব লোক বিদায় সম্বর্ধনা জানাচ্ছে।.........

পিকিং সদর রাস্তা, বাড়ীঘর, উদ্যান, পেছনে ফেলে গাড়ী চলছে শহরের বাইরে বিমানঘাঁটির দিকে। প্রতিদিনকার মতই রাস্তার দু'পাশে লোক চলছে। অতি সরল স্বত্ব পরবশ দৃষ্টি নিয়ে তারা আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। মনে হল আমাদের অত্যন্ত নিকট আত্মীয় স্বজনদের ছেড়ে চলেছি বহু দূর দেশে।

পিকিং শান্তি কমিটির বিশিষ্ট নেতৃবর্গ এবং ছোট বড় ছেলেমেয়ের দল বিমানঘাঁটিতে আমাদের বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে এলেন। এমন আত্মীয়ের মত নিবিড় ক'রে আমাদের তাঁরা জড়িয়ে ধরতে লাগলেন, মনে হল কেউই আমরা এত করুণ বিদায়ের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।

ঠিক ৯॥টায় ওঁদের ছেড়ে উড়োজাহাজে উঠলাম। আমাদের প্লেন পিকিংএর মাটি ছেড়ে যখন উপরের দিকে উঠছিল তখনও দেখছিলাম আমাদের বন্ধুরা হাত তুলে "শান্তি দীর্ঘজীবী হোক!" "চীন-ভারত মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক!" বলে সোল্লাসে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন।

প্লেন খুব নীচের দিকে নেমে শহরের খানিকটা অংশের উপর

একবার পাক দিয়ে নিল। দেখা যাচ্ছে নানা ধরনের অগুন্তি ঘরবাড়ি, রাজপ্রাসাদের চূড়াগুলো। শহরের প্রান্ত সীমায় বিরাট ও নতুনধাঁচে তৈরী পিপ্‌লস ইউনিভার্সিটির বাড়ীগুলো একপাশে ফেলে, গ্রীষ্ম-প্রাসাদের সরোবর, পাহাড় নীচে ফেলে উড়ে চলেছি—সুদূর সাংহাইয়ের উদ্দেশ্যে।

প্লেনের মধ্যে আবার নিজেকে গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করছি। এবার যাব সাংহাই। নয়াচীনের একটি শ্রেষ্ঠ বন্দর। ছোটবেলা থেকে নাম শোনা অতি প্রসিদ্ধ স্থান। আবার নতুন করে কত বন্ধু-বান্ধব সৃষ্টি হবে। মন্দ কি, আবার নতুন পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পড়ব!

আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে চোখ বুজে আছি। আকাশ পাতাল কত কি মনে আসছে! পিকিং থাকাকালীন কর্মবহুল বিচিত্র দিনগুলোর কথা।.........

...পিকিংএর নিষিদ্ধ শহর বা রাজপ্রাসাদ। এককালে শুধু সম্রাট-সম্রাজ্ঞীদের উপভোগের জন্য যে উদ্যানটি ছিল তারই মাঝখানে যেন আমি দাঁড়িয়ে। গাছে গাছে ফুল ফুটে রয়েছে রাশি রাশি। আকাশে চতুর্দশীর চাঁদ, তার স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে দিয়েছে সারা উদ্যানটিতে।... কোথায় এলাম—"ফুল মহল"! ঝির ঝির হাওয়া বইছে। ফুলগাছ দুলছে। বুঝি আমাদের সম্বর্ধনা জানাচ্ছে! একটি গাছের মাথায় ফুলের বৃন্তে হাত দিলাম আর শত শত গাছের সহস্র সহস্র ফুল যেন মাথা নুইয়ে নুইয়ে আমার গায়ে এসে আছড়ে পড়বার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল।......যেন খুব মৃদু সঙ্গীত ভেসে আসছে।......তাই ত, কুসুমেরা গাইছে কুসুমিত সঙ্গীত: 'হে বিদেশী অতিথি, আমাদের কাহিনী তুমি শোন। আমরা ছিলাম অসূর্যম্পশ্যা বন্দিনী নারীর মত অবগুণ্ঠিতা। শত শত বর্ষ ধ'রে এই মহলে আমরা কুঁড়ি হয়ে ফুটেছি, পুষ্প হয়ে

ঝরেছি। একমাত্র সম্রাটের শ্রেষ্ঠা মহিষী ছাড়া অন্য কেউ অঙ্গস্পর্শ করতে পারত না,—প্রাচীনকাল থেকে এই ছিল বিধি।...........

তারপরে এলো আর এক যুগ। রাজা-রাণীর দৌরাত্ম্য অবশ্য শেষ হল কিন্তু শুরু হল নতুন আর এক দৌরাত্ম্য। চিয়াং কাইসেকের সেনাপতি ও তাদের বিলাসিনীদের লালসায় আমরা হলাম অসহায় আহুতি।

তারপরে এল জাপানী দস্যুর দল—তাদের না ছিল শিল্পবোধ, না ছিল মানবতাবোধ। পায়ে দলে আমাদের প্রায় নিঃশেষ করে ফেলেছিল আর কি!...কিন্তু আজ আমরা মুক্ত! ওগো বিদেশী অতিথি, শোন, আজ আমরা মুক্ত! মুক্ত, কামনার বিষবাষ্প থেকে ভালোবাসার প্রশস্তিতে; মুক্ত, অন্ধকার থেকে আলোয়।......হে বিদেশী অতিথি, তোমাকে প্রীতি জানাই। আর নতি জানাই তাঁকে যিনি দিয়েছেন আমাদের মুক্তি;—জয়তু মাও!......

দীর্ঘ সাড়ে চারঘণ্টা মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে, বাতাসের সঙ্গে লড়াই করে.........উড়ে উড়ে ছোট জাহাজখানি সাংহাইএর মাটি স্পর্শ করল—বেলা তখন দুটো।

সাংহাই শান্তি পরিষদের নেতৃবৃন্দ বিমানঘাঁটিতে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত। আমরা রওনা হলাম সেখানকার শ্রেষ্ঠ হোটেল—"কিং কং" এ।

সাংহাই

হোটেলের নাম 'কিং কং', আকৃতিও কিং কংএর মতই বিশাল। আমরা ষোলজন ভারতীয় এই দলে রয়েছি। আমাদের এই দলটি পিকিং থেকে শুরু করে একেবারে হংকং অবধি একসঙ্গেই ছিলাম, ছাড়াছাড়ি হয় হংকং থেকে।

সাংহাই গিয়ে প্রথমেই যা নজরে পড়ল তা হচ্ছে সেখানকার রাস্তাঘাট ঘরবাড়ী ও বাহ্যিক পরিবেশ যা সবই পিকিং থেকে স্বতন্ত্র। যদিও পঞ্চাশ লক্ষ লোকের বাস এই নগরীতে এবং খুবই জাঁকজমকপূর্ণ এই মহানগরী, তথাপি তার কোন কিছুই পিকিংএর মত চীনের জাতীয় সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের কোন সাক্ষ্যই বহন করে না।

বর্তমানে সারা চীনদেশের আশ্চর্যজনক অগ্রগতির কাজে সাংহাই খুব কম গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেনি। তৎসত্ত্বেও আমার মনে হয় চীনের জাতীয় স্বকীয়তা থেকে বেশ কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে এই নগরী যেন পাশ্চাত্যের কোন নগরীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

পিকিংএর পরিবেশ, নিজস্ব রঙে তৈরী হলদে টালির ছাদেব ঘরবাড়ি, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উদ্যান, কৃত্রিম পাহাড়, কৃত্রিম হ্রদ প্রভৃতি সুদৃশ্য বস্তুগুলি আমার মনে এমন গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল যে সাংহাইএর বিরাট বিরাট আঠার-কুড়ি তলা আধুনিক ফ্যাসানের অট্টালিকা, ঝকঝকে রাস্তাঘাট, বড় বড় পার্ক ইত্যাদি কোন কিছুই আমার মন থেকে পিকিংএর সেই অপরূপ স্মৃতি মুছে দিতে পারেনি।

অবশ্য সাংহাইএর পথঘাটগুলো ঠিক পিকিংএর মতই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। অধিবাসীরাও ঠিক একইরকম ব্যস্ত সমস্ত। ছেলেমেয়েরা ঠিক একই রকমের খেলাধূলায় মত্ত। রাস্তার লোকেরা ঠিক একইভাবে আমাদের “শান্তি দীর্ঘজীবী হোক” বলে অভিনন্দন জানাল। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাতীয় ঐতিহ্যে সুসমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র পিকিং সত্য সত্যই চীন জনগণের রাজধানী হবারই উপযুক্ত স্থান, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

* * *

মহাচীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকেন্দ্র এই সাংহাই নগর আজ কর্মচঞ্চল ও প্রাণোচ্ছল। মুক্তির সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন দেশী ধনিক ও বিদেশী বণিকের শ্বাসরোধী আধিপত্য এড়িয়ে আজ সে সারা চীনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন উত্তরোত্তর বাড়িয়েই চলেছে।

কুয়োমিনটাং শাসনাধীনে সাংহাইয়ের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল নিতান্ত শোচনীয়। চীনের আভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধের দরুন যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা ঘটেছিল তার ফলে চীনের অন্যান্য স্থান থেকে বহু জমিদার, ধনী ব্যবসায়ী ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী সাংহাই পালিয়ে আসে। অত্যধিক লোকের বসবাস ও অব্যবহৃত মূলধনের একত্র সমাবেশ হওয়ায় হঠাৎ সাংহাইএর বাজার চূড়ান্ত অস্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড়ায়। ফাট্‌কাবাজী ও চোরাকারবার ছাড়া স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা ছিল একান্তই মন্দা। সাধারণ লোকের ক্রয়শক্তি না থাকার দরুন বাজারের জিনিসপত্রেব দাম অত্যন্ত নেমে গিয়েছিল। স্বদেশী কলকারখানাগুলো প্রায় একরকম বন্ধই করতে হয়েছিল।

এই প্রচণ্ড অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা, তাছাড়া চিয়াং সরকারকে উৎখাত করার পরেও ১৯৫০ সাল অবধি কুয়োমিনটাং সৈন্যেরা যে উপর্যুপরি বোমা বর্ষণ করেছিল তা সত্ত্বেও সাংহাই আবার মাথা তুলে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার অর্থনৈতিক অগ্রগতির চিত্র চলচ্চিত্র, স্থিরচিত্র নয়। তা দাঁড়িয়ে নেই, এগিয়েই চলেছে।

মুক্তির অব্যবহিত পরেই বিশেষ বিশেষ কতগুলো সম্পদ জাতীয়করণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রচেষ্টায় কুড়িটি বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। ৯ লক্ষ টাকু সমেত কাপড়কল চালু করা হয়েছে।

সরকারের তরফ থেকে বাজারে অনেক খুচরা বিক্রয়ের দোকান খুলে দেওয়া হয়। তার ফলে অপেক্ষাকৃত কমদরে জনসাধারণ প্রচুর পরিমাণে কাপড়চোপড় খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস পেতে লাগল।

সেদিন রাত্রে স্থানীয় শান্তি কমিটির বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ এক ভোজানুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। বিশ পঁচিশ রকম রান্না করা খাদ্য দিয়ে অতিথি সৎকার, এ তো সারা চীনদেশেরই রীতি। এ নিয়ে বেশী লেখা নিষ্প্রয়োজন।

পরের দিন সকালে প্রাতরাশ সেরে গেলাম শ্রমিকদের 'কালচারাল প্যালেস' বা সাংস্কৃতিক ভবন দেখতে। পূর্বে এই ধরনের কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। প্রকাণ্ড বাড়ীটিতে আগে ছিল একটি ইওরোপীয় হোটেল। ১৯৫০ সালের ১লা অক্টোবর এই সাংস্কৃতিক ভবনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। গোড়ার দিকে পাঁচ হাজার শ্রমিক ছিলেন এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, বর্তমানে সভ্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে বার হাজারেরও উপর।

এখানে রয়েছে একটি শিক্ষা ও রাজনৈতিক বিভাগ। এই বিভাগগুলির কাজ হল দেশের শ্রমিকদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চেতনা বাড়িয়ে তোলা।

এতে রয়েছে প্রমোদ বিভাগ। এর কাজ হচ্ছে খেলাধূলা, নাচ-গান অপেরা ইত্যাদি শ্রমিকদের মধ্যে পরিবেশন করা। আর রয়েছে একটা পাঠাগার। তাতে অনেকগুলো পড়ার ঘর রয়েছে। পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা হচ্ছে ৭৮ হাজার। গড়ে প্রায় দৈনিক তিন হাজার লোক এই পাঠাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পড়বার জন্য শত শত লোক এখানে সমবেত হয়।

স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত। সারা সাংহাই নগরে মোট শ্রমিক সংখ্যা পাঁচ লক্ষ সত্তর হাজার। এর যে কোন শ্রমিকই এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য হবার অধিকারী। কবি সাহিত্যিক শিল্পী প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীরাও সভ্য হতে পারেন। অবশ্য প্রত্যেককে তাঁদের নিজ নিজ সংগঠনের সদস্য-পত্র দেখাতে হবে।

মুক্তির পূর্বেকার চীনের কয়েকটি ছবিও আমরা এই সাংস্কৃতিক ভবনে দেখলাম—বিভিন্ন অবস্থায় শ্রমিক আন্দোলনের ছবি। আগের দিনে কলকারখানার মালিকেরা তাদের পোষা গুণ্ডা ও পুলিসের সাহায্যে কিভাবে ধর্মঘট ভাঙত তার বিভিন্ন পর্যায়ের ছবি। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ঐতিহাসিক সংগ্রামে যে সমস্ত বীর তাঁদের প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের বহু চিত্র দেখলাম। কয়েকটি বড় বড় 'শো কেস্'। তাতে রয়েছে শহীদদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র—যেমন নোটবুক, ফাউনটেনপেন ইত্যাদি। পুরানো আমলের বন্দুক, পিস্তল তলোয়ার, ছোরা ইত্যাদিও রয়েছে, আর রয়েছে রক্তমাখা ছেঁড়া প্যাণ্ট, জামা, টুপী প্রভৃতি রক্তাক্ত দিনের বহু গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সাক্ষ্য।

দেওয়ালের উপর ঝুলছে ৮।১০ ফিট্ উঁচু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মানচিত্র। এশিয়ার মানচিত্রের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম—ওঃ! কলকাতা থেকে আমরা এখন কতদূরে!

এছাড়া সারা দেওয়াল জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রচার পত্র; তা' থেকে সারা চীনদেশের চিত্র, কোথায় কিভাবে নতুন নতুন কলকারখানা স্থাপিত হচ্ছে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কি কি বিকাশ ঘটেছে, সব বোঝা যাবে।

তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে গেলাম চীনাদের জাতীয় তীর্থ সান ইয়াৎ-সেনের বাসভবনে। আমাদের গাড়ী বাসভবনের সম্মুখে এসে উপস্থিত হতেই, বাড়ীটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যাঁর উপর আছে, তিনি এসে আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। ছোট্ট দোতলা বাড়ী। পিছনের দিকে রয়েছে একটি ছোট মাঠ। উপর ও নীচের প্রত্যেকটি প্রকোষ্ঠে গিয়ে গিয়ে দেখেছি। ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের পড়ার ঘর, লাইব্রেরী ঘর, শয়ন কক্ষ, রাজনৈতিক কার্য পরিচালনার ঘর—সবই যেন তেমনই অবস্থায় রয়েছে। এমন কি তাঁর নিত্য-ব্যবহৃত জিনিসপত্রগুলো, যেমন, পোশাক-পরিচ্ছদ, বই-খাতা, দোয়াত-কলম বা তুলি ইত্যাদি এবং তাঁর কর্মবহুল জীবনের বিভিন্ন ঘটনার বহু চিত্র বর্তমান সরকার অতি যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে রক্ষা করে চলেছেন।

হোটেলে ফিরে খাওয়াদাওয়া সেরে তখুনি আবার বেরিয়ে পড়লাম শহরের এক প্রান্তসীমায় শ্রমিকদের জন্য তৈরি বিরাট এক কলোনি "সাও-ইয়াং ভীলা" দেখতে।

আমরা সেখানে পৌঁছতেই স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট অধিবাসী আমাদের অভ্যর্থনা করে ভিতরের দিকে নিয়ে গেলেন। স্থানীয় সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫১ সনে ২৬৭ হেক্টর (প্রায় ২০০০ বিঘা) জমি নিয়ে মাত্র এই সামান্য কিছুদিনের মধ্যেই এই বিরাট আবাসিক অঞ্চলটি তৈরি করা হয়েছে। এখানে আছে অতি আধুনিক ও মার্জিত-রুচিসম্পন্ন ১৬৭টি দ্বিতল পাকা বাড়ী। প্রত্যেকটি আবাসের এক একটি তলায় রয়েছে দু'টি করে পরিবার। মোট ১০০২টি পরিবার এখানে বাস করছেন। স্বাস্থ্যরক্ষার সমস্ত রকম সুব্যবস্থার দিকে নজর রেখেই এই বাসস্থানগুলো তৈরি করা হয়েছে। খোলা-মেলা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন

রাস্তাঘাট, বাড়ীঘরগুলির অধিকাংশের সামনেই রয়েছে ফুলের বাগান।

একটি প্রাইমারী স্কুলে তখন পড়ানো চলছিল। এমন সময় আমরা গিয়ে হাজির হলাম। ছাত্র বা ছাত্রী যে সবাই শ্রমিকের ছেলেমেয়েরাই হবে এ কথা বলাই বাহুল্য। স্থানীয় অধিবাসীরা সাগ্রহে তাঁদের পরিচ্ছন্ন গৃহাভ্যন্তরের যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রী দেখাতে লাগলেন।

কারো কারো মুখে এমন কথাও শুনলাম যে, আধুনিক ফ্যাসানের ইলেকট্রিকব্যবস্থা-যুক্ত বাসগৃহে, আসবাবপত্রের মধ্যে যে কোনদিন তাঁরা এমন একটি সুখী ও সুন্দর জীবন যাপন করতে পারবেন একথা মাত্র তিন বছর পুর্বেও তাঁরা ভাবতে পারেননি!

শিশুদের জন্য নার্সারী, খেলার মাঠ, পার্ক সব তৈরি হচ্ছে। আরও তৈরি হচ্ছে একটি সিনেমা বা অপেরা গৃহ।

কলোনির মধ্যে রয়েছে কো-অপারেটিভ স্টোর্স। স্থানীয় অধিবাসীরাই এর ৪০ হাজার শেয়ার ক্রয় করেছেন। রুটি, মাংস মাছ, ডিম, ঘি, তরিতরকারী, বাসন-কোশন, পোশাক-পরিচ্ছদ সবই এখানে মেলে।

জিনিসপত্রের দাম যাচাই করবার জন্য বিভিন্ন দোকানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমাদের টাকার হিসাবে তিন পো' আঙ্গুর বার আনা, এক ডজন ডিম সাড়ে এগার আনা ইত্যাদি। দাম দেখে মনে হচ্ছিল সবই কিনে নিয়ে আসি। প্রত্যেকটি দ্রব্যেরই দাম বাঁধা রয়েছে। সারা চীনদেশেই এখন "ঝোপ বুঝে কোপ" দেবার দিন অতীতের ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। সাংহাই শ্রমিকদের "বাসস্থান পরিকল্পনা" নামে স্থানীয় সরকার ১৯৫৩ সালের মে মাসের মধ্যে যে বিশ হাজার দ্বিতল গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা করেছেন, এই কলোনিটি তারই অন্তর্ভুক্ত।

সেখান থেকে ফিরে আসবার সময় আমাদের গাড়ীর সামনে স্থানীয় আবালবৃদ্ধ নরনারী বিপুলভাবে 'হো পিং ওয়ান সোয়ে' বলে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে লাগলেন। আমরাও 'চীন ভারত মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক' বলে তাঁদের প্রত্যাভিনন্দন জানালাম।

তারপর সেখান থেকে আমাদের গাড়ী সোজা চলে এল সরকারের নিজস্ব "১ নং প্রিণ্টিং এণ্ড ডাইং ফ্যাক্টরী"তে। ফ্যাক্টরীর ডাইরেক্টর শ্রীমতী মিং চু-ফাং আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। প্রথমে মনে করেছিলাম, পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সের মহিলা আবার কি কারখানা চালাবে! কিন্তু ভিতরে গিয়ে দেখি সে এক এলাহি কারবার! বিরাট ফ্যাক্টরী। কাজ করেন সবশুদ্ধ ১৪০০ শ্রমিক। তার মধ্যে আবার শতকরা দশজন মহিলা। একে একে সমস্ত বিভাগ পরিদর্শন করে এবং ওখানকার দু'একজন লোকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে বুঝলাম মহিলাটি সত্যই উপযুক্তা। ফ্যাক্টরীর যথেষ্ট উন্নতির সঙ্গে শ্রমিকদেরও যথেষ্ট উন্নতি তিনি সম্ভবপর করেছেন। শিক্ষা, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই শ্রমিকদের আজ অগ্রগতির পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এই মহিলা ডাইরেক্টরটি।

* * *

কিং কং হোটেলের দশ তলার উপর মনোজদা ও আমি একই কামরায় আছি। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা। দু'জন বসে বসে কলা আপেল ইত্যাদি ধ্বংস করছিলাম। একজন দোভাষী এসে খবর দিলেন 'সেণ্ট্রাল মিউজিকাল ইনষ্টিটিউশনের"এর প্রেসিডেণ্ট বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক কমরেড হো লু-তিন এসেছেন আমার সঙ্গে

সাক্ষাৎ করবার জন্য। তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এলাম। আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য খুবই ব্যগ্র ছিলাম। পিকিংএ বসে কমরেড লু-চি ও তিযেনসিনের শ্রেষ্ঠ গীতিকার ও সুরস্রষ্টা কমরেড চ্যাঙ্‌ লিং-এর কাছে এই বিজ্ঞ শিল্পীর প্রতিভা সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছি, যার জন্য আগে থেকেই এঁর প্রতি মনে মনে একটা প্রগাঢ় শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করে আসছিলাম।

হোটেলের বার-তলার উপর এক সুসজ্জিত কক্ষে আমরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হই। অমায়িক ব্যবহার ও আন্তরিক আলোচনার মধ্য দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আমাকে অতি আপনার করে নিলেন।

এই শিল্পীর জীবনের বিয়াল্লিশ বছরের মধ্যে পঁচিশটি বছর গেছে বহু ঝড় ঝাপটা দুঃখ-দৈন্যের মধ্য দিয়ে। যদি আমার কখনও সুযোগ-সুবিধে হয় তাহলে এই শিল্পীর কর্মবহুল জীবন নিয়ে আমি একখানি আলাদা বই লিখবার চেষ্টা করব।

চীন মুক্ত হবার বহু পূর্ব থেকেই 'সারা চীন গীতিকাব প্রতিষ্ঠানের' (অল চায়না মিউজিকাল ওয়াকার্স ফেডারেশন) সঙ্গে হো লু-তিন বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বর্তমানে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সাংহাই কেন্দ্রের সহ-সভাপতি। চীনের জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে চিয়াং-এর আমলে বিদেশী প্রভাবান্বিত অশ্লীল নাচগানের বিরুদ্ধে এই শিল্পীর সংগ্রাম চীনের প্রতিটি মানুষ আজ সশ্রদ্ধভাবে স্বীকার করে। চীন মুক্ত হবার পূর্ব থেকেই এই সুর-শিল্পীর সুর দেওয়া সঙ্গীত কি শহরে কি গ্রামে অধিকাংশ লোকের মনেই যেন ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করত। পিকিংএ একজন দোভাষী মহিলা, যিনি এই সুর-শিল্পীকে কখনও চোখে দেখেন নি, তাঁর

কাছে শুনেছি হো লু-তিনের সুর দেওয়া গানের রেকর্ড এককালে "গরম কেকের মত লোকেরা লুফে নিত।"

বর্তমানে চীনদেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক মুক্তিও ঘটছে—এবং বিস্ময়কররূপে তার অগ্রগতিও হচ্ছে। এই সাংস্কৃতিক অগ্রগতির নেতৃত্বের মধ্যে ওতপ্রোতরূপে জড়িয়ে আছেন এই নমস্য শিল্পী কমরেড হো লু-তিন। চীন বিপ্লবের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে জড়িত থেকে বহু ভুল-ভ্রান্তি, নানা রকম পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তিনি প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। এমন কি তখনকার দিনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তাঁদের শ্রেষ্ঠ নেতা মাও সে-তুং এর সঙ্গেও তাঁর আলোচনা করবার সুযোগ ঘটেছিল। সুতরাং এঁর সঙ্গে আলোচনা করে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করি।

লোক সঙ্গীত সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বললেন, যে শিল্পী তাঁর নিজের দেশের লোকসঙ্গীত পছন্দ করেন না, তিনি নিজের দেশকে ভালবাসেন কিনা সে বিষয়েই সন্দেহ আছে!

পাশ্চাত্য সঙ্গীত সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বললেন, কোন দেশের জাতীয় ভাষা বা সুর সে দেশের মালিক বা সাম্রাজ্যবাদীদের কেনা সম্পত্তি নয়। লোকসঙ্গীত ও ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীত সব দেশেই জনসাধারণের সম্পদ। আমরা মার্কিন বা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ঘৃণা করি, কিন্তু তাদের দেশের জনসাধারণকে আমরা পরম প্রীতি ও শ্রদ্ধার চোখেই দেখে থাকি। সুতরাং নিজেদের জাতীয় স্বকীয়তা বজায় রেখে যে কোন দেশের সঙ্গীত বা সুর আমরা গ্রহণ করতে পারি, যদি সেই সুরে তাদের দেশের জনগণের প্রাণ-স্পন্দন নিবিড়ভাবে ধ্বনিত থাকে।

পিকিংএ বসে আমার বহু শিল্পীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তাঁদের

জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলা হয়নি। আমাদের দেশের মতই একদিন তাঁদের দেশের শিল্পীদের চরম দুরবস্থার মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে হত। বর্তমানে আর তাঁদের আমাদের মত দিনের বেলা চটকল বা লোহা কারখানায় কাজ ক'রে, সন্ধ্যায় রেডিও বা থিয়েটারে গান বা অভিনয় করতে হয় না। সেখানকার শিল্পীরা সত্যই আজ মুক্ত। তাঁদের আর্থিক দুরবস্থা ঘুচে যাওয়ায় আজ সেখানকার প্রত্যেক শিল্পীই সাংস্কৃতিক অগ্রগতির কথা ভাবতে পারছেন।

সঙ্গীত শিক্ষার জন্য বেতন দেওয়া দূরে থাকুক, নতুন শিক্ষার্থীরা বরং অধিকাংশ উল্টে মাসোহারা পেয়ে থাকেন। গ্রামে গ্রামে গিয়ে শিল্পীবা লোকসঙ্গীত সংগ্রহ ক'রে আরও উন্নততর ভাবে দেশের লোককে তা পরিবেশন করছেন। সাধারণ মানুষেরাও আজ লোকগীতি বা তাঁদের ক্লাসিক্যাল নাচ গান সাদবে গ্রহণ করছেন।

বর্তমানে শিল্পীরা রেডিও, রেকর্ড, অপেরা এবং ফিল্মেব সঙ্গেই শুধু সংশ্লিষ্ট নন, তাঁরা আজ শহরে ও গ্রামের সাংস্কৃতিক ভবনে কলকারখানা ও যৌথ খামারের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে গিয়ে নাচ গান শুনিয়ে আনন্দ ও কর্মপ্রেরণা যোগাচ্ছেন—সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দেবার দায়িত্বে, জনসাধারণের প্রতিটি আন্দোলনে, চাষীদের অধিক ফসল ফলাবার কার্যে এবং শ্রমিকদের আরও দুর্বার গতিতে দেশের সম্পদ বৃদ্ধির অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তুলতে! শিল্পীরা আজ বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করছেন এবং কৃতিত্বের সঙ্গে তা পালন করেও চলেছেন। গানের কথা, সুর ও ভঙ্গিমায় আজ অতি দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। শিল্পীদের কাছ থেকে প্রতিটি মানুষ শুধু আর আনন্দই পাচ্ছেন না—কিছু না কিছু শিক্ষাও গ্রহণ করছেন।

এই যে সারা চীনদেশব্যাপী আন্দোলন চলেছে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে, শিল্পীরা তাতে বিশেষভাবে সাহায্য করছেন বলেই না আজ নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা আশ্চর্যজনকভাবে কমে আসছে? শান্তি আন্দোলন বর্তমানে চীনের ব্যাপকতম আন্দোলন। কত গীত, কত নৃত্য, কত অপেরাই না এই শান্তির বিষয়বস্তু নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যার ফলে সারা চীনদেশের প্রতিটি মানুষকে টেনে আনা গেছে এই আন্দোলনের মধ্যে। অবশ্য সে দেশের জনসাধারণ ও সরকার অতি শ্রদ্ধার সঙ্গেই তা স্বীকার করেন, এবং তার মূল্যও দিয়ে থাকেন।

সেইজন্যই দেশের পুনর্গঠন কার্যে এবং সংখ্যালঘু জাতির সমান অধিকার ও ঐক্যের নীতিকে বাস্তব পরিকল্পনায় সার্থকরূপ দান করতে শিল্পীরা আজ বিশেষভাবে এগিয়ে এসেছেন।

সাংহাই ডক

পরের দিন ২৩শে অক্টোবর। সকালের দিকে গেলাম সাংহাইয়ের বিখ্যাত ডক দেখতে। স্থানীয় ডক মজুরেরা আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। একটি জাহাজে উঠলাম। ওঠা মাত্র একদল জাহাজী শ্রমিক হাততালি দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে লাগলেন। জাহাজের ছাদে মাস্তুলের কাছে ছোট্ট জায়গাটিতে উঠলাম। যতদূর দৃষ্টি যায় নদীর দু'পাশে শত শত জাহাজ রয়েছে নোঙর ফেলে। অবশ্য যুদ্ধ জাহাজ নয়, সবই প্রায় বাণিজ্য জাহাজ। সোবিয়েৎ বা নয়া গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের জাহাজগুলির মধ্যে একখানা বৃটিশের জাহাজও রয়েছে।

কলকাতার খিদিরপুর ডক আমি বহুবার দর্শন করেছি। হয়তো কোন দিন গঙ্গা নদীর উপর দিয়ে যাচ্ছি ছোট্ট একটি স্টীমারে করে। খিদিরপুর ডকের উপর সবে সন্ধ্যার কালছায়া নেমে আসছে। শত শত

জাহাজ, মাস্তুলে নিশান উড়ছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের। বিমোহিত হয়ে প্রকাণ্ড ডক-এর পরিবেশ বা জাহাজগুলোর দৃশ্য উপভোগ করছি, আচম্‌কা আমার মোহ ভেঙে গেল—শতাধিক বর্ষব্যাপী বিদেশী ঐ জাহাজগুলোই না আমাদের দেশের ধনসম্পদ বোঝাই করে উদ্ধতভাবে মহাসমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছে? তাই না আজ আমাদের দেশের রিক্তা লক্ষ্মীছাড়া মূর্তি।......

কিন্তু সাংহাই ডকের একটি জাহাজের উপর উঠে আমি পরম স্বস্তি বোধ করেছি। এশিয়ায় এমন দেশও তাহলে আছে, যেখানে বিদেশী বাণিজ্য জাহাজগুলো সে দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করার কোন সুযোগই আর পাচ্ছে না। যে কোন দেশের জাহাজ এই সাংহাই ডকে এসে নোঙর ফেলতে পারে যদি সম মর্যাদা ও পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তি মেনে নিয়ে আসতে রাজী থাকে।

এ বিষয় আমেরিকান বণিকদের থেকে বৃটিশ বণিকদের সূক্ষ্ম বুদ্ধি তারিফ করার মত। চিয়াং কাইসেক সরকারের "ডিসেম্বর মাসের একত্রিশ তারিখ" বহুপূর্বেই শেষ হয়ে গেছে। কাজে কাজেই চিয়াং-এর পুতুল সরকার নিয়ে মাতামতি করে কোন ফয়দা নেই বুঝেই, নতুন চীন সরকারকে স্বীকার করে শেষ বাজারে যা কিছু পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকা বুদ্ধিমানের কাজ বলে বৃটিশ বণিকেরা মনে করেছে। পূর্বেই বলেছি, বৃটিশ জাহাজ একটি সাংহাই বন্দরে দেখেছিলাম বটে।

জেড পাথরের বুদ্ধ মন্দির

তারপর সেখান থেকে এলাম সাংহাই-এর সুবিখ্যাত "জেড পাথরের বুদ্ধ মন্দির" পরিদর্শন করতে। সেখানে উপস্থিত হওয়ামাত্র

সেই মন্দিরের পুরোহিতেরা আমাদের সাদরে মন্দিরের ভিতরে নিয়ে গেলেন। মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ খুবই সুন্দর, সুসজ্জিত ও কারুকার্য-খচিত। মন্দিরের পুরোহিতদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, সেখানকার সরকার এই মন্দিরের বিষয় কোন অনধিকার হস্তক্ষেপ করা তো দূরের কথা—অধিকন্তু যাতে এই মন্দিরের কারুশিল্প ও তার অভ্যন্তরের সুন্দর বুদ্ধমূর্তিগুলি সযত্নে সুরক্ষিত হয়, তার জন্য সর্বপ্রকারের সাহায্যের ব্যবস্থাই করে থাকেন।

আমাদের দেশের বহুল প্রচারিত দু' একখানি পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পাঠ করে এমন একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মেছিল যে রাশিয়া কিংবা চীনে ধর্ম ব'লে কিছু নাই। সবই অধার্মিকের মেলা।

চিয়াং সরকারের আমলে নাকি চীন দেশটা ধার্মিকদেরই দেশ ছিল। যদিও সেই আমলে আমার চীন পরিদর্শনের কোন সুযোগ ঘটেনি, তৎসত্ত্বেও পূর্বেকার দিনের আবহাওয়া আমার জানতে বা বুঝতে বেশি বেগ পেতে হয়নি। সারা দেশময় ছিল চুরি ডাকাতি রাহাজানি। এক ধর্মাবলম্বী লোকেরা অপর ধর্ম সম্প্রদায়ের সঙ্গে দাঙ্গা করত। লুট, অগ্নি-সংযোগ ইত্যাদি ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। তারপর তখনকার দিনের কালোবাজারের কথা। ওটা ছিল তখনকার দিনের মহাপুণ্যের কাজ—সমাজের যে কোন 'প্রতিষ্ঠাবান' ব্যক্তিই এই মহৎ কার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এমন কি বহু যাজকেরা পর্যন্ত।

তারপর চীনে বিপ্লব সমাধা হল 'নাস্তিক রাজ' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। রাতারাতি চুরি ডাকাতি ঠক্ রাহাজানি বন্ধ হয়ে গেল। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার অবসান ঘটল। সারা দেশময় মানুষেরা যেন আজ উদ্দীপিত হল আমাদের রবীন্দ্রনাথের

সেই গানের ভাষায়--"জীর্ণ পুরাতন যাক্ ভেসে যাক্"। শান্তির এক নতুন আবহাওয়া সারা চীনের আকাশে বাতাসে পরিব্যাপ্ত হল। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত 'ধর্মরাজ্য'গুলি থেকে তারস্বরে আর্তনাদ শুরু হল—গেল, গেল, ধর্ম গেল! সারা এশিয়া বুঝি নাস্তিকেরা গিলে ফেলল।

তা'হলে আরও শুনুন চীনের 'নাস্তিক'দের কাণ্ডকারখানাটা একবার। গত যুদ্ধের সময় জাপানীদের নির্বিচারে বোমা-বর্ষণের ফলে চীনের বহু বুদ্ধ-মন্দির, মসজিদ এবং চার্চ ধ্বংস অথবা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 'ধর্মরাজ' চিয়াং কাই-সেক এসব পবিত্র ধর্মস্থানগুলোর পুনঃসংস্কার করার কোন প্রয়োজন বোধ করেন নি। কিন্তু 'নাস্তিক' সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই কোটি কোটি ইয়ান বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সংগঠনের হাতে তুলে দিলেন—ধর্মস্থানগুলির উন্নতির জন্য।

এই প্রসঙ্গে পিকিং থাকাকালীন একটা ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তান থেকে যে তিরিশজন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করতে গিয়েছিলেন। তাঁরা সবাই আমাদের সঙ্গে একই হোটেলে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিও ছিলেন। তাঁদের মুখে শুনেছি, তাঁরা যে মসজিদে নমাজ পড়তে যেতেন, জাপানীদের দ্বারা তা বিধ্বস্ত হবার পর বহুদিন পর্যন্ত মসজিদটি প্রায় ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে থাকে। নতুন সরকার বিপুল পরিমাণ অর্থ-সাহায্য করায় মসজিদটি আক্রমণ-পূর্ব অবস্থার চেয়েও আজ অনেক সুষ্ঠুরূপ ধারণ করেছে।

যাক, সেই বুদ্ধ-মন্দিরেই আসা যাক্ আবার। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত, আমাদের প্রকাণ্ড দু'মহল বাড়ীর প্রত্যেকটি কামরায় নিয়ে

নিয়ে দেখাতে লাগলেন। কয়েক শতাব্দী পুর্বের ভারতীয় ধর্মগ্রন্থও রয়েছে দেখলাম।

আর যাঁরা সব পুরোহিত ছিলেন, ফিরে আস্‌বার সময় সবাই রাস্তা পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এসে "হোপিং ওয়ান সোয়ে" বলে আমাদের বিদায় দিলেন।

* * *

তারপর গেলাম সরকারের নিজস্ব "১ নং কাপড় কল" দেখতে। সেখানে যেতেই মিলের পরিচালক কমরেড লি স্থ-সেন আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। প্রকাণ্ড কারখানা। চার হাজার শ্রমিক কাজ করেন। তার ৭০ ভাগই হচ্ছেন মেয়ে শ্রমিক। মুক্তির পুর্বে কারখানাটির পরিধি এত বিরাট ছিল না। শ্রমিক সংখ্যাও ছিল নিতান্ত নগণ্য। শ্রমিকদের বাসস্থান বা শিক্ষা ব্যবস্থার কোন বালাই ছিল না। বিশেষ করে মেয়ে শ্রমিকদের চূড়ান্ত অত্যাচার সহ্য করতে হত। পুরুষদের তুলনায় মাইনে ছিল তাদের অনেক কম; আবার তার উপর কেউ সন্তানসম্ভবা হলে, কার্যে অক্ষম ব'লে তাড়িয়ে দেওয়া হত।

কিন্তু বর্তমানে মেয়ে এবং পুরুষ শ্রমিকদের মাইনের কোনো তারতম্য নেই। প্রত্যেক শ্রমিকের মাইনে বেড়েছে শতকরা ৬২ ভাগ। তা ছাড়া শ্রমিকদের জন্য বহু রকম সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন, ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য শ্রম বীমার ব্যবস্থা করা হয়েছে—তার জন্য শ্রমিকদের কোন টাকা দিতে হয় না; নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য শ্রমিকদের আট ঘণ্টা কর্ম-কালের মধ্যে দু'ঘণ্টা কারখানাতেই শিক্ষাদানের সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম দু'ঘণ্টা লেখাপড়া করে তারপর কারখানার কাজ শুরু করতে হবে;

কারণ সারাদিন কারখানার কাজ করার পরে লেখাপড়া করবার স্পৃহা বা উৎসাহ না থাকাই স্বাভাবিক।

ঘুরে ঘুরে কারখানা দেখছি। তুলো পেঁজা হচ্ছে। ঘড় ঘড় শব্দে কলের 'চরকা' সুতো কাটছে। তা থেকে কাপড় তৈরি হচ্ছে। শত শত মেয়ে নিবিষ্টমনে, কী উৎসাহের সঙ্গেই না কাজ করে চলেছে!

শ্রমিকদের জন্য হালে কতকগুলি আধুনিক ফ্যাসানের বাসস্থান তৈরি করা হয়েছে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সব রকম ব্যবস্থাই করা হয়েছে। মেয়ে শ্রমিকদের জন্য বিশেষ কতকগুলো সুযোগ রয়েছে। যেমন প্রসবের পুর্বে ও পরে মাইনে-সহ ছুটি। কোলের শিশু রেখে কারখানায় গিয়ে যাতে কাজ করতে পারে তার জন্য একটি শিশু-লালনাগার রয়েছে। সেখানে গিয়ে দেখলাম মায়ের অনুপস্থিতিতে অভিজ্ঞ নার্স বা ধাত্রী এইসব শিশুদের মাতৃস্নেহে লালন-পালন করছেন।

মায়েরা কাজে ঢোকবার সময় এই শিশুকেন্দ্রে দু'বছরের নিম্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের রেখে যান, আর কাজের শেষে যে যার সন্তান নিয়ে ঘরে ফেরেন। শিশু লালনাগারে শিশুদের স্বাস্থ্যের দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়।

এককালে সাংহাই ছিল আন্তর্জাতিক চুক্তি-প্রতিষ্ঠ বন্দর। এই বন্দরে বহুকাল থেকে বৃটিশ বণিকেরাই বিশেষভাবে আধিপত্য বিস্তার করে আসছিল। তাদের ভোগবিলাস ও উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার ব্যবস্থা ছিল ষোলকলায় পরিপূর্ণ। এক বৃটিশ বণিক নিজের ব্যবসায়ের মতলবে একটি 'রেস কোর্স' অর্থাৎ ঘোড়া বা কুকুর দৌড়ের মাঠ তৈরি করে। গত যুদ্ধের সময় জাপানীরা সাংহাই দখল করে এই মাঠটিকে মিলিটারী ক্যাম্প হিসাবে ব্যবহার করে। জাপানের আত্মসমর্পণের পর মার্কিন

সৈন্যেরা এসে বেশ জাঁকিয়ে বসে। অশ্লীল নৃত্যগীত, হলিউডী চলচ্চিত্র আর মদের আসরের উদ্দাম কেন্দ্র হয়ে ওঠে এই স্থানটি।

মুক্তির পর ১৯৫১ সালের গ্রীষ্মকালে চীনের নতুন সরকার এই রেসের মাঠে স্বদেশী জিনিসের এক বিরাট প্রদর্শনী খোলেন। বর্তমানে এই মাঠের সঙ্গে আরও ২২৫ মাউ জমি যুক্ত করে তৈরি করা হয়েছে 'জনতা-বাগ' ('পিপলস পার্ক')। সাংহাই-এর সব থেকে সেরা পার্ক এটি, গান-বাজনার কেন্দ্র, সাঁতার কাটবার পুকুর এবং খেলাধূলার মাঠ ইত্যাদি বহুরকম ব্যবস্থাই করা হয়েছে এই পার্কের বিভিন্ন অংশে। জাতীয় দিবস কিংবা মে দিবসের বড় বড় উৎসবগুলো আজকাল এই পার্কেই সুসম্পন্ন হচ্ছে।

* * *

পরের দিন ২৪শে অক্টোবর। সকালে গেলাম একটি "শিশু কল্যাণ" নার্সারী দেখতে। দুবছর থেকে সাত বছর বয়সের ছেলে-মেয়েরা রয়েছে এখানে। আমরা যেতেই কয়েকজন মহিলা—যাঁরা এই নার্সারীটি পরিচালনা করেন—অতি আগ্রহ-সহকারে আমাদের সবকিছু দেখিয়ে দিতে লাগলেন। চীন মুক্ত হবার পুর্বে এ ধরনের কোন প্রতিষ্ঠান সে দেশের মানুষেরা কল্পনাতেই আনতে পারে নি।

আমরা যাবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই ছোট্ট রকম একটি জলসার অনুষ্ঠান করা হল। অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারী দু'থেকে ছ'বছরের কয়েকটি বালক বালিকা আমাদের বিস্মিত করে দিল। কী সুন্দর তাদের শিক্ষা! বাল্যকাল থেকেই অধ্যবসায়ী ও সৎ। মানুষকে শ্রদ্ধা করতে বা ভালবাসতে শিক্ষা দেওয়া হয় নাচ গানের মাধ্যমে।

ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও ব্যায়াম পদ্ধতি অতি অভিনব। ঘণ্টা

পড়লে খেতে যাওয়া, ঘণ্টা পড়লে ঘুমোতে কিংবা খেলাধূলা করতে যাওয়া ইত্যাদি নিয়মকানুনগুলো তারা সানন্দে পালন করছে। নতুন শিক্ষাপদ্ধতির আওতায় শিক্ষিত হৃষ্টপুষ্ট, হাসিখুশি বালক-বালিকাদের দেখে কী আনন্দটাই না পেয়েছিলাম সেদিন!

সাংহাই মেডিক্যাল কলেজ

'শিশু লালনাগার' দেখবার পরে গেলাম সাংহাই মেডিক্যাল কলেজ দেখতে। এই প্রতিষ্ঠানটি যে কত বিরাট তা না দেখলে কল্পনা করাও অসম্ভব। আমরা সেখানে উপস্থিত হতেই কলেজ প্রাঙ্গণের পথের দু'পাশে দাঁড়িয়ে শত শত ছাত্রছাত্রী আমাদের বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানাল।

কলেজের অধ্যক্ষ ও বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক-চিকিৎসকগণ অভ্যর্থনা করে সমস্ত বিভাগগুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন। চীন মুক্ত হবার পুর্ব সময় পর্যন্ত, অর্থাৎ চিয়াংএর আমলে, একুশ বছরে এই কলেজ থেকে সবশুদ্ধ গ্রাজুয়েট হয়েছিলেন ৫৪৬ জন। কিন্তু মাত্র এই তিন বছরে, নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার পর ১০৩৭ জন গ্রাজুয়েট হয়েছেন। কলেজের সভাপতি জানালেন, ১৯৫৫ সালের মধ্যে আরও পাচ সহস্র ছাত্র গ্রাজুয়েট হবেন।

অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে আরও শুনলাম এই কলেজ থেকে একটি মেডিক্যাল মিশন (চিকিৎসকদল) বর্তমানে কোরিয়া রণাঙ্গনে চীনা গণ-স্বেচ্ছাসেবীদের সঙ্গে রয়েছেন। অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত একদল সেরা ছাত্র খুব সাফল্যের সঙ্গেই তাঁদের কর্তব্য সমাধান করছেন।

আমাদের সঙ্গে ছিলেন জব্বলপুরের বিখ্যাত ডাক্তার ডিসিলবা। তাঁকে লক্ষ্য করলাম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সব দেখছেন। তিনি বললেন

এক্স-রে বা অন্যান্য সব যন্ত্রপাতি প্রায় সবই নতুন ও আধুনিক। যে কোন দুরারোগ্য ব্যাধিরই সুচিকিৎসা এই কলেজে করা সম্ভব।

হাসপাতালের বেডের সংখ্যা পাঁচশত। হঠাৎ রোগীর সংখ্যা বেড়ে গেলে, সঙ্গে সঙ্গেই যাতে আরও বেডের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় তারও ব্যবস্থা রয়েছে।

আমাদের দেশে গরীব লোকদের পক্ষে হাসপাতালের বেড সংগ্রহ করা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। আমাদের এই কলকাতা শহরেই বিনা চিকিৎসায়—যারা হাসপাতালের দরজা পর্যন্ত আসবার সুযোগও পায় না এমন কত রোগীর যে মৃত্যু ঘটছে তার হিসাব কেউ রাখছে কিনা জানি না।

চীনের অবস্থা এককালে ঠিক এমনই ছিল। বর্তমানে সারা চীনের জনস্বাস্থ্য পরিকল্পনা (পিপ্‌লস হেল্‌থ সার্ভিস্) অনুযায়ী দেশের চিকিৎসা-ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

গত ৬৯ বছর ধরে পুরানা চীনে চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ষোল হাজার-এরও কম ছিল। পুরানো পদ্ধতি অনুসারে যদি এই বিদ্যাশিক্ষাকে তখনো চালানো যেত তাহলে আজ হতে তিনশ বছর পরেও ডাক্তারের সংখ্যা অতি অল্পই থেকে যেত। সেজন্যেই পুরানো নিয়মের একটা আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন হয়েছিল—তা না হলে দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি দ্রুততর গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব হত না।

গত দু'বছর ধরে উচ্চতম চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিদ্যালয়গুলোতে অল্প সময়ে বেশী শিক্ষাদান পদ্ধতির ধারা প্রবর্তিত কবা হয়েছে। যার ফলে ১৯৫০ সালের অপেক্ষা ১৯৫১ সালে নতুন ছাত্র বা শিক্ষানবিশের সংখ্যা প্রায় পাঁচগুণ বেড়ে গেছে। ১৯৫১ সালের

শেষভাগ দিয়ে বিভিন্ন চিকিৎসা-বিদ্যালয় ও ঔষধ-প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান-গুলিতে প্রায় ২৫,০০০ ছাত্রের সমাগম হয়েছে। এবং এদের সংখ্যা, গত ৬৯ বছর ধরে যত ছাত্র এই বিদ্যায় উপাধি লাভ করেছিল, তাদের চেয়েও শতকরা ৫৬ ভাগ বেশী।

পূর্বে চীনকে তার স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে চিকিৎসা বিজ্ঞান সর্বপ্রকার বিষয়ে বিদেশী ঔষধ ও যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর করে থাকতে হত। কিন্তু গত দু'বছর ধরে চীনের গণতন্ত্রী সরকার এই চিকিৎসা বিজ্ঞানের যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য নির্মাণে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। ১৯৫০ সালে প্রায় সত্তরটিরও অধিক ঔষধের কারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত ক'রে সরকার তাঁদের নিজের পরিচালনায় নিয়ে এসে জনসাধারণের অধিকতর কল্যাণের কাজে নিয়োজিত করেন।

চীনের জাতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতি-বিধানকল্পে। কেন্দ্রীয় সরকার দুটি গবেষণা-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

তা ছাড়া স্বাস্থ্যের উপর বিভিন্ন প্রকারের বক্তৃতা দিয়ে, বেতারের মাধ্যমে প্রচার ক'রে ও স্বাস্থ্যের বিভিন্ন প্রদর্শনী দেখিয়ে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রথা রয়েছে।

পুরাতন চীনে চিকিৎসা কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা শুধু অপ্রচুরই ছিল তা নয়, সমগ্র দেশব্যাপী তাঁরা ছড়িয়ে ছিলেন একান্তই অসমানভাবে। শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ চিকিৎসকই ছোট ও বড় শহরগুলিতেই থাকত—ফলে গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসীই আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত থাকত।

১৯৫০ সালে নতুন সরকার নিম্নতম চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে তাদের সংস্কার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন এবং গ্রামে গ্রামে ও শহরে শহরে নতুন করে আধুনিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা

ব্যবস্থা-গড়ে তুললেন—যার ফলে প্রত্যেকটি লোকই অতি আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার সুযোগ পেতে পারে।

দেশজোড়া বহুবিস্তৃত প্রতিরোধমূলক ও আরোগ্যমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে শহর ও গ্রামের জনসাধারণের স্বাস্থ্যের বিপুল উন্নতি ইতিমধ্যেই সাধিত হয়েছে।

ভূস্বর্গ হ্যাংচৌ

সেদিন বেলা ২টায় ট্রেনে রওনা হয়ে রাত্র সাড়ে আটটায় গিয়ে পৌঁছলাম হ্যাংচৌ শহরে। হ্যাংচৌ-এর প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। স্থানটিকে চীনের ভূস্বর্গ বলা হয়।

প্রায় ১৫ মাইল লম্বা একটি হ্রদ। হ্রদের চতুর্দিকে অসংখ্য পাহাড়। হ্রদটির তিনদিক ঘিরে রয়েছে বিচিত্র এই নগরটি; পাহাড়গুলির গায়ে গায়ে অসংখ্য ঘরবাড়ী।

এখানেও স্টেশনে আমাদের প্রথম অভ্যর্থনা করে 'পাইওনিয়ার' বালক বালিকা এবং শান্তি কমিটির বিশিষ্ট সভ্যবৃন্দ। হ্রদের একেবারে কিনারেই একটি মনোরম ভবন—সরকারী অতিথিশালা; সেখানেই আমাদের থাকবার ব্যবস্থা।

তারপর শান্তি সংসদের নেতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সে দেশের প্রথা অনুযায়ী পঁচিশ রকমের চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়ের একটি ভোজানুষ্ঠান সমাধা করলাম।

পিকিং থাকাকালীন স্থানীয় শান্তি সংসদ থেকে ১০।১৫ সের ওজনের একটি ওভারকোট উপহার পেয়েছিলাম। হোটেলের নিজ কামরায় বসে প্রথম যখন কোটটি গায়ে জড়িয়ে প্রকাণ্ড আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালাম তখন নিজেকে একটা ভল্লুক বলেই মনে হয়েছিল

আর কি ! অবশ্য সেদিন এই কোটটার গুরুভার টের পেলেও, গুরুত্ব টের পাইনি। গুরুত্ব টের পেলাম কিছুদিন পরে—এই হ্যাং চৌয়েই গিয়ে। প্রচণ্ড শীত। বোধহয় সেদিন ৩০ ডিগ্রির নীচেই ছিল শীত-তাপ পরিমাপ-যন্ত্রের কাঁটাটা। হাড়গুলো পর্যন্ত জমে যাবার জোগাড়। কিন্তু বাঁচালো সেই ওভারকোট।

মোটা ওভারকোটটি গায়ে জড়িয়ে দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। সম্মুখে বিস্তীর্ণ হ্রদ। তার তীরে বা মাঝখানের দ্বীপে, পাহাড়ের উপর বা নীচে অসংখ্য আলো যেন রঙ্‌বেরঙের মুক্তার মালা হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। তার প্রতিবিম্ব পড়েছে হ্রদের জলে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য ! আরও কিছুক্ষণ উপভোগ করা চলত যদি শীতের প্রচণ্ডতা কিছু কম হত।

* * *

পরের দিন সকাল আটটায় প্রাতরাশ সেরে হ্রদের ধারে নেমে এলাম। ঘাটে বাঁধা রয়েছে অসংখ্য নৌকা। আমাদের সঙ্গে পাঁচ ছ'জন দোভাষী ছাড়া আরও রয়েছেন শান্তি সংসদের কয়েকজন নেতা ও স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। এক একজন দোভাষী নিয়ে চারজন করে নৌকায় আলাদা আলাদা ভাবে উঠলাম।

নৌকাগুলির ছাউনী নেই; মাঝি অধিকাংশই মহিলা। চারজন কি ছ'জন লোক খুব আরামে বসতে পারে এরকম দুটি করে সোফা পাতা রয়েছে মুখোমুখি ভাবে। সোফা দুটির মাঝে একটি টেবিল। টেবিলের উপর আপেল, কমলা, কলা ইত্যাদি ফলের পাহাড়। প্লেটভর্তি চকোলেট্ আর ফ্লাস্কে ভর্তি রয়েছে সবুজ রংএর চা (গ্রীন টি)।

মনোজদা, আমি এবং একজন দোভাষী মেয়ে এক নৌকায় চলেছি মন ভোলানো দৃশ্য দেখতে দেখতে। নৌকা চালাচ্ছিলেন একজন স্বাস্থ্যবতী তরুণী।

হ্রদের মধ্যেই একটি ছোট দ্বীপ। তার খুব নিকটেই তিনটি প্যাগোডা জল ফুঁড়ে নাক জাগিয়ে রয়েছে। নৌকা থেকে দ্বীপটির মধ্যে নামলাম। নানারকম গাছপালায় ভর্তি অতি সুন্দর একটি উদ্যান। মনে হয় একটি বোটানিকাল গার্ডেন। পাথরে বাঁধান বেদী। অবসর বিনোদনের কত রকম ব্যবস্থাই না রয়েছে! অদ্ভুত রকমের একটি সাঁকো পেরিয়ে এলাম দ্বীপের অপর প্রান্তে। এতক্ষণে আমাদের নৌকাগুলোও ঘুরে এসে এই ঘাটে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছে।

সবাই মিলে আবার নৌকায় চড়লাম। নৌকা এসে ভিড়ল আর একটি ছোট দ্বীপে। সেখানে রয়েছে শ্রমিকদের জন্য একটি আদর্শ বিশ্রামাগার। চতুর্দিকে জল। গাছপালা, লতাগুল্ম এবং কৃত্রিম পাহাড় ও ঝরণা দিয়ে সাজান-গোছান এই মনোরম স্থানটি। চীন মুক্ত হবার পূর্বে অতি উচ্চ শ্রেণীর ধনী ব্যবসায়ী, পদস্থ সামরিক ও বে-সামরিক অফিসারদের মৌজ-স্ফূর্তি, ভোগ-বিলাসের জন্যই স্থানটি ব্যবহৃত হত। এটি বর্তমানে শ্রমিকদের আদর্শ স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত হয়েছে। আমরা নৌকা থেকে নামতেই কয়েকজন শ্রমিক আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। সেই সময়টায় একদল রেলওয়ে শ্রমিক অবসরের দিনগুলি উপভোগ করতে এসেছিলেন এই স্বাস্থ্যনিবাসে। দেখলাম চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন। রেডিও, গ্রামোফোন, বিভিন্ন রকম বই-পত্রিকা, নানা রকম খেলাধূলার দ্রব্য-সামগ্রী প্রভৃতি কোন কিছুরই অভাব নেই।

সুন্দর দোতলা বাড়িটির প্রত্যেকটি কামরায় গিয়ে গিয়ে আসবাব পত্রগুলো দেখতে লাগলাম। এমন ধবধবে ধোপদুরস্ত বিছানা-বালিশ-লেপ আমাদের দেশের অনেক ধনী ব্যক্তিরও ব্যবহারের সৌভাগ্য হয় কিনা সন্দেহ।

তারপর আবার নৌকায় উঠলাম। পাশাপাশি আট-দশখানি নৌকা। এবার আমাদের নৌকায় উঠেছেন স্থানীয় একজন অভিনেতা। তিনি আবৃত্তি করতে লাগলেন; পাশের নৌকা থেকে শ্রীমতী মেহ্‌তা গান ধরলেন, তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন শ্রীমতী পেরিন। যেমন চিত্তাকর্ষক স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য তেমনি উপভোগ্য এই নৌকা-বিহার। আমাদের নৌকার আশেপাশে আরও অনেক নৌকা ভ্রমণ-বিলাসী যাত্রীদের দ্বারা বোঝাই হয়ে চলছিল।

নৌকা এসে থামল ডাঙায়। একটি রমণীয় উদ্যান। তার মধ্যে রয়েছে একটি ছোট চতুষ্কোণ পুকুর। তাতে সহস্র সহস্র লাল মাছের খেলা উপভোগ করবার মত। উদ্যান পরিভ্রমণ করে প্রশস্ত রাস্তায় এসে পড়লাম। একখানি বাস আমাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে। তাতে চেপে গেলাম সেখানকার বিখ্যাত প্যাগোডা দেখতে।

* * *

সেই বাসে চেপেই আবার সরকারী বাসভবনে ফিরে এলাম। সময় নষ্ট না করে আবার বেরিয়ে পড়লাম বাজারের দিকে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট দোকানপাট।

একটি সিল্কের দোকানে সবাই হুড়মুড় করে ঢুকলাম। বিভিন্ন ডিজাইনের রঙবেরঙের সব উৎকৃষ্ট চীনা সিল্ক—চীনাংশুক। দেখে চোখ যেন ঝলসে যায়। আমরা প্রায় সবাই কিছু কিছু কিনলাম।

আমাদের দেশের তুলনায় আশ্চর্যজনকভাবে সস্তা। প্রচুর সিল্ক এখানে তৈরি হয়। স্থানটি সিল্ক বা ব্রকেড উৎপাদনে স্থান হিসাবে সুবিখ্যাত।

দুপুরের ভোজনপর্ব শেষ করে গেলাম সেখানকার শিল্পপ্রদর্শনী দেখতে। প্রকাণ্ড স্থান জুড়ে এই প্রদর্শনী। চীন দেশের প্রত্যেকটি নগরেই দেখেছি স্থায়ীভাবে একটি করে প্রদর্শনী খোলা আছে। এসব প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্যই হল প্রত্যেকটি প্রদেশ বা এলাকার মধ্যে কোথায় কিভাবে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে সে সম্পর্কে বাস্তব তথ্যাদি পরিবেশন করা।

পূর্বে পাট বা পাটের তৈরি দ্রব্যাদির কোন উৎপাদন সে দেশে অতি সামান্যই ছিল। বিপ্লব ঘটবার পরে সেখানকার সরকার জানতেন ভারত ও পাকিস্তান 'স্বাধীন' হলেও নিজেদের ইচ্ছামত সমাজতন্ত্রী বা নয়া গণতন্ত্রী দেশে পাট সরবরাহ করবার স্বাধীনতা তাদের নেই। কাজে কাজেই চীন সরকার পাটচাষের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। বর্তমানে চীনে কোন পরিকল্পনাই কার্যকরী হতে বেশি সময়ের দরকার হয় না। এ ক্ষেত্রেও তাই। হাজার হাজার বিঘা জমিতে আজ প্রচুর পাট চাষ হচ্ছে।

এই প্রদর্শনীতে দেখেছি—ছোট একটি কলে চট তৈরি হচ্ছে। তারপর আবার সেই চট আর একটা কলের মধ্যে প্রবেশ করে থলিতে পরিণত হচ্ছে। দু'জন শ্রমিক মেশিন তদারক করছিলেন। আর একটা ভারী মেশিনে দেখলাম, ব্রকেড তৈরি হচ্ছে। এখানে আরও দেখলাম সিগারেট তৈরি ও কাগজ তৈরির যন্ত্র। রেল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি নানাবিধ যন্ত্রের বহু নমুনাও এখানে দেখলাম।

সেখান থেকে একটু এগিয়েই গেলাম যাদুঘর দেখতে। সেখানকার

তৈরি কুটির শিল্প খুবই বিস্ময়কর। হ্যাংচৌ চারু ও কারু শিল্পের জন্য চিরদিনই বিখ্যাত ছিল। বর্তমান লোক সরকারের অকৃপণ সাহায্য ও ঐকান্তিক উৎসাহে কুটির শিল্প প্রসার লাভ করেছে ছ' গুণেরও বেশি।

স্থানীয় শান্তি কমিটির তরফ থেকে আমরা যে সব উপহার পেয়েছিলাম সেগুলি সবই ওখানকার কুটির শিল্পে তৈরি। তার মধ্যে বাঁশের তৈরি সুন্দর চমকপ্রদ ছাতা, হাতীর দাঁতের বুদ্ধ-মন্দির, চন্দন কাঠের অতীব সুশ্রী ও সুগন্ধ পাখা এবং ব্রকেডের তৈরি সারা হ্যাংচৌ শহরটির দৃশ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় মানুষের রুচি-বোধ আমার শিল্পী মনে খুবই সাড়া জাগিয়েছিল।

এই যাদুঘরে আরও দেখলাম কাঁচের শো-কেসে সযত্নে রক্ষিত রয়েছে শত সহস্র বছর পুর্বেকার জীবজন্তু, পশুপক্ষী, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সমুদ্র-মৎস্য প্রভৃতি জলচর জীব, একটি শো-কেসে দেখলাম পাঁচ শ' বছর আগেকার এক মানুষ পরম—ও চরম নিদ্রায় অভিভূত।

* * * *

এরপর গেলাম সেখানকার একটি শ্রেষ্ঠ উদ্যানে—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে। হ্রদের পারেই এই মনোরম উদ্যান—কত রকম বিচিত্র গাছপালাতে ভরা। কৃত্রিম ঝরণা, রঙবেরঙের মাছ খেলা করছে বিভিন্ন পাত্রের মধ্যে—দর্শনার্থী নরনারী খুব আগ্রহ সহকারে তা নিরীক্ষণ করছে।

একটি ছোট্ট পাহাড়—বড় টিলার মতই হবে। আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠতে লাগলাম। সব থেকে উঁচু পাথরে বাঁধান সমতল স্থানটিতে গিয়ে বসলাম। কী সুন্দর লাগছিল তখন!

বিস্তীর্ণ হ্রদের মধ্যে একটি প্রশস্ত রাস্তা, জলকে দু'দিকে ভাগ করে রেখেছে। দূরে পাহাড়—তার পেছনেও দেখা যাচ্ছে অগণিত পাহাড়। উঁচু জায়গাটিতে বসে দেখছি—পড়ন্ত সূর্যের রঙীন আভা এসে পড়েছে হ্রদের জলের উপর। পাহাড়ের কোল ঘেঁসে হ্রদটি যেন নদীর মত চলে গেছে বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টির বাইরে। হ্রদের মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপের মত। তার উপর কত ঘরবাড়ী উদ্যান বা কৃত্রিম পাহাড় উঁচু, নীচু বা সমতল ক্ষেত্রের উপর রয়েছে—সুন্দর শহরটি মনে হয় যেন অভিজ্ঞ শিল্পীর অঙ্কিত পটে-আঁকা ছবি।

বৈকালিক ভ্রমণে রত নরনারীর বিশেষ করে বালক বালিকার প্রাণোচ্ছল হাসিতামাসা খেলাধূলা হৈ হুল্লোড়ে স্থানটি জীবন্ত, প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছে।

ছোট ছেলেমেয়েদের একটি দল আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল। আমাদের মধ্যে কেউ "হোপিং ওয়ান সোয়ে" বলে চীৎকার করার সঙ্গে সঙ্গে যেন ভীমরুলের বাসাতে ঢিল ছোঁড়ার মত অবস্থার সৃষ্টি হল। অর্থাৎ, আশেপাশের আরও ছেলেমেয়ে যারা ছিল তারাও জড় হয়ে শতগুণ উৎসাহে চীৎকার শুরু করে দিল—"হোপিং ওয়ান সোয়ে"। আরও একটি স্লোগান তারা দিচ্ছিল, যার অর্থ—"চীনের অতিথিবৃন্দ, তোমরা দীর্ঘজীবী হও!"

আবার সাংহাই

সেদিন রাত্রি সাড়ে সাতটায় ট্রেনে উঠেছি—আবার সাংহাই ফিরে যাব বলে। ট্রেনের মধ্যে সেই চীনা বন্ধু, যিনি সেই প্রথম দিন ক্যান্টন থেকে অদ্যাবধি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ছায়ার মত—দোভাষীদের নেতা হিসাবে। তিনি আমার ঠিক পাশেই বসেছেন।

ট্রেন চলছে। জানলা দিয়ে আবছা অন্ধকারে উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করি—শস্য ক্ষেত্রের মধ্যে টেলিগ্রাফ পোস্টগুলো পেছনের দিকে ছুটছে উদ্দাম গতিতে। ইঞ্জিনের বাঁশী বেজে উঠল যেন প্রকৃতির উপরে মানুষের বিজয় ঘোষণা করে।

কমরেড হো কথা বলেন গম্ভীর কণ্ঠে, ধীরগতিতে। মনে হয়, তিনি যেন নীচের পরদা থেকে সঙ্গীত শুরু করলেন। বলছিলেন বিপ্লব ঘটবার আগেকার দিনগুলোর কথা।

শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতে হয়। আজকের নয়াচীনের শ্রেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গ লাভ করেছি। প্রধান মন্ত্রী চৌ এন-লাইয়ের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হ'য়ে ধন্য হয়েছি। মাও সে-তুঙ-এর শান্ত উজ্জ্বল মুখের দূরনিবদ্ধ চোখের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময়ের সৌভাগ্য অর্জন করেছি; তখন কিন্তু তাঁদের বিগত দিনের সম্বন্ধে কোন কথাই মনে হয়নি। এঁদের কত ত্যাগ, কত নিষ্ঠা, কত ধৈর্য, কত বীরত্বপুর্ণ, কত রোমাঞ্চকর ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে জন্ম নিয়েছে নতুন চীন!

দুর্গম গিরিগুহায়, নির্জন কান্তারে, গভীর অরণ্যে, প্রচণ্ড শীতে আচ্ছাদনহীন অবস্থায় অনশনে-অর্ধাশনে দিনের পর দিন অতিবাহিত করেছেন এই মাও সে-তুঙ, চু-তে এবং চৌ এন-লাই প্রভৃতি নেতারা। সত্যিকারের স্বাধীনতা অর্জন করতে জমিদারের শোষণহীন বিদেশী মুলধনের নাগপাশহীন স্বাধীনতা, সমৃদ্ধি ও শান্তির এক নতুন দেশ গড়ে তুলতে এঁদের ত্যাগ ও তিতিক্ষার, শৌর্য ও বীরত্বের তুলনা নেই। কমরেড হো'র মুখে এঁদের কাহিনী শুনতে শুনতে অজান্তেই এঁদের দীর্ঘজীবন কামনা করেছি কতবার!

হো বল্লেন, আমাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টি বহুবার ভুল

করেছে, বহুবার তা স্বীকার করেছে, এবং এই ভুলের মধ্যে দিয়েই তারা নতুনভাবে শিক্ষাগ্রহণ করেছে। ভুল-ত্রুটি নিয়ে আত্ম-সমালোচনার মাধ্যমেই তারা নতুন পথের হদিশ পেয়েছে।…শুনতে শুনতে নিজের দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বুকভরা আশায় উদ্বেল হয়ে উঠলাম।…কিন্তু সে কথা এখন যাক।

……রাত্র দেড়টায় আমাদের গাড়ী সাংহাই রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াল।

*　　　*　　　*　　　*

পরের দিন ঘুম থেকে উঠতে হল খুব সকালেই। কারণ সেদিন ৯টার মধ্যেই বিমানঘাঁটিতে পৌছাতে হবে—সাংহাই ছেড়ে ক্যাণ্টন যাত্রার উদ্দেশ্যে।

কিংকং হোটেলের দশতলার উপর রাস্তার দিকে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে শহরের মানুষদের শেষবারের মত খুব ভাল করে আর একবার দেখলাম।

সকালের সাংহাই। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তা। লোক চলেছে তো চলেইছে। চলেছে দৃঢ়পদে, দ্রুত তালে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে জটলা করবার সময় নেই—সবাই কর্মব্যস্ত।

আমাদের কলকাতার রাস্তায় সকাল হলেই দেখা যায় অনন্যোপায় বেকার যুবকেরা রোয়াকে বসে গজালী করছে, অথবা ছোট ছোট চায়ের দোকানে বসে গল্পগুজব করছে। রাস্তায় পথে অলিতে গলিতে সারাদিন ধরে হৈ হল্লা করবার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর বেকারেরা যেন শিফ্‌ট্ বদল করে চলেছে।

চীন দেশের মানুষদের আর সেদিন নেই। অকারণে, তুচ্ছ কারণে

তারা মাথা ঘামায় না। সারা দেশময় চলেছে বিরাট এক গঠনমূলক কর্মকাণ্ড। সারা দেশের কোটি মানুষের কোটি কোটি বাহুর সানন্দ শ্রমের উপর ভিত্তি করেই সগ্রসর হচ্ছে পুনর্গঠনের এই মহাকাব্য।

আমাদের কিংকং হোটেলের অতি নিকটেই রয়েছে একটি পার্ক। একদল স্বাস্থ্যবান্ ছেলেমেয়ে কি একটা খেলার অভ্যাস করছিল ; যাত্রী নিয়ে চলেছে সাইকেল-রিকসা ; পাবলিক বাস একটু পর পর এসে তার নির্দিষ্ট স্থানটিতে কিছু যাত্রী উঠিয়ে নামিয়ে চলে যাচ্ছে তার গন্তব্যস্থানে। সব কাজগুলোই চলেছে সুশৃংখলভাবে পরিচ্ছন্নভাবে।

বছর তিনেক আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে। এই সাংহাই নগরীকে নিজের চোখে কখনো দেখব বলে তখন আশাও করতে পারিনি। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে আমার রচিত একটি কৌতুক নক্সা কলম্বিয়া থেকে রেকর্ড হয়ে বাজারে বার হয়। রেকর্ডটির নাম দিয়েছিলাম "ক্যালকাটা টু সাংহাই"। বিপ্লবোত্তীর্ণ সাংহাইয়ের বর্তমান দিনের রূপ কল্পনা করেই তখন নক্সাটি লিখেছিলাম। আজ আমার কল্পনার সাংহাইকে আজ আমি বাস্তবরূপে দেখছি, দেখছি সশরীরে প্রত্যক্ষভাবে। এই অভিজ্ঞতার কিছুটা আগেই বলেছি, বাকীটাও সংক্ষেপে বলছি।

দোকানে গিয়েছি। সরকারের নিজস্ব দোকান—গভর্ণমেণ্ট শপ। দোকানের যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রী, দোকান-কর্মচারী এমন কি গ্রাহক-গ্রাহিকাদের বিশেষভাবে নজর দিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছি। দোকানটি বহু-বিভাগীয়—জামা-জুতা, বাক্স-পেঁটরা, রুটি-মাখন থেকে শুরু করে না আছে এমন কোন জিনিসই নেই। ক্রেতারও অভাব নেই ; প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ীটিতে লোক যেন গিজ্ গিজ্ করছে।

সব থেকে আশ্চর্য মনে হল এত লোক দোকানের মধ্যে কিন্তু

বাইরে থেকে বোঝবারই উপায় নেই। দোকানে দর কষাকষি নেই। বাকবিতণ্ডা নেই। পিকিংএর মতই প্রতিটি জিনিসের উপর দাম লেখাই রয়েছে। দোকান কর্মচারীরা হাতে কাজ করে যাচ্ছে, মুখে সাড়া শব্দ নেই। ক্রেতাদের ভোলাবার জন্য আজে বাজে বকে সাচ্চা মালের বিজ্ঞাপন দেবার কোন প্রয়াসই নেই।

বিদেশী আমরা, আমাদের তো মহা খাতির। দোকানের ক্রেতারা পর্যন্ত সসম্মানে পথ ছেড়ে দেন। নিজেরা ক্ষতি স্বীকার করেও আমাদের আগে জিনিস কেনার সুবিধে করে দেন।

একজন সৌখীন ক্রেতা সস্ত্রীক এসেছেন কিছু জিনিস সওদা করতে। একটি চমৎকার রঙের সিল্কের ছাতা কিনে সবে দাম দিচ্ছিলেন, আমি ঐ ছাতাটি দেখিয়ে দোকান কর্মীকে অনুরূপ আর একটি ছাতা বের করবার জন্য অনুরোধ করাতে তিনি জানালেন ঠিক এ রকমটি আর আপাতত নেই। একটিই ছিল। তক্ষুণি সেই মহিলাটি তাঁর সদ্য খরিদ করা ছাতাটি আমাকে নেবার জন্য সে কী আন্তরিক অনুরোধ!

জিনিসের দাম না দিয়ে পালিয়ে না যায়, তার জন্য এসব সরকারী দোকানের ফটকে রাইফেলধারী সান্ত্রী বা রক্ষীর কোন ব্যবস্থা নেই। সেটা কেবল মাত্র কোন দোকানের বেলায়ই নয়, এমন কি সাংহাইয়ের পিপলস ব্যাঙ্ক-এর ক্যাশিয়ারকে রক্ষা করার জন্য তাকে লোহার খাঁচায় পুরে বেয়নেটধারী সান্ত্রীর পাহারায় রাখতে হয় না। অথচ এই পিপলস ব্যাঙ্ক-এর হংকং শাখার বিরাট বাড়ীটির সামনে দেখেছি আমাদের কলকাতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মতই খুব সতর্ক কড়া পাহারার ব্যবস্থা রয়েছে।

মাত্র কয়েক বছর আগেকার দিনের কথা শুনেছি, এই সাংহাই

নাকি চোর ডাকাত জুয়াড়ীদের ছিল এক মহাতীর্থ। আধুনিক কায়দায় বা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় মানুষের সর্বনাশ সাধন করার নিত্য-নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারে সাংহাইয়ের কুখ্যাতি বহুদিনের।

তখনকার দিনের সাংহাইয়ের সঙ্গে আজকের দিনের কলকাতার একটা সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য। যেমন আমাদের আজকের কলকাতায় ঠিক তেমনি তখনকার সাংহাইয়ে সমাজের 'কুলীন' ব্যক্তিদের মধ্যেই জুয়াড়ীদের প্রকোপ ও প্রাদুর্ভাব ছিল। আমাদের দেশে যেমন একদল মুষ্টিমেয় লোক টেলিফোন যোগে "কেত্না ভাও? কেত্না ভাও?" করতে করতে "আইনসম্মত" ভাবেই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে উজীর-নাজীর বা ফকীর-মুসাফিরে পরিণত হয়, ওখানেও ঠিক তেমনি হত। অবশ্য আজ সেখানে এ আইন বে-আইনী।

যাই হোক্, এইবার আবার দোকানের কথাতেই ফিরে আস্ছি। সরকারী দোকান ছাড়া বিভিন্ন দোকানে গিয়েও দেখেছি, দাম সব জায়গায়ই এক। বিদেশীদের জন্য আলাদা 'স্পেশাল' গলাকাটা দাম কেউ হাঁকে না, যা হাঁকে রেঙ্গুন বা হংকং-এ।

একটি বে-সরকারী দোকানে গিয়ে একটি চামড়ার স্যুট্কেস্ কিনতে চাইলাম। সাংহাই থেকে ক্যাণ্টনে যাব শুনে দোকানদার এখান থেকে স্যুট্কেস্ না কেনবার জন্য উপদেশ দিলেন। কারণ এখানে ভাল স্যুট্কেস্ চালান হয়ে আসে ক্যাণ্টন থেকেই; কাজে কাজেই সেখানে দাম অপেক্ষাকৃত সস্তাই হবে।

* * *

সেদিন ছিল ২৬শে অক্টোবর। সোয়া নয়টায় সাংহাই বিমানঘাঁটি থেকে যাত্রা করলাম ক্যাণ্টন অভিমুখে। স্থানীয় শান্তি সংসদের

কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং পাইওনিয়ার ছেলেমেয়েরা বিমানঘাঁটিতে এলেন বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে। সাংহাই থেকে ক্যান্টনের দূরত্ব প্রায় তেরশো মাইল।

বিকেল ৩টা ৪৫মিনিটে গিয়ে পৌঁছলাম। ফেরবার পথেও দু'দিন ছিলাম এই ক্যান্টনে। তার মধ্যেও বহু কিছু দেখবার সুযোগ পেয়েছি।

যেমন সেখানকার সরকারী প্রদর্শনী। বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে রয়েছে তার ভবনগুলি। এই প্রদর্শনীতে দেখানো হচ্ছে ইলেকট্রিকের যাবতীয় যন্ত্রপাতি, মাইক্রোফোন, এ্যামপ্লিফায়ার, টেলিফোন যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। মোটর সাইকেল, মোটর গাড়ীর কিছু কিছু অংশ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয় এই প্রদেশে। যদিও পূর্বে এ ধরনের জিনিসপত্র তৈরির কারখানা প্রায় ছিল না বললেই হয়। মোটর টায়ার, টিউব, কৃষি যন্ত্রপাতি এবং আরও বহু কারখানা খুব হালেই স্থাপিত হয়েছে। এই প্রদর্শনীর মধ্যে তার অনেক নমুনাই দেখলাম।

এই স্থায়ী প্রদর্শনীর পাশেই রয়েছে সাংস্কৃতিক ভবন, রয়েছে নরনারী, বালবৃদ্ধ নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণীর লোকেদের জন্য বিভিন্ন রকমের খেলাধূলা ও নৃত্যগীতের ব্যবস্থা। এমন কি কয়েকটি পাঠাগারও রয়েছে।

বই আর কত দীর্ঘ করা যায়! ইচ্ছে হয় আরও লিখি অনেক অনেক! এলোমেলো কত দিনের কত বিচিত্র ঘটনাই না মনে পড়ে!

মনে পড়ে সাংহাই থাকাকালীন যে তিনখানি অতি সুন্দর অপেরা দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম তার কথা। গল্প যেমন অভিনব, তেমনই শিল্পীদের অপূর্ব অভিনয়-দক্ষতা। ঐকতান বাদ্য ও

শিল্পকলা, প্রকাশ-ভঙ্গিমা সবই যেন পিকিং থেকে স্বতন্ত্র। চোখে ভাসছে নাটকের দৃশ্য ও বিষয়বস্তুগুলো।

মনে পড়ে—পিকিং শহরের বাইরে দক্ষিণাংশে রয়েছে "তিয়েন-তেন" যার বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায় "স্বর্গের মন্দির"। সে দেশের রাজ-রাজড়ারা এককালে এখানে এসে উপাসনা করতেন। প্রাচীন চীনের বিভিন্ন রাজার রাজত্বকালে সে দেশের লোকেরা জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র এবং ললিতকলা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা যে অসাধারণ উন্নতিসাধন করেছিলেন—বিশিষ্ট ধরনের অতি সুন্দর এই স্থানটি তার বহু সাক্ষ্য বহন করে।

মনে পড়ে আরও—মাত্র বার বছর বয়সে এক পতিতার ঘরে বিক্রিতা তরুণী ওয়াং তে-সীর কথা। পিকিং মুক্ত হবার মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই জনগণতান্ত্রিক সরকার হাজারো বছরের কুৎসিত এই বৃত্তি সারা চীন থেকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করলেন। তাতে কেবলমাত্র এই পিকিংয়েই ১৩৭৬ জন নারী চির-লাঞ্ছনা ও দুর্ভাগ্যপূর্ণ জীবন থেকে মুক্তি পেলেন। সরকারের সুব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দ্বারা সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে তাঁরা সমাজে নতুন জীবন প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পেল। এরই ফলে ওয়াং তে-সী আজ স্বাস্থ্যমন্ত্রী-দপ্তরের একটি ল্যাবরেটরীর একজন শ্রেষ্ঠ রক্ত-পরীক্ষক হতে সক্ষম হয়েছেন।

পিকিং শহরের এক চৌমাথার মোড়ে একদিন হঠাৎ লক্ষ্য করছিলাম একজন মহিলা ট্রাম ড্রাইভারকে। পরে অবশ্য আরও দু'একবার দেখেছি মহিলা ড্রাইভারকে ট্রাম চালাতে।

পিকিংএর "সরকারী দোকানে" আলাপ হয়েছিল এক মহিলা ডাক্তারের সঙ্গে। সোবিয়েৎ ইউনিয়নে বর্তমানে যে বিনা যন্ত্রণায়

সন্তান প্রসব সম্ভব হয়েছে—সেই পদ্ধতি এখন পিকিংএর প্রসূতি সদনগুলোতে প্রয়োগ করে ইনি খুবই সাফল্যলাভ করেছেন। এই মহিলাটি এ ব্যাপারে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার। প্রথম আলাপ হয় দোকানের গ্রামোফোন ও রেকর্ড বিক্রয় বিভাগে। সোবিয়েতের এক প্রতিনিধি এবং আমি দোকানে গিয়েছিলাম "সোবিয়েৎ দেশ" গানখানির চীনা সংস্করণের রেকর্ডটি কিনতে।.........দোকানে বসে আরও ছু'একখানি গান শুনছিলাম। সঙ্গের সোবিয়েৎ বন্ধুটি দোকানী বা "সেলস্‌ম্যান"কে ভাল করে বোঝাতে পারছিলেন না যে আরও ছু'একখানি রুশীয় রেকর্ড তাঁর চাই। আমাদের ঠিক পাশেই বসেছিলেন মহিলাটি। নিজের ভাষায় দোকানীকে সব বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। সেখানে বসেই মহিলাটির সঙ্গে আলাপ হল। খুব ভালভাবে রুশ ভাষা আয়ত্ত করেছেন। বুঝলাম যখন তিনি রুশ প্রতিনিধির সঙ্গে অনর্গল কথা বলছিলেন। মহিলাটির অমায়িক ব্যবহার এবং তাঁর মিষ্টি হাসিটি এখনো আমার চোখের সামনে ভাসছে।

এমনি ছোটখাট কত বিচ্ছিন্ন ঘটনাই না মনের আকাশে তারার মত ফুটে উঠছে।

বিদায় মুহূর্তগুলো

২৭শে অক্টোবর, সন্ধ্যা ৬টা। ক্যাণ্টনের "আই সিউন" হোটেলের 'অভ্যর্থনা-ঘরে' স্থানীয় তিনজন শিল্পীর সঙ্গে বসে গল্প করছিলাম। ছু'জন ক্যাণ্টনের 'মিউজিক এসোসিয়েশনের' বিশিষ্ট সভ্য। আর একজন—কুমারী ইউ-উই—'দক্ষিণ চীনের শিল্প ও সাহিত্য কলেজের' সঙ্গীত বিভাগের অন্যতম সভ্যা।

ওঁদের মুখে শুনছিলাম, বর্তমানে ক্যাণ্টন শহরে দুটো ব্রডকাস্টিং স্টেশন। একটি রয়েছে শুধু লোকসঙ্গীত পরিবেশন করার জন্যই। শিল্পীদের সর্বনিম্ন মাইনে আমাদের হিসাবে সোয়া দু'শো টাকার মত। এখানকার একদল উঁচুদরের শিল্পী রয়েছেন বর্তমানে উত্তর কোরিয়ায়—চীনা স্বেচ্ছাসেবক ও কোরিয়াবাসীদের তাঁরা প্রেরণা দান করছেন নৃত্য, গীত ও বাদ্যের মাধ্যমে।

নিবিড় হয়ে আলাপ আলোচনা করছিলাম, এমন সময় ঝড়ের মত কক্ষে প্রবেশ করলেন শ্রীমতি পেরিন। জানালেন আজ রাত বারোটায় আমরা ক্যাণ্টন পরিত্যাগ করব; সুতরাং মালপত্র খুব তাড়াতাড়ি গোছগাছ করা প্রয়োজন।

শিল্পীদের সঙ্গে বিদায় আলিঙ্গন করে নিজ কক্ষে প্রবেশ করলাম। ...উঃ!...মালপত্রের এক পাহাড়! চীন দেশ ঘুরতে গিয়ে নিজেদের কাঁধে বয়ে নিয়ে বেড়াতে হয়নি এই যা রক্ষা!

* * *

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর ঘরে এসে জানালার কাছে দাঁড়িয়েছি। পার্ল নদীর ঠিক মাঝখানটায় একটি লঞ্চ মুহুর্মুহু হুইসিল বাজিয়ে চলেছে। রেলের বাঁশীর মত পাতলা আওয়াজ। বোধহয় কোন নৌকা সামনে পড়ে থাকবে। নদীর ওপারে ঐ কারখানার চিম্‌নি অনর্গল ধোঁয়া উদ্গীরণ করে চলেছে। রাত হলেও ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া কারখানার কাঁচের জানালা-গুলো থেকে ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে অতি শক্তিশালী বৈদ্যুতিক আলো।

কারখানাটির বয়স মাত্র আড়াই বছর। বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম তৈরি হয় ওখানে। ওর মালিক হল স্থানীয় সরকার। ওখানকার

সরকার দৈনিক আটঘণ্টার উর্ধ্বে খাটবার ব্যবস্থা বাতিল করলেও কারখানাটি চব্বিশ ঘণ্টা চালু রাখার ব্যবস্থা করেছেন। কাজ চলে তিন দফায় ; এক দফার কাজ শেষ ক'রে একদল শ্রমিক বিদায় হ'লে নতুন আর একদল তাদের স্থান পুরণ করে। পণ্যের উৎপাদন আগের তুলনায় সোয়া দু'গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

একজন দোভাষী তরুণী এসে উপদেশ দিলেন বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে, যথাসময় এসে তিনি জাগিয়ে দেবেন।

ঠিক সময় সত্যিই তিনি এসে ঘুমে ভাঙালেন। ঘর পরিষ্কার— অর্থাৎ মালপত্র আগেই চলে গেছে।

স্থানীয় শান্তি কমিটির মোটর বাসে গিয়ে বসলাম। গাড়ীটি অনেকটা আমাদের এখানকার স্টেট্ বাসের মত। গাড়ী ছাড়ল। দু'পাশের অন্ধকারকে তীব্র আলোয় ভেদ করে, জনবিরল মসৃণ রাস্তাগুলো অতিক্রম করে ক্যাণ্টনের রেলওয়ে স্টেশনে এসে গাড়ী থামল।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাস্তাগুলো জনবিরল হলেও প্ল্যাটফর্মটি কিন্তু জনাকীর্ণ। ক্যাণ্টন নগরের সমস্ত বালকবালিকারা বুঝি আমাদের জন্যই চোখের ঘুম তাড়িয়ে স্টেশনে এসেছিল বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে।

স্থানীয় গণ্যমান্য ভদ্রলোক ও শান্তি কমিটির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে করমর্দন সেরে এগুচ্ছি প্ল্যাটফর্মের মধ্য দিয়ে। বাঁ দিকে আমাদের জন্য স্পেশাল ট্রেন অপেক্ষা করছে। ইঞ্জিনের গোড়া থেকে প্ল্যাটফর্মের শেষ অবধি—বালক বালিকা, তরুণ তরুণীর দল আমাদের ডান দিকে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে। সবাই চীৎকার করে চলেছে—"হো পিং ওয়ান সোয়ে!"

আমরাও যোগ দেই—"হো পিং ওয়ান সোয়ে", "মাও সে-তুং ওয়ান সোয়ে"! ফুলের তোড়া তুলে দেয় আমাদের হাতে। কারও সঙ্গে করমর্দন, কারও সঙ্গে আলিঙ্গন করতে করতে ট্রেনে গিয়ে উঠলাম।

জানালার ফাঁক দিয়ে হাত বাড়াই। কচি কচি হাত এসে হাতে মিলতে লাগল। শক্ত মুঠিতে হাত ধরে প্রাণপণ ঝাঁকাচ্ছে। অবিরাম ধ্বনি দিয়ে চলেছে। আমাদেরও ধ্বনির বিরাম নেই—"চীন-ভারত মৈত্রী জিন্দাবাদ"!

ট্রেনের হুইস্‌ল পড়ল। রাত ঠিক একটা। গাড়ী ছাড়ল। মাথা বার করে রুমাল দোলাচ্ছি। ছেলেমেয়েরাও হাত নাড়িয়ে তেমনই বিদায়-সম্বর্ধনা জানাচ্ছিল। সে বিদায়-দৃশ্য বড় করুণ।

প্ল্যাটফর্মের কোলাহল ও সুস্নিগ্ধ আলো পিছনে ফেলে গাড়ী এগিয়ে চলল নিস্তব্ধ অন্ধকার প্রান্তরের মধ্য দিয়ে।

মনটা ভার হয়ে এল। তাহ'লে সত্যি সত্যিই চীন ছেড়ে চলেছি? সীমান্তের ছোট স্টেশনটিতে হয়ত আরও দুচার জন লোক দেখতে পাব। বাস্, তারপরই শেষ!

গাড়ী চল্‌ছে—আলো নিভিয়ে আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

রাত ফরসা হবার কিছু পূর্বেই স্যানচুন স্টেশনে এসে পৌঁছলাম। ঘুম ভাঙ্গালেন কমরেড ইয়াং।

ইয়াংএর সঙ্গে পিকিং ছেড়ে আসবার পর ছাড়াছাড়ি হ'য়ে যায়।

আমরা সাংহাই হয়ে ক্যাণ্টনে ফিরি, কিন্তু আমাদের দলপতি ডাঃ কিচলু পিকিং থেকে ট্রেনে সোজা চলে এলেন এই ক্যাণ্টনে।

ডাঃ কিচলুর সঙ্গে এসেছিলেন ইয়াং এবং আরও দু'জন দোভাষী।

পিকিং ছেড়ে আসার পরে আবার যখন ক্যাণ্টনের হোটেলে ইয়াং এর সঙ্গে দেখা হল—ওঃ সে কি আনন্দ! বারবার আলিঙ্গন করেও যেন তৃপ্তি হচ্ছিল না।

অন্ধকার থাকতেই ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লুম। মুখ-হাত ধোয়া ইত্যাদি সমাধা করতে করতে রাত প্রায় ফরসা হয়ে গেল।

স্যানচুন খুব ছোট্ট নতুন সীমান্তবর্তী স্টেশন। ছোট ছোট পাহাড়, তার উপর দু'একটা ঘরবাড়ী। চীন মুক্ত হবার পর থেকে স্থানটির বিশেষত্ব ক্রমেই বাড়ছে। যারা সীমান্তে পাহারা দেয় বা রেলওয়ে বিভাগে কাজ করে তাদের ব্যবহারের জন্যই নতুন ঘরবাড়ীগুলি হালে তৈরি হয়েছে।

স্টেশনে কোন হোটেল নেই। সে জন্যই আমরা যে স্পেশাল ট্রেনে এলাম তার মধ্যে একখানা ডাইনিং-কার সংযোগ করে আমাদের প্রাতরাশের সুব্যবস্থাও করে দেওয়া হয়েছে।

কাকপক্ষীদের মুখেও যখন জল দেবার সময় হয়নি আমাদের প্রাতরাশ শুরু হল তারও আগে। এত সকাল সকাল কি খাবার অভ্যাস আছে? অবশ্য চীন দেশে এসে খাবার সব রকম অভ্যাসই পাল্টে গেছে।

যাই হোক্, স্যান-চুন স্টেশনে ডাইনিং-কারে প্রাতঃকালীন পানাহার সমাধা করে প্ল্যাটফর্মের ওয়েটিং রুমে এসে বসলাম।

স্টেশনটি ঠিক যেন তেমনই রয়েছে, যেমনটি দেখে গিয়েছিলাম আসবার সময়। তেমনই সাজান গোছান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। স্থানীয় কর্মচারী, যাত্রী বা উপস্থিত লোকজনদের সহানুভূতিপুর্ণ ব্যবহার সত্যিই অপূর্ব!

এইবার আমরা রওনা হব। বহুদিন পরে ঘরে ফিরব। আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হব। এ তো আনন্দেরই কথা। কিন্তু মন ক্রমেই উদ্বেল হয়ে উঠছে কেন ?

বি, ও, এ, সির দেওয়া ব্যাগটি কাঁধে চাপিয়েছি। শ্রীমতি পেরিন ঠিক আমার আগে। পিছনে রয়েছেন মনোজদা। আমরা ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্মের মধ্য দিয়ে এগুচ্ছি। একদল প্রবাসী চীনা —অধিকাংশই হংকং যাত্রী—অপেক্ষা করছে মোটঘাট নিয়ে। কাস্টমস্ অফিসার এক একজনের বাক্স বিছানাগুলোতে একবার হাত বুলিয়েই ছেড়ে দিচ্ছে। দেখলাম খানাতল্লাশীর হয়রানী কাউকে পোয়াতে হচ্ছে না। ঠিক উল্টোটি দেখেছিলাম আমাদের বেলায় দমদম বিমানঘাঁটিতে। উঃ সে কি অস্থির কাণ্ডকারখানা—এটার মধ্যে কি, ওটার মধ্যে কি আছে! জিনিসপত্র তছ্‌নছ্ করে নাস্তা-নাবুদ আর কি! আমরা যেন চীন দেশে গেছলুম বোমার চালান করতে!

আমরা সেখানকার বিদেশী অতিথি। আমাদের কোথাও কোনদিন কেউ ভুলেও জিজ্ঞাসা করেননি আপনার ব্যাগে কি আছে বা ক'গজ সিল্ক নিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছেন। সে হয়েছিল দমদমে। বাক্স হাতিয়ে বার করল আট দশগজ সৌখীন ও লোভনীয় চীনা সিল্কের দু'টো টুকরো। আর যায় কোথায়? বার বার হাত বোলাচ্ছে কাপড়টার উপর—"আঃ কি চমৎকার! সত্যই চীনা সিল্ক জগতের মধ্যে সবচাইতে ভাল, কত দাম?" বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে, ভাবলাম এক টুকরা দাবি করে না বসে! বরাৎ ভাল, যথা স্থানে রেখে দিল। তবে ডিউটি হাঁকল ২৮৲ টাকা। মনে হল চটে গেছেন। বহু অনুরোধ উপরোধের পর ২২৲ টাকায় রফা হল।......

স্থানচুন-এর কাস্টমস্ অফিসার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে আমাদের পথ উন্মুক্ত করে, একপাশে সরে দাঁড়ালেন।

কাঁটাতারের বেড়ার পাশ ঘেঁসে এইবার এসে পৌছলাম সীমান্তবর্তী সেই ছোট্ট খালটির সেতুর কাছে। এখনও আমাদের মাথার উপর সেই নিশান উড়ছে—যে নিশান উড়তে দেখেছিলাম ১লা অক্টোবর "তিয়েন আন্-মেন" গেটের অলিন্দে—মাও সে-তুঙ এর মাথার উপর।

আগে আগে যাচ্ছিলেন আমাদের নেতা ডাঃ সইফুদ্দীন কিচলু। মহাচীনের মাটি ত্যাগ করে সেতুটির মাঝখানে এসে থম্‌কে দাঁড়ালাম। পিছন ফিরে দেখি দাঁড়িয়ে আছেন চীনের বন্ধুরা। এতদিন তাঁরা আমাদের সঙ্গে ছিলেন ছায়ার মত। দেখলাম ছেলে-মেয়েরা এবং তাদের নেতা কমরেড ইয়াং শিশুর মত কান্না শুরু করেছেন।

ভারতীয় শান্তি সংসদের সম্পাদক শ্রীরমেশ চন্দ্র আমাকে একটি গান গাইতে অনুরোধ জানালেন। আমি গান ধরলাম—কিন্তু কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

শ্রীমতি পেরিন কাঁদছেন। মিসেস মেহ্‌তা কাঁদছেন। সব থেকে আশ্চর্য আমাদের মনোজদা'র চোখেও জল! অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে চোখে বোধহয় রুমাল চাপা দিলেন। বিদায়ের বিষাদঘন মেঘ যেন অশ্রু হয়ে সবার চোখে নেমে এল।······ওপারে দাঁড়িয়ে আমাদের জন্য কাঁদছ তোমরা, ওগো চীনের সাথীরা! প্রিয় বন্ধু ইয়াং, তোমাকে এতদিন সাহসী বীর বলেই জানতাম;—তোমার চোখেও জল দেখে আমি কি স্থির থাকতে পারি! ওগো চীন দেশের মানুষ, তোমাদের যে কত ভালবেসেছি তা বুঝতে পারছি এই বিচ্ছেদ মুহূর্তে। ভারতের আমি এক দুর্ভাগা শিল্পী। অভাব-অনটন

বহু দুঃখ-দৈন্যের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছি। অপমান, অবজ্ঞা, তিরস্কারে ভেঙ্গে পড়িনি কোনদিন। কিন্তু আজ একি শিশুসুলভ ভাবপ্রবণতা! আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল কেন? কোথায় গেল স্বর মূর্ছনা? এইত এতদিন সারা চীন দেশময় সপ্তস্বরসিন্ধু মথিত করে বেড়িয়েছি। আর আজ আমার জীবনে একি এক সঙ্গীতহীন মুহূর্ত!……না, এ মুহূর্ত তো সঙ্গীতহীন নয়, পরিপূর্ণ সঙ্গীতময়তার ভাষাশূন্য অভিব্যক্তি।

*　　*　　*

লোহো স্টেশন থেকে, নতুন চীনের মাটি পেছন ফেলে ট্রেন চলতে শুরু করল। নয়া চীনের ওপার থেকে প্রদীপ্ত সূর্যের আরক্ত আলো ছড়িয়ে পড়ছে, বৃটিশ এলাকার সামনের বিস্তৃত পথ প্রান্তরে।

ট্রেনের পেছনের দিকে একটা স্পেশাল কামরা। কামরাটি একটি খোলা বারান্দার মত। তার তিনদিকে রয়েছে পুরু স্বচ্ছ কাঁচের দেওয়াল।

আমাদের মহান্ নেতা ডাঃ কিচলু একটি দীর্ঘ সোফায় উপবিষ্ট। আমি সামনে দাঁড়াতেই তাঁর পাশে বসবার জন্য আমাকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করলেন। আমি নিঃসঙ্কোচে তাঁর সামনে অপর একটি সোফায় উপবেশন করতেই, আরও ব্যাপকভাবে অন্যান্য শিল্পীদের এই শান্তি আন্দোলনের মধ্যে টেনে আনবার দায়িত্বে যাতে পরাঙ্মুখ না হই তারজন্য উপদেশ দিতে লাগলেন। আমিও জানালাম যথাসাধ্য তাঁর আজ্ঞা পালনের সঙ্কল্প। তারপর আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন তিনি—কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন যেন। তাঁর মুখের

দিকে তাকাতেই লক্ষ্য করলাম তাঁর দূরনিবদ্ধ দৃষ্টি রয়েছে পেছনের দিকে।

স্বচ্ছ কাঁচের মধ্য দিয়ে তখনও দেখা যাচ্ছিল নতুন চীনের আবছা গাছপালা, উঁচু পাহাড়ের উপর বিক্ষিপ্ত ঘরবাড়ী। একটি লাল নিশান সূর্যের আলোতে যেন আরও লাল হয়ে সদর্পে উড়ছে—ভাবী যুগের এশিয়াবাসীর সুখ-সমৃদ্ধ জীবনের সৃষ্টিশীল শান্তি চিরস্থায়ী করবার ইঙ্গিত বহন করে। মনে হতে লাগল চীৎকার করে গান ধরি :

"মহাচীনের মানুষ, তোমরা দীর্ঘজীবী হও!"
"নয়াচীনের গণ-সরকার দীর্ঘজীবী হোক!"
"দীর্ঘজীবী হোক এশিয়াবাসী মানুষের বন্ধুত্ব!"
"বিশ্ব শান্তি দীর্ঘজীবী হোক!"

—শেষ—

দেখে নেবেন

৩২ পৃষ্ঠার শেষ লাইনে 'এখনি গান শুরু' কথাটির পরে যোগ হবে 'করুন'।

৪৩ পৃষ্ঠায় 'শ্রীরাঘবাইয়ান্' নামটি হবে 'শ্রীরাঘবন্'।

১ 'মাউ' হল আমাদের হিসেবে প্রায় আধ বিঘার সমান।

১ 'হেক্টার' হল আমাদের হিসেবে ৭৷৷০ বিঘা।